

সন্দীপন

বার্ষিকী-২০১৮

স জা অমর একুশে স জা
ক খ মহান শহিদ দিবস স জা
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



উৎকর্ষ সাধনে অদম্য
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

www.drmc.edu.bd





মন্দীশন

প্রকাশনা পর্ষদ

পৃষ্ঠপোষক:

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশফাক ইকবাল, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, অধ্যক্ষ

উপদেষ্টামণ্ডলী:

নিশাত হাসান, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-সিনিয়র শাখা
মোঃ মন্জুরুল হক, উপাধ্যক্ষ, দিবা-সিনিয়র শাখা
ড. মোঃ নূরুন নবী, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-জুনিয়র শাখা
আসমা বেগম, উপাধ্যক্ষ, দিবা-জুনিয়র শাখা

বার্ষিকী সম্পাদনাপর্ষদ-২০১৮

সাবেরা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক
রাশেদ আল মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক
মোঃ আরিফুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
রতন কুমার সরকার, সহকারী অধ্যাপক
আখতার জাহান ফেরদৌসী বানু, সহকারী অধ্যাপক
ড. রুমানা আফরোজ, সহকারী অধ্যাপক
তারেক আহমেদ, প্রভাষক
তামান্না আরা, প্রভাষক
মোঃ আফজাল হোসেন, প্রভাষক
মাস্টার মিতুল রহমান অন্তর, একাদশ, প্রভাতি শাখা
মাস্টার সাজিদ রহমান, একাদশ, দিবা শাখা

মুদ্রণতত্ত্বাবধান : সাবেরা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক
রাশেদ আল মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক
মোঃ আরিফুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
ড. রুমানা আফরোজ, সহকারী অধ্যাপক
তারেক আহমেদ, প্রভাষক
তামান্না আরা, প্রভাষক
মোঃ আফজাল হোসেন, প্রভাষক
এবং বাংলা বিভাগের সকল শিক্ষক

আলোকচিত্র : মির্জা তানবীরা সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক
আখতার জাহান ফেরদৌসী বানু, সহকারী অধ্যাপক
খন্দকার আজিমুল হক পাশু, প্রভাষক
মোঃ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া, প্রভাষক
খন্দকার ওয়ালিদ, অফিস সহকারী

প্রচ্ছদ : রতন কুমার সরকার, সহকারী অধ্যাপক

অলংকরণ : রাশেদ আল মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক
ড. রুমানা আফরোজ, সহকারী অধ্যাপক

ডিজাইন : আমান উল্লাহ শেখ

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০১৯

মুদ্রণ : ট্রান্সপ্রিন্স
৬৫, বাঁশবাড়ি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭



অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষক প্রতিনিধিদ্বয় এবং বার্ষিকী সম্পাদনাপর্ষদ



সভাপতির বাণী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যদি একটি ঘরের সাথে তুলনা করা হয়, সাহিত্য বার্ষিকী হলো সেই ঘরের জানালা। সাহিত্য বার্ষিকীতে প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনার বাণীময় রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের সাহিত্য বার্ষিকী 'সন্দীপন' তার চিরায়ত ঐতিহ্য নিয়ে বিকাশোন্মুখ এ সৃজনশীল চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির এ ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের আবেগ ও আকুলতাকে ধারণ করে প্রকাশিতব্য বার্ষিকী 'সন্দীপন-২০১৮' এর আত্মপ্রকাশকে আমি স্বাগত ও অভিনন্দন জানাই।

'সন্দীপন'এর দীপশিখাতুল্য নবীন লেখকেরাই একদিন আলোকিত মানুষ হয়ে সৃষ্টিশীলতার উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে দিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে, আলোর মশাল হাতে পথ দেখাবে জাতিকে-এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাদের জন্য রইল আমার আশীর্বাদ ও শুভকামনা।

পরিশেষে কলেজের অধ্যক্ষ এবং 'সন্দীপন' এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ।

আইবাব

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সিনিয়র সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



অধ্যক্ষের বাণী

শিল্প-সাহিত্য মানুষের সুকুমার বৃত্তির সহজাত অভিব্যক্তি। শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং তাদের সুকুমার বৃত্তির চর্চার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ও বৈচিত্র্যময় প্রকাশ মাধ্যম। এ প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিবেচনা করে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ প্রতি বছর হাউসভিত্তিক দেয়াল পত্রিকা, বিজ্ঞান ম্যাগাজিন, বিতর্ক ও ল্যাপ্‌য়েজ স্যুভেনির ছাড়াও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশ করে থাকে কলেজবার্ষিকী। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হচ্ছে ২০১৮ সালের কলেজবার্ষিকী 'সন্দীপন'। কলেজবার্ষিকীর এ আত্মপ্রকাশে অধ্যক্ষ হিসেবে আমি আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি।

'সন্দীপন' ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের একটি প্রামাণ্য দর্পণ। এ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ও চিত্রকর্ম, তাদের বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতার সাফল্য, বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল, হাউস প্রতিবেদন, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং বোর্ড অব গভর্নরস ও ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচিত্র পরিচিতি। শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের লেখায় ও চিত্রকর্মে তাদের কচি-কোমল মনের অকৃত্রিম অভিব্যক্তি ঘটেছে। এদের মধ্যে হয়তো লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের জগৎখ্যাত সাহিত্যিক-চিত্রশিল্পী। তাদের জন্য রইল আমার অশেষ দোয়া ও শুভেচ্ছা। যেসব শিক্ষক বার্ষিকীতে লিখে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেছেন তাঁদেরকে জানাচ্ছি উষ্ণ অভিনন্দন।

আশাকরি 'সন্দীপন-২০১৮' সুধীমহলে সমাদৃত হবে এবং ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করতে সহায়তা করবে। যাঁদের শ্রম, সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় বার্ষিকী প্রকাশিত হচ্ছে তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

আশফাক ইকবাল

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল

অধ্যক্ষ

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



সম্পাদকীয়

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” অর্থাৎ “নিজের উপর আস্থা রাখ এবং তুমি যা জান তা জানিয়ে দাও।” ঠিক এমন করে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত এবং আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ পরিচালিত হয়ে আসছে ১৯৬০ সাল থেকে।

ঘনসবুজ বৃক্ষসুশোভিত সুবৃহৎ ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক নানাবিধ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি বহু বছর ধরে তৈরি করে চলেছে শত সহস্র সৃজনশীল মেধাবী মানুষ। তারই ধারাবাহিকতায় শিশু-কিশোর-তরুণ লেখকদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে প্রতি বছর প্রকাশিত হয় কলেজবার্ষিকী ‘সন্দীপন’।

শুধু ছাত্র-শিক্ষকদের সাহিত্যচর্চার মাধ্যম নয়, বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ততার সচিত্র বিবরণও ‘সন্দীপন’ এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যেও শিক্ষকগণ তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ ও উপদেশমূলক লেখা দিয়ে পত্রিকার সৌকর্যবর্ধনে সহায়তা করেছেন। তাঁদের জন্য রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

‘সন্দীপন’ প্রকাশের অন্তরালে নিরন্তর প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশফাক ইকবাল এর পৃষ্ঠপোষকতা ও সার্বক্ষণিক দিকনির্দেশনা। বার্ষিকী কমিটির সদস্যদের সহযোগিতা, নিরলস শ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল ‘সন্দীপন’। তাঁদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

সাবেরা সুলতানা

আহবায়ক

সন্দীপন সম্পাদনা পর্ষদ-২০১৮

এবং

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ইংরেজি বিভাগ

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ।

বোর্ড
অব
গভর্নর্সে



মোঃ সোহরাব হোসাইন
সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
চেয়ারম্যান



বেগম ফাতিমা ইয়াসমিন
মহাপরিচালক, অতিরিক্ত সচিব (ইন্সটিটিউট অব পাবলিক
ফিন্যান্স বাংলাদেশ), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য



দুলাল কৃষ্ণ সাহা
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য



প্রফেসর ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য



প্রফেসর মুঃ জিয়াউল হক
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
সদস্য



দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালা
প্রধান প্রকৌশলী
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা
অভিভাবক প্রতিনিধি-প্রভাতি শাখা
সদস্য



মোঃ হাবিবুর রহমান
যুগ্ম সচিব, পরিচালক (অর্থ), বিএসসিআইসি
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
অভিভাবক প্রতিনিধি-দিবা শাখা
সদস্য



জনাব মোহাম্মদ নূরুল্লাবী
সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষক প্রতিনিধি
(প্রভাতি শাখা)
সদস্য



জনাব এ কে এম বদরুল হাসান
প্রভাষক ও শিক্ষক প্রতিনিধি
(দিবা শাখা)
সদস্য



ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশফাক ইকবাল
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ
সদস্য সচিব



শিক্ষকবৃন্দ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
আশফাক ইকবাল
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
অধ্যক্ষ

উপাধ্যক্ষবৃন্দ



নিশাত হাসান
প্রভাতি-সিনিয়র শাখা



মোঃ মন্জুরুল হক
দিবা-সিনিয়র শাখা



ড. মোঃ নূরুন নবী
প্রভাতি-জুনিয়র শাখা



আসমা বেগম
দিবা-জুনিয়র শাখা

সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দ



ফাতেমা জোহরা
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ



মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ
গণিত বিভাগ



রওশন আরা বেগম
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ



মোঃ ফিরোজ খান
পরিসংখ্যান বিভাগ



মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক
বাংলা বিভাগ



মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ লোকমান হাকিম
ব্যবস্থাপনা বিভাগ



মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ



সাবেরা সুলতানা
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ মেসবাবুল হক
ইংরেজি বিভাগ



শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
অর্থনীতি বিভাগ



মোহাম্মদ নূরুল্লাহী
যুক্তিবিদ্যা বিভাগ



জে এম আরিফুর রহমান
রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ



সুদর্শন কুমার সাহা
গণিত বিভাগ



রানী নাছরীন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ



রাশেদ আল মাহমুদ
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
ইংরেজি বিভাগ



মির্জা তানবীর সুলতানা
চারু ও কারু বিভাগ



মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ



রতন কুমার সরকার
চারু ও কারু বিভাগ



মোঃ বাকাবিলাহ
ইতিহাস বিভাগ



অনাদি নাথ মঞ্জল
গণিত বিভাগ



আখতার জাহান ফেরদৌসী বানু
কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ



ত ম মালেকুল এহতেশাম লালন
বাংলা বিভাগ



মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ



নাসরীন বানু
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ



মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
গণিত বিভাগ



মোঃ জাহেদুল হক
রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ



প্রশান্ত চক্রবর্তী
গণিত বিভাগ



মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



আসাদুল হক
ইংরেজি বিভাগ



মুহাঃ ওমর ফারুক
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ



সামীয়া সুলতানা
অর্থনীতি বিভাগ



মোঃ রফিকুল ইসলাম
গণিত বিভাগ



প্রসন্নজিত কুমার পাল
রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ শাহরিয়ার কবির
বাংলা বিভাগ



মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মুখা
ব্যবস্থাপনা বিভাগ



নার্গিস জাহান কনক
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ



ড. রুমানা আফরোজ
বাংলা বিভাগ



প্রসূন গোস্বামী
ইংরেজি বিভাগ



মোহাম্মদ সেলিম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



হাফিজ উদ্দিন সরকার
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ



জাকিয়া সুলতানা
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



ফাতেমা নূর
ইংরেজি বিভাগ



নূরুন্নাহার
চারু ও কারু বিভাগ



মোঃ আয়নুল হক
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ ফরহাদ হোসেন
ভূগোল বিভাগ



সাবরিনা শরমিন
ভূগোল বিভাগ



এ কে এম বদরুল হাসান
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



খন্দকার আজিমুল হক পাণ্ডু
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ ফারুক হোসেন
রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ



মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসাইন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোহাম্মদ হারকুনুর রশিদ ডুইয়া
রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ



মোঃ নজরুল ইসলাম
রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ



অসীম কুমার দাস
ভূগোল বিভাগ



দেওয়ান শামছুদোহা
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ শামসুজ্জোহা
শারীরিক শিক্ষা



জি এম এনায়েত আলী
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ



মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ নূরুল ইসলাম
কৃষি শিক্ষা বিভাগ



মোঃ আবু তোহিদ মিয়া
কৃষি শিক্ষা বিভাগ



মোঃ খায়রুল আলম
কৃষি শিক্ষা বিভাগ



মোঃ ফারুক হোসেন
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ



মোঃ মহিউদ্দিন
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ



মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী
গণিত বিভাগ



হোসেন মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন ডুইয়া
বাংলা বিভাগ



মোঃ হিসাব আলী
গণিত বিভাগ



মোঃ ওয়াছিউল ইসলাম
গণিত বিভাগ



মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী
বাংলা বিভাগ



মুহসিনা আক্তার
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ



জাফর ইকবাল
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ



মশিউর রহমান
বাংলা বিভাগ



মোহাম্মদ আল আমিন
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ



মোঃ এনামুল হক
ইংরেজি বিভাগ



সৈয়দ আহমেদ মজুমদার
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ



মোসাঃ ইশরাত জাহান
কৃষিশিক্ষা বিভাগ



তোফাভূনহার
পরিসংখ্যান বিভাগ



রাসেল আহমেদ
কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ



মোঃ আমিনুর রহমান
রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ জসিম উদ্দীন বিশ্বাস
ইংরেজি বিভাগ



রাশেদুল মনসুর
ইংরেজি বিভাগ



হাসিনা ইয়াসমিন
ভূগোল বিভাগ



আবদুল কুদ্দুস
যুক্তিবিদ্যা বিভাগ



মোহাম্মদ মাস্টিনুদ্দীন
ইংরেজি বিভাগ



হরি পদ দেবনাথ
রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ



নিয়ামত উল্লাহ
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



রফিকুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ নাহিদুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ আবু হালেক
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ



তানিয়া বিলকিস শাওন
বাংলা বিভাগ



আয়িশা আনোয়ার
কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ



মোঃ আব্দুল জলিল
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ আশিক ইকবাল
কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ



মোঃ মাসুম বিন ওহাব
রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ



ওমর ফারুক
গণিত বিভাগ



মোঃ হাসান মাহমুদ আবু বকর সিদ্দিক
গণিত বিভাগ



মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



মোঃ আবু সালেহ
গণিত বিভাগ



ফাহিমদা আক্তার
বাংলা বিভাগ



তারেক আহমেদ
বাংলা বিভাগ



মোঃ খায়রুজ্জামান
ইংরেজি বিভাগ



তামান্না আরা
বাংলা বিভাগ



আয়েশা খাতুন
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



মোঃ আবু সাঈদ
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ আহসানুল হক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ



মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ



মোঃ মাজহারুল হক
ইতিহাস বিভাগ



মোঃ মুরাদুজ্জামান আকন্দ
অর্থনীতি বিভাগ



মোঃ জাকারিয়া আলম
ইংরেজি বিভাগ



মু. ওমর ফারুক
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ আব্দুল হামিদ
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ



ফারজানা ইসলাম
বাংলা বিভাগ



মোঃ সাদিউল ইসলাম
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ শফিকুল ইসলাম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ



মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান
গণিত বিভাগ



মোঃ সোলাইমান আলী
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ সাইফুল ইসলাম
গণিত বিভাগ



দুলাল চন্দ্র দাস
গণিত বিভাগ



মোঃ জাহিদুল ইসলাম
ইতিহাস বিভাগ



মোঃ মুজাহিদ আতীক
বাংলা বিভাগ



নূসরাত নাহার
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



মোঃ তারিকুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ



মোঃ আফজাল হোসেন
ইংরেজি বিভাগ



নিশাত নওশিন
বাংলা বিভাগ



আছমা খাতুন
বাংলা বিভাগ



মো. মাজিদুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ



আফসানা আজার
বাংলা বিভাগ



মোঃ রাজিব শেখ
গণিত বিভাগ



মোঃ রাফসানুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ ফোরকান
রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ



সানজিদা আফরিন অনু
ইংরেজি বিভাগ



মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ



ভারত চন্দ্র গৌড়
ক্রীড়া বিভাগ



মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
ক্রীড়া বিভাগ



প্রণব হাওলাদার
হিন্দু ধর্ম বিভাগ



বর্নালী শোষ
সঙ্গীত বিভাগ



আব্দুল মোমেন খান
ভূগোল বিভাগ



মোঃ ছানাউল হক
জীববিদ্যা বিভাগ



মোঃ কামাল হোসেন
কম্পিউটার বিভাগ



সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
কম্পিউটার বিভাগ



ফারহানা আজার
জীববিদ্যা বিভাগ



পরেশ চন্দ্র রায়
গণিত বিভাগ



ওয়াহিদা সুলতানা
ভূগোল বিভাগ



মোঃ রমজান আলী
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ জুবায়ের হোসেন
গণিত বিভাগ



মোঃ জাহিদুজ্জামান জাহিদ
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ



মো. গোলাম আজম
রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ

কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ



বেনজীর আহমেদ
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা



মোঃ শফিকুল ইসলাম
মেডিক্যাল অফিসার



নিয়াজ আব্দুল্লাহ
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মসজিদের স্টাফ



মাওলানা মোঃ মহিউদ্দিন
ইমাম



মোঃ হাসানুজ্জামান
খাদেম

দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ



ফরিদ আহমেদ
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা



মোঃ মতিয়ার রহমান
সহ. লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার



মোঃ অহিউর রহমান
সহকারী স্টোর কর্মকর্তা



মোঃ আমীর সোহেল
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা



মোঃ মাইনুল ইসলাম
ডাটা কন্ট্রোল অপারেটর



মোঃ জুলফিকার আলী ভূট্টো
সহঃ নিরাপত্তা কর্মকর্তা



মোঃ তৌফিক আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী



সৈয়দ শাব্বীর আহমেদ
অফিস সুপারিনটেনডেন্ট



আব্দুল্লাহ মুর্শিদ
হিসাব রক্ষক



মোসাম্মৎ তহমিনা খানম
প্রধান সহকারী



আল- মামুন
পি এ টু প্রিন্সিপাল



মোঃ ইখতিয়ার হোসেন তালুকদার
উচ্চমান সহকারী



মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
উচ্চমান সহকারী



মোঃ সুহেল রানা
স্টোর কিপার



মোঃ আফজাল হোসেন
স্টোর কিপার



রওশন আরা সাধী
মেট্রন



মোঃ খাইরুল ইসলাম
হিসাব সহকারী



মুহাম্মদ শহিদুর রহমান
অফিস সহকারী



মোহাম্মদ লোকমান হোসেন
স্টুয়ার্ড



মোঃ রবিউল ইসলাম
ফার্মাসিস্ট



মুনিরা বেগম
মেট্রন



দিলীপ কুমার পাল
স্টুয়ার্ড



মোছাঃ রোকেয়া আখতার
অফিস সহঃ-কাম-কম্পিউটার অপারেটর



হাবিবুর রহমান
হিসাব সহকারী



মোঃ শহীদুল ইসলাম
হিসাব সহকারী



রিপন মিয়া
হিসাব সহকারী



মোঃ মঈনুল হাসান
গ্রাউন্ডস সুপারিনটেনডেন্ট



হাসিনা খাতুন
অফিস সহকারী



তানজিম হাসান
স্টুয়ার্ড



চন্দন কুমার সরকার
ফার্মাসিষ্ট



মোঃ মঞ্জুরুল হক
স্টুয়ার্ড



মোহাম্মদ লিটন মিয়া
স্টোর এ্যাসিস্টেন্ট



মোঃ মাহবুব হাসান
অফিস সহঃ-কাম-কম্পিউটার অপারেটর



খন্দকার ওয়ালিদ
অফিস সহকারী



মোঃ আব্দুল খালেক
গাড়ি চালক



মোঃ শহীদউল্লাহ
গাড়ি চালক



মোঃ মমতাজ উদ্দিন মজুমদার
ইলেকট্রিশিয়ান



চাঁদ মিয়া
প্লাম্বার



নাসির উদ্দিন আহমেদ
ওয়্যারম্যান



মোঃ ছাদেক আলী
কার্টমিস্ত্রী



মোঃ আমজাদ হোসেন
টেবিলবয়



মেখিউ রবীন্দ্র মুহুরী
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট



শ্রী সাঈয়া
হেড সুইপার



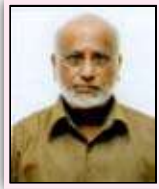
আমিনুল হক
টেবিলবয়



আবু সাঈদ মোল্লা
হাউস মালি



মোঃ শাহজাহান প্রধানিয়া
টেবিলবয়



আছাদুজ্জামান হাওলাদার
হাউস গার্ড



মোঃ আব্দুল জলিল
বার্চি



মোঃ রেজাউল আলম খান
মেশন (রাজমিস্ত্রী)



মোঃ নূরুল ইসলাম
সহকারী বার্চি



মোঃ মোস্তফা
বার্চি



মোসাম্মা জরিনা খাতুন
আয়া



মোঃ আব্দুর রশিদ
বার্চি



মোঃ গোলাম মোস্তফা
হেড গার্ড



মোঃ আব্দুল মান্নান সিকদার
পাখার হেল্পার



মোঃ হারুন অর রশীদ
ল্যাবঃ এটেনডেন্ট



মোঃ ইউনুস
লাইব্রেরি এটেনডেন্ট



মোঃ আবুল কালাম
এমএলএসএস



মোঃ জাকির হোসেন
ল্যাবঃ এটেনডেন্ট



মোঃ ইয়ার আলী
বার্চি



মোঃ আইয়ুব আলী
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট



মোহাম্মদ আলী খান
এমএলএসএস



মোঃ খলিলুর রহমান
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট



মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
এমএলএসএস



মোঃ ছাবেদ আলী
রং মন্ত্রী



শ্রী কৃষান দাস
সুইপার সেন্ট্রাল



মোঃ জিন্নাহ
কাপেটার (কাঠমিস্ত্রী) হেলপার



মোঃ জাকির হোসেন মনু
টেবিলবয়



মোঃ আব্বাস আলী
সহকারী বাবুর্চি



মোঃ ফারুকুল ইসলাম
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট



মোঃ আবজাল হোসেন
সহকারী বাবুর্চি



মোঃ সেলিম
টেবিলবয়



মোঃ কামাল হোসেন
বাবুর্চি



মোঃ আব্দুর রশিদ
এমএলএসএস



মোঃ সোহরাব হোসেন
বাবুর্চি



মোঃ দেলোয়ার
সহকারী বাবুর্চি



মোঃ মনির হোসেন
হেড মালী



তিমথী পেনাপেটী সবুজ
সুইপার সেন্ট্রাল



মোঃ আমিনুল ইসলাম
টেবিলবয়



মোঃ জাকির হোসেন
ওয়ার্ডবয়



মোঃ রেজাউল ইসলাম
গেইট দারোয়ান



মোঃ শহীদুল ইসলাম
ম্যাট



মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন বাবু
সুইপার হোস্টেল



মোঃ হানিফ
সুইপার, শিক্ষা ভবন-১



মোঃ মোকহেদ আলী খাঁন
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ আনোয়ারুল হক
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ ফারুক সিকদার
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ কুদ্দুস মোল্লা
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ নজরুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ কামাল হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ মজিবুর রহমান
ওয়ার্ডবয়



মোঃ আব্দুর রহমান
হাউস গার্ড



আব্দুল জলিল মিয়া
ওয়ার্ডবয়



মোঃ আল আমিন খোন্দকার
ওয়ার্ডবয়



মোঃ শহীদুল ইসলাম
গ্রাউন্ডসম্যান



শাহ মোঃ আজিজুল হক
ওয়ার্ডবয়



মোঃ বদিউর রহমান
ম্যাট



গাজী মোস্তফা কামাল
টেবিলবয়



মোঃ মোকহেদুল হক
টেবিলবয়



মোঃ মহিরুল হক
ম্যাট



মোঃ মোকলেচুর রহমান
স্টোর অর্ডারলি



মোঃ মফ্তু মোল্লা
মালি (সেন্ট্রাল)



মোঃ নূরে আলম সিকদার
ম্যাট



মোঃ আনোয়ার হোসেন
ওয়ার্ডবয়



মোঃ নাপির উদ্দিন
হাউস মালি



মোঃ আব্দুল হক
হাউস গার্ড



মোঃ সাহাদাত হোসেন
ওয়ার্ডবয়



মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
হাউস মালি



মোঃ শহীদুল ইসলাম
হাউস মালি



মোঃ আব্দুল্লাহ
টেবিলবয়



মোঃ আজমল হোসেন
গ্রাউন্ডসম্যান



মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
ওয়ার্ডবয়



মোঃ আব্দুল বাহেদ
টেবিলবয়



মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
ওয়ার্ডবয়



মোঃ মজিবুর রহমান
গেইট দারওয়ান



মোঃ জাহিরুল ইসলাম
গ্রাউন্ডসম্যান



মোঃ রফিকুল ইসলাম
পাম্প অপারেটর



মোঃ সাইফুল ইসলাম (মহিউদ্দিন)
সহকারী বারুচি



মুহাম্মদ শরীফ হোসেন
গ্রাউন্ডসম্যান



মোছাঃ শিউলি আক্তার
হোস্টেল সুইপার



মোঃ সাইফুল ইসলাম (শহীদ)
গ্রাউন্ডসম্যান



মোঃ আহসানুল হক
টেক্সবুক বেয়ারার



আব্দুর রশিদ শেখ
এমএলএসএস



খালেদ পারভেজ
এমএলএসএস



আব্দুল কাদের
এমএলএসএস



আনোয়ার হোসেন খান
নিরাপত্তা প্রহরী



আবদুস সালাম মিঞা
নার্সিং এ্যাসিস্টেন্ট



মোঃ জালাল উদ্দিন
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ জাহিরুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ হেমায়েত হোসেন
এমএলএসএস



মোঃ ওসমান আলী
ওয়ারম্যান



মোঃ মফিজুল ইসলাম
ওয়ারম্যান



মোঃ শহিদুজ্জামান
হাউস গার্ড



মোঃ রাসেল বেপারী
হাউস গার্ড



মোঃ আবু সায়েদ
লাইব্রেরি এটেন্ডেন্ট



মোঃ রিপন আলী
সুইপার



মোসাম্মত লাইলী আক্তার
সুইপার



মোঃ স্বপন হোসেন
সুইপার



আকলিমা বেগম
সুইপার



এ জেড এম মাইনুল আকবর
সুইপার



নূর মোহাম্মদ কাজল
বৈদ্যুতিক সহকারী



মোঃ আকবুল ইসলাম
টেবিলবয়



সেলিম মিয়া
টেবিলবয়



মোঃ মাইদুর রহমান মাসুম
টেবিলবয়



মোঃ রাসেল আলী
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ নবীজল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ খলিলুর রহমান
নিরাপত্তা প্রহরী



মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ঝাড়ুদার



হাফিজ মোল্লা
গেইট দারওয়ান



মোঃ হানিফ
গ্রাউন্ডসম্যান



মুকুল
মালি (সেন্ট্রাল)



মোঃ দারুল মিয়া
পেইন্টার (রং মিস্ট্রী)



মোঃ সোহরাব আলী
মেশিন (রাজমিস্ট্রী)



মোঃ সোহাগ মিয়া
ল্যাবরেটরী এটেনডেন্ট



তপন কুমার পাল
পাম্প অপারেটর



রিপন মাহমুদ
হোস্টেল সুইপার



মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
টেবিলবয়



মোঃ রাসেল
টেবিলবয়



রাহাত আহমেদ
এমএলএসএস



মোঃ ইমদাদুল হক
হাউস মালি



পি. কে জেমস লুক
সুইপার (একাডেমিক)



মোঃ লাভলু মিয়া
হাউস মালি



মোঃ হাজারুল ইসলাম
সুইপার (সেন্ট্রাল)



সুজন কুমার পাল
সুইপার (সেন্ট্রাল)



আবু ছাহিদ দিপু
গেইট দারওয়ান



মোঃ জাকিরুল ইসলাম
এমএলএসএস



মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন
এমএলএসএস



মোঃ আব্দুল হালিম রেজা
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)



জিয়াউর রহমান
ইলেকট্রিশিয়ান মেশিন অপারেটর



মোঃ মনজুর আলী
হাউস মালি



মোঃ মানিক মিয়া
সুইপার



অধ্যক্ষের সাথে প্রভাতি শাখার শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষের সাথে দিবা শাখার শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষের সাথে প্রধান শাখা, মেডিক্যাল এবং অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ



অধ্যক্ষের সাথে হাউসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ



অধ্যক্ষের সাথে প্রশাসন শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ



অধ্যক্ষের সাথে বিএনসিসি শিক্ষক এবং ক্যাডেট দল



অধ্যক্ষের সাথে স্কাউট শিক্ষক এবং স্কাউট দল



অধ্যক্ষের সাথে বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতার আহবায়ক এবং বিজয়ী ছাত্রবৃন্দ

সূচিপত্র

বিষয় শিরোনাম

পৃষ্ঠা নম্বর

- | | |
|--|-----|
| ১. হাউস প্রতিবেদন | ২২ |
| ২. সহপাঠ্যক্রমিক ও উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন | ২৮ |
| ৩. টিচার্স কর্নার | ৩৩ |
| ৪. স্টুডেন্টস কর্নার | ৫১ |
| ৫. কৃতী শিক্ষার্থীদের প্রতিবেদন | ১৩৫ |
| ৬. চিত্রশৈলী | ১৩৬ |
| ৭. স্টুডেন্টস গ্যালারি | ১৪৩ |
| ৮. স্মৃতিময় বর্ণিল-২০১৮ | ১৮৮ |
| ৯. স্বাপনা ও নিসর্গ | ১৯৮ |
| ১০. স্মৃতি অমলিন | ১৯৯ |



ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ'। প্রতিষ্ঠানের ছয়টি হাউসের মধ্যে ড. কুদরত-ই-খুদা হাউস অন্যতম। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত এ হাউসের প্রথম নাম ছিল জিন্নাহ হাউস। স্বাধীনতারপর হাউসটির নামকরণ করা হয় ১ নম্বর হাউস এবং পরবর্তীকালে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নামে নামকরণ করা হয় হাউসটির। নানা ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ স্বর্ণালী স্মৃতি ধারণ করে সকলের প্রতি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে হাউসটি। প্রকৃতিপরিবেষ্টিত বর্গাকৃতির দ্বিতল এ হাউসের সুপারিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। হাউসটির ঠিক মাঝখানে রয়েছে পুষ্পশোভিত মনোরম ফুলের বাগান এবং হাউসের দেয়ালে শোভাবর্ধন করছে ড. কুদরত-ই-খুদার সুদৃশ্য ম্যুরাল। হাউসটি পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া তাঁদের সহযোগিতার জন্য রয়েছেন একজন মেট্রন সহ ১১ জন স্টাফ। তাঁরা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে হাউসের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার জন্য হাউসে রয়েছে ১০ জন ছাত্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। লেখাপড়া ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে ড. কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রদের সফলতার রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবং জেএসসি পরীক্ষায় এ হাউসের সকল ছাত্রই জিপিএ-৫ পেয়েছে। এছাড়া কলেজের আন্তঃহাউস বানান প্রতিযোগিতা ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় এ হাউসের ছাত্ররা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন ২০১৬ সালে রানার্স আপ ও ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে পুনরায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এবং বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় টানা অষ্টম বারের মত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। আন্তঃহাউস ফুটবল টুর্নামেন্টে পর পর ১১ বার ও আন্তঃহাউস ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পর পর ৪ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ২০১৯ সালে দেয়াল পত্রিকা ও বাগান প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

ড. কুদরত-ই-খুদা হাউসের কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক এটাই প্রত্যাশা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

ড. কুদরত-ই-খুদা হাউস

হাউসমাস্টার
নূরুন্নাহার

হাউসটিউটর
মুহসিনা আক্তার

হাউসএন্ডার
সৌম্য সৃজিত খীসা

হাউসপ্রিফেক্ট
আবদুল কাদের অলিন



জয়নুল আবেদিন হাউস

হাউসমাস্টার

আসাদুল হক

হাউসটিউটর

নার্গিস জাহান কনক

হাউসএন্ডার

তৌফিক রহমান শুভ

হাউসপ্রিফেঙ্কট

ইনাম আহমেদ চৌধুরী

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি আবাসিক হাউসের মধ্যে অন্যতম হলো জয়নুল আবেদিন হাউস। ১৯৬১ সালের ১ মে 'আউয়ুব হাউস' নামে এ হাউসটি যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতারপর দেশমাতৃকার অমর সন্তান, বাংলাদেশের মহান চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নামানুসারে এ হাউসটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় জয়নুল আবেদিন হাউস।

হাউসটির অবকাঠামো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং মনোরম। লাল সিরামিক ইটের তৈরি দোতলা এ হাউসটির সবুজ-শ্যামল পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে। হাউসটির দেয়ালে শোভা বর্ধন করছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের এক সপ্রতিভ ম্যুরাল। হাউসটির অভ্যন্তরে রয়েছে বর্গাকৃতির একটি সুন্দর বাগান। হাউসটিতে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে আটটি বড় কক্ষ এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক চারটি বিশেষ কক্ষ। এছাড়া এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির এক ডাইনিং হল, টিভি ও ইনডোর গেমসের সুবিধাসমৃদ্ধ একটি কমনরুম এবং প্রার্থনার জন্য একটি প্রেয়ার রুম। এ হাউসে বর্তমানে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। ছাত্রদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য ১০ জন কর্মচারী এবং একজন মেট্রন রয়েছে। শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের এক অনুপম সমন্বয় জয়নুল আবেদিন হাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভোরবেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই রুটিনমাসিক করে। এ হাউসের ছাত্ররা বরাবরই প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জন করে থাকে। ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের পি.ই.সি ও জে.এস.সি পরীক্ষায় এ হাউসের সকল ছাত্র জি.পি.এ-৫ অর্জন করেছে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ২০১৬ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা ও বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় জয়নুল আবেদিন হাউস। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দেয়াল পত্রিকায় রানার্স আপ এবং ২০১৮ সালে বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এ হাউস। ২০১৯ সালে বাগান প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয় হাউসটি, ২০১৭ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এবং সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ডলিবল ও ইনডোর গেমসের চ্যাম্পিয়ন জয়নুল আবেদিন হাউস। ২০১৮ সালে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয় এ হাউস।

ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে প্রিফেঙ্কটোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসে প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে রয়েছে যেমন গভীর হৃদয়তা, তেমনি রয়েছে ছাত্রদের সাথে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুনিবিড় সম্পর্ক। মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা- জয়নুল আবেদিন হাউসের কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক। মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।



ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে লালন শাহ হাউস অন্যতম। ১৯৬০ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ হাউসের ভবনটি কলেজের 'মেডিকেল সেন্টার' হিসেবে ব্যবহৃত হত। ১৯৭৭ সালে তা আবাসিক ছাত্রাবাস হিসেবে শুভযাত্রা করে। শুরুতে এটি '৩ নম্বর হাউস' নামে পরিচিত থাকলেও ১৯৭৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ বিখ্যাত বাউল সাধক লালন শাহ এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন 'লালন শাহ হাউস'।

পূর্ব ও পশ্চিমে লম্বিত ও প্রকৃতিপরিবেষ্টিত দ্বিতল লালন শাহ হাউসের সুপারিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। শিক্ষাভবন-১ ও অধ্যক্ষের বাসভবনের সন্নিহিতে অবস্থিত এ হাউসে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ২৯টি কক্ষ। এসব কক্ষে ১১০ জন ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষাসহায়ক পরিবেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা নিজ গৃহের মতোই অবস্থান করে এ হাউসে। ছাত্রদের বসবাসের কক্ষ ছাড়াও এ হাউসে রয়েছে অফিসরুম, কমনরুম, ডাইনিং হল, কিচেনস্টোর ও স্টাফরুম। হাউসের ছাত্রদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনা ও সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিয়োজিত আছেন ১ জন হাউসমাস্টার ও ১ জন হাউসটিউটর। তাঁদের সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন করে স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, বাবুর্চি, সহকারী বাবুর্চি, ম্যাট, মালি, দারোয়ান, সুইপার ও দুইজন টেবিলবয়। এ হাউসের প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন আছে গভীর হৃদয়তা, তেমনি ছাত্রদের সঙ্গে হাউসের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক।

কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ গ্রেড অর্জন করে থাকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডেও লালন শাহ হাউসের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্য দৃষ্ণীয়। আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা ও বাগান প্রতিযোগিতা-২০১৮ তে এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়াও এ হাউস আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৯ এ রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৯ এ চ্যাম্পিয়ন এবং বাগান প্রতিযোগিতা-২০১৯ এ রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

লালন শাহ হাউস

হাউসমাস্টার
প্রশান্ত চক্রবর্তী

হাউসটিউটর
মোঃ জুবায়ের হোসেন

হাউসএন্ডার
আসিফ আব্দুল্লাহ ওসান

হাউসপ্রিফেক্ট
আবদুর রহমান সাকিব



নাজরুল ইসলাম হাউস

হাউসমাস্টার
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

হাউসটিউটর
মোঃ আবু ছালেক

হাউসএন্ডার
হুদয় মাহমুদ

হাউসপ্রিফেক্ট
মেহেদী হাসান শোভন

“গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
নহে কিছু মহীয়ান”

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ একটি বিশেষায়িত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে আবাসিক ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠানের ছয়টি হাউসের মধ্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামানুসারে রয়েছে নাজরুল ইসলাম হাউস। এ হাউসে বর্তমানে নবম-দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিং হল, টিভি এবং ইনডোর গেমসের সুবিধাসমৃদ্ধ একটি কমনরুম, প্রার্থনার জন্য একটি প্রেয়াররুম, ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে বিভিন্ন নামের কক্ষ। হাউসটির ঠিক মধ্যখানে রয়েছে একটি পুষ্পশোভিত মনোরম ফুলের বাগান।

হাউসের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাঁদের সহায়তার জন্য রয়েছে একজন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারওয়ান, মালি ও বাবুর্চিসহ মোট ১০ জন কর্মচারী। ছাত্রদের নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ও হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে রয়েছে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসে প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে গভীর হৃদয়তা, তেমনি ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক, প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। বিদ্রোহী কবির আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হাউসের ছাত্ররা ভোরবেলা পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি কাজই রুটিন মারফিক করে। এর মধ্যে তাদের পড়াশোনার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয় সর্বাত্মে। ২০১৮ সালের আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ, দেয়াল পত্রিকায় রানার্সআপ, আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৯ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, দেয়ালপত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র শহীদ শেখ জামাল এ কলেজের ছাত্র থাকাকালে নাজরুল ইসলাম হাউসের আবাসিক ছাত্র ছিলেন এবং এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ২০১০ সালে কলেজের ৫০ বছরপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নেহভাজন ছোটভাইয়ের স্মৃতিবিজড়িত এ হাউস পরিদর্শনে আসেন এবং হাউসের চমৎকার পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হন।



“কর্মভার নব প্রভাতে নব সেবকের হাতে করে যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাব ঘোষণা করে তোমায় আহ্বান”

‘উৎকর্ষ সাধনে অদম্য’ এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ৬টি হাউসের মধ্যে অন্যতম হাউস ফজলুল হক হাউস। দেশমাতৃকার অমর সন্তান কৃষকবন্ধু, অসাধারণ বাগী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এ হাউসের প্রতিটি কাজে তাঁর দেশপ্রেম ও সুমহান আদর্শের অনিন্দ্য প্রকাশ ঘটে। শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল ফজলুল হক হাউসে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ছোট-বড় ২৮টি রুম, একটি কমনরুম ও সুবিশাল ডাইনিং হল। হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছেন একজন করে স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয় দারওয়ান, মালি ও বাবুর্চিসহ মোট ১০ জন কর্মচারী। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের জন্য রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। ‘ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ’ এ সংস্কৃত শ্লোকে হাউসের ছাত্ররা মনে প্রাণে বিশ্বাসী। তাই কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে।

ভোরবেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই রুটিনমাসিক করে। এর মধ্যে তাদের পড়াশুনার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয় সর্বাত্মে। ২০১৮ সালের ৫৮তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। একই বছরে আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৯ সালেও আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সর্বক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ফজলুল হক হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক- এটাই প্রত্যাশা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন।

ফজলুল হক হাউস

হাউসমাস্টার
মুহাম্মদ ওমর ফারুক

হাউসটিউটর
মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী

হাউসএন্ডার
এস. এম. হাসান শফি

হাউসপ্রিফেক্ট
আজহারুল ইসলাম অনিক



ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস

হাউসমাস্টার
মোহাম্মদ সেলিম

হাউসটিউটর
তারেক আহমেদ

হাউসএন্ডার
আসিফ মাহমুদ

হাউসপ্রিফেট
মোঃ সাকি আল মুইজ খ্রুব

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম। বিশিষ্ট ভাষাবিদ, জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে হাউসটি নবীন। দিবা শাখার ছাত্রদের আবাসন সমস্যা নিরসনে ২০ মার্চ ২০০৮ সালে এ হাউসের যাত্রা শুরু হয়। হাউসের আসন সংখ্যা ৮৮। এ হাউসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাদের সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন করে স্টুয়ার্ড, বাবুর্চি, সহকারী বাবুর্চি, ম্যাট, ওয়ার্ডবয়, দারওয়ান, মালি, সুইপার ও দুইজন টেবিলবয়। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য হাউস কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন।

হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। হাউসের সামনে রয়েছে সুদৃশ্য ফুলবাগান ও একটি সুবিশাল মাঠ। পশ্চিম দিকে একটি আম বাগান ও পেয়ারা বাগান। পূর্বে ফুলবাগান এবং পেছনে রয়েছে আরেকটি পেয়ারা বাগান। সবুজে ঘেরা এ হাউসের দিকে তাকালে মন জুড়িয়ে যায় এবং শান্তির আশ্বাস মেলে। পাঁচতলা এ হাউসের বিভিন্ন তলায় রঙিন আলো হাউসের সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এ মনোরম পরিবেশ ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগ আরো বৃদ্ধি করেছে। শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় এ হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ছাত্ররা ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে মা-মাটি-মানুষের ভালোবাসা ও ভক্তির অনুশীলনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় এ হাউস পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ২০১৪ সালে আন্তঃহাউস বাল্কেটবল প্রতিযোগিতায় এবং ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও ২০১৮ সালে রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৭ সালে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও ২০১৫, ২০১৮ সালে রানার্স আপ এবং ২০১৮ সালে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও ২০১৬, ২০১৭ সালে রানার্স আপ হয়। ২০১৮ সালে আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এভাবে এ হাউসের ছাত্ররা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও নানা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা এবং নৈপুণ্য প্রমাণ করে আসছে।



শিক্ষা, সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

মোঃ মেসবউল হক

সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

কলেজ পরিচিতি

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের আদলে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় ৫২ একর জমির উপর 'রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল' (পরবর্তীকালে 'ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ') প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬০ সালের ০৬ মে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সরাসরি পরিচালিত হলেও ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করে। ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করত প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস এর হাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা ভার অর্পণ করে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় বিদ্যালয়টির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এর স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা বহাল রাখে। ১৯৬৭ সালের ০৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। স্বাধীনতারপর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা সচিবকে পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করে। অদ্যাবধি উক্ত বোর্ড অব গভর্নরসই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির আওতায় ১৯৯৩ সালে এ প্রতিষ্ঠানে ২য় (ডে) শিফট চালু করা হয়। বর্তমানে উভয় শিফটে ৩য় থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভাষানে প্রায় ৫০০০ জন ছাত্র আবাসিক/ অনাবাসিক হিসেবে অধ্যয়ন করছে।

যুগোপযোগী শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলির সুসম বিকাশ সাধন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বৃহত্তর কর্মজীবন ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী সূনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিচে ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে এ কলেজের শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক ক্ষেত্রে সাফল্য এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্ররা শতকরা প্রায় একশত ভাগ পাশ করে থাকে। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র বোর্ডবৃত্তি পেয়ে থাকে। নিচে ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের চিত্র তুলে ধরা হলো:

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল-২০১৮

পরীক্ষার নাম	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	জিপিএ-৫	পাশের হার
পিইসি	৩০১	৩০১	২৯৯	১০০%
জেএসসি	২৯০	২৯০	২৭১	১০০%
এসএসসি	৫০৭	৫০৭	৪১১	১০০%
এইচএসসি	৮৬৮	৮৬৭	৫৮৯	৯৯.৮৯%

সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা বছরব্যাপী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায়ও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করে থাকে। নিচে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্রদের অর্জিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হলো :

১. ০৪-০৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত 1st Preparatorians Language Festival:

- 🏆 Language Olympiad (Senior) : মুস্তাভী শেখ (একাদশ শ্রেণি) -১ম
- 🏆 Spelling Olympiad (Senior) : ত্বা-সিন রহমান (একাদশ শ্রেণি) -২য়
- 🏆 Spelling Olympiad (Senior) : সাইফুল্লাহ আনসারি (একাদশ শ্রেণি) -২য়
- 🏆 Book Based Quiz (Senior) : ত্বা-সিন রহমান (একাদশ শ্রেণি) -২য়
- 🏆 Debate (Secondary) : DRMC বিতর্ক দল-চ্যাম্পিয়ন
- 🏆 বিতর্কিকরা হলো-
 - ১। জুহায়ের ভূইয়া (নবম শ্রেণি)
 - ২। শুভজিত মণ্ডল (নবম শ্রেণি)
 - ৩। তামহিদুল ইসলাম (নবম শ্রেণি)

২. ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত থানা পর্যায়ে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা:

- 🏆 ছড়া গান ও লোকগীতি (ক বিভাগ): সাকিল ইসলাম (তৃতীয় শ্রেণি) -১ম
 - 🏆 উপস্থিত অভিনয় (খ বিভাগ): হাসান মুরসালিন শুভ (সপ্তম শ্রেণি) -১ম
 - 🏆 ধারাবাহিক গল্প বলা (খ বিভাগ): হাসান মুরসালিন শুভ (সপ্তম শ্রেণি) -১ম
 - 🏆 ভাব সংগীত (খ বিভাগ): অর্জন রহমান (সপ্তম শ্রেণি) -১ম
 - 🏆 হামদ ও নাত (খ বিভাগ): নাবেদ রহমান অর্ক (অষ্টম শ্রেণি) -১ম
 - 🏆 লোক নৃত্য (খ বিভাগ): জাওয়াদ মোঃ নাহিন (সপ্তম শ্রেণি) -১ম
 - 🏆 তবলা (গ বিভাগ) : ঋদ্ধ্য নিরুপম মণ্ডল (নবম শ্রেণি) -১ম
 - 🏆 উপস্থিত অভিনয় (গ বিভাগ): শাররাফি সাফিন (দশম শ্রেণি) -১ম
 - 🏆 উপস্থিত বক্তৃতা (গ বিভাগ): তামহিদুল ইসলাম (নবম শ্রেণি) -১ম
- উল্লেখ্য, ঋদ্ধ্য নিরুপম মণ্ডল তবলায় জেলা পর্যায়ে ১ম হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৩. ২০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের থানা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা:

- 🏆 রবীন্দ্র সংগীত (ক বিভাগ): ওয়াজিউর রহমান প্রথম (অষ্টম শ্রেণি) -১ম
- 🏆 উচ্চাঙ্গ সংগীত (ক বিভাগ): অর্জন রহমান (সপ্তম শ্রেণি) -১ম
- 🏆 রচনা (ক বিভাগ): আহনাফ আবরার হাসিন (অষ্টম শ্রেণি) -১ম
- 🏆 একক বিতর্ক (খ বিভাগ): তামহিদুল ইসলাম (নবম শ্রেণি) -১ম
- 🏆 রবীন্দ্র সংগীত (খ বিভাগ): রাতুল দেবনাথ (দশম শ্রেণি) -১ম
- 🏆 উপস্থিত অভিনয় (গ বিভাগ): সামদানি প্রত্যয় (একাদশ শ্রেণি) -১ম

উল্লেখ্য যে, ঢাকা মহানগর পর্যায়ে ক বিভাগে রবীন্দ্র সংগীতে ওয়াজিউর রহমান প্রথম এবং একক বিতর্কে তামহিদুল ইসলাম ১ম হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৪. ২৫-২৭ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত BCSIR আয়োজিত বিজ্ঞান ও শিল্প প্রযুক্তি মেলা:

- Project Display (Junior) : রানার্স আপ-
- ১। তাহমিদ জারিফ (ষষ্ঠ শ্রেণি)
 - ২। মুস্তাকিম মাহফুজ (ষষ্ঠ শ্রেণি)

৫. ০১-০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে নটরডেম কলেজে অনুষ্ঠিত Language Fest :

- Turn the coat (Secondary): তামহিদুল ইসলাম (নবম শ্রেণি) -১ম

৬. ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত থানা পর্যায়ে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় Secondary Group এ ১ম হওয়ার গৌরব অর্জন করে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ সংগীত দল।

দলের সদস্যরা হলো:

- ১। সৌমিত্র সাহা (দশম শ্রেণি)
- ২। অরিত্র ভট্টাচার্য (দশম শ্রেণি)

- ৩। রাতুল দেবনাথ (দশম শ্রেণি)
 ৪। অরিত্র সেন (দশম শ্রেণি)
 ৫। অনিবার্ণ ঘোষ (দশম শ্রেণি)
 ৬। জায়েদ আবদুল্লাহ (নবম শ্রেণি)
 ৭। জয়তু কর্মকার (নবম শ্রেণি)
 ৮। অরুণাময় দাস (নবম শ্রেণি)
 ৯। প্রাচুর্য হালদার (অষ্টম শ্রেণি)
 ১০। নাবেদ রহমান অর্ক (অষ্টম শ্রেণি)
৭. ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ কর্তৃক আয়োজিত National Carnival:
 Analytical Puzzle : আতা-ই-ইলাহী (একাদশ শ্রেণি) -১ম
 Rubic's Cube : সিয়াম চৌধুরী (দশম শ্রেণি) -২য়
 Sudoku : সাহানুর ইসলাম (একাদশ শ্রেণি) -২য়
 Graphics : সৈয়দ শাহরিয়ার (দশম শ্রেণি) -২য়
 English Extempore Speech : তামহিদুল ইসলাম (নবম শ্রেণি) -১ম
 Sports Quiz : রেদওয়ান রেহাম (একাদশ শ্রেণি) -১ম
 Pop Culture Quiz : রেদওয়ান রেহাম (একাদশ শ্রেণি) -২য়
 Team Based Quiz : রানার্স আপ-
 ১। রেদওয়ান রেহাম (একাদশ শ্রেণি)
 ২। ফারহান ইশরাক (একাদশ শ্রেণি)
 ৩। শাইয়ান ইসতেহাদ (একাদশ শ্রেণি)
৮. ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা: সাদমান সাকিব রাদিন (অষ্টম শ্রেণি) -১ম
৯. ৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে BAF Shaheen College আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সিনিয়র ও জুনিয়র গ্রুপে DRMC বিতর্ক দল রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সিনিয়র গ্রুপের বিতর্কিকরা হলো:
 ১। ফখরুল আলম নিয়ন (একাদশ শ্রেণি)
 ২। আহসান হাবীব তন্ময় (একাদশ শ্রেণি)
 ৩। অনিন্দ্য সাহা (একাদশ শ্রেণি)
 জুনিয়র গ্রুপের বিতর্কিকরা হলো-
 ১। তামহিদুল ইসলাম (নবম শ্রেণি)
 ২। শুভজিত মণ্ডল (নবম শ্রেণি)
 ৩। জুহায়ের ভূঁইয়া (নবম শ্রেণি)
১০. ২৫ মার্চ ২০১৮ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা: আহনাফ আবরার (অষ্টম শ্রেণি) -১ম
১১. ৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা মহানগরীর শিক্ষা অঞ্চল-৮ এ সৃজনশীল মেধা অব্বেষণ প্রতিযোগিতা:
 ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ: নবম-দশম শ্রেণির গ্রুপ-তামহিদুল ইসলাম (নবম শ্রেণি) -১ম
 একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির গ্রুপ-ওয়াসী আজসাইন চৌধুরী (একাদশ শ্রেণি) -১ম
 বিজ্ঞান বিভাগ: ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির গ্রুপ- সামিন আরহাম (অষ্টম শ্রেণি) -১ম
 নবম-দশম শ্রেণির গ্রুপ-শেখ আনুফি হোসেন (দশম শ্রেণি) -১ম
 একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির গ্রুপ-সুদীপ্ত মণ্ডল (একাদশ শ্রেণি) -১ম
 গণিত ও কম্পিউটার বিভাগ: একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির গ্রুপ-মোঃ মুহাইমিনুল ইসলাম (একাদশ শ্রেণি) -১ম
 বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ বিভাগ: ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির গ্রুপ-রায়িদ কিবরিয়া (অষ্টম শ্রেণি) -১ম
 নবম-দশম শ্রেণির গ্রুপ-ত্বাহা ইমতিয়াজ আলিম (নবম শ্রেণি) -১ম
 একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির গ্রুপ-ফারহান ইসরাক হক (একাদশ শ্রেণি) -১ম
 উল্লেখ্য, ঢাকা মহানগরী পর্যায়ে বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ বিভাগে নবম-দশম শ্রেণির গ্রুপে ত্বাহা ইমতিয়াজ আলিম ১ম হয়।

১২. ৪ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এইচএসবিসি-প্রথম আলো ভাষা প্রতিযোগের আঞ্চলিক উৎসব (ঢাকা) এ প্রাথমিক বিভাগের প্রতিযোগিতা:
- ১। ওমর বিন আরিফ (ষষ্ঠ শ্রেণি)-১ম
 - ২। অদিশু বড়ুয়া (পঞ্চম শ্রেণি)-১ম
 - ৩। অনিরুদ্ধ সাচী (পঞ্চম শ্রেণি)-২য়
১৩. ১০-১২ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত 2nd Ideal English Language Carnival:
- Turn Cold (Senior): তামহিদুল ইসলাম (নবম শ্রেণি) -১ম
 - Extempore Speech (Senior): তামহিদুল ইসলাম (নবম শ্রেণি) -২য়
 - Turn the Coat (College): ত্বা-সিন রহমান (দ্বাদশ শ্রেণি) -১ম
 - Turn the Coat (College): মোঃ তৌফিকুর রহমান (দশম শ্রেণি) -২য়
 - Literature Quiz (College): ত্বা-সিন রহমান (দ্বাদশ শ্রেণি) -২য়
১৪. ১১-১৩ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত 2nd Josephite Business Festival:
- Business Extempore Speech (Senior): ত্বা-সিন রহমান (দ্বাদশ শ্রেণি) -১ম
 - General Knowledge Olympiad (Senior): ত্বা-সিন রহমান (দ্বাদশ শ্রেণি) -২য়
১৫. ২৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে AIUB আয়োজিত Cisco IOT Itackathon প্রতিযোগিতায় DRMC চ্যাম্পিয়ান হয়। দলের সদস্যরা হলো:
- ১। সুদীপ্ত মণ্ডল (দ্বাদশ শ্রেণি)
 - ২। আবদুল্লা আল মারুফ (দ্বাদশ শ্রেণি)
 - ৩। রাইয়ান আল নাহিয়ান (দ্বাদশ শ্রেণি)
 - ৪। মুহাইমিনুল জামি (দ্বাদশ শ্রেণি)
 - ৫। রশিদ আরিফ হৃদয় (দ্বাদশ শ্রেণি)
১৬. ৩১ আগস্ট-১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত 16 Holy Cross Science Festival:
- Math Olympial: আহমেদ ইত্তিহাদ (দশম শ্রেণি) -১ম
 - Biology Project Display -তে ১ম হয়
 - ১। নইমুল হোসেন (দ্বাদশ শ্রেণি)
 - ২। নুর মোহাম্মদ (দ্বাদশ শ্রেণি)
 - ৩। আকির রশিদ গালিব (দ্বাদশ শ্রেণি)
১৭. ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে St. Gregory স্কুল আয়োজিত GDC National বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় DRMC। বিতর্কিকরা হলো:
- ১। তামহিদুল ইসলাম (নবম শ্রেণি)
 - ২। শুভজিত মণ্ডল (নবম শ্রেণি)
 - ৩। জুহায়ের ভূঁইয়া (নবম শ্রেণি)
১৮. ১-৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কক্সবাজারে আয়োজিত Walton 2nd Beach Taekwondo প্রতিযোগিতায় DRMC এর ৪ জন ছাত্র স্বর্ণপদক পায়:
- ১। ইহতেশামুল হক সানি (দশম শ্রেণি)
 - ২। রিয়াজুল হক আরেফিন (দশম শ্রেণি)
 - ৩। শাহরিয়ার শান্ত (দশম শ্রেণি)
 - ৪। কাজী শাফিন আলম (একাদশ শ্রেণি)
১৯. ১৭-১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিযোগিতা:
- সাধারণ নৃত্য (খ গ্রুপ)-জাওয়াদ মোঃ নাহীন (সপ্তম শ্রেণি) -১ম
 - চিত্রাঙ্কন (গ গ্রুপ)-জাওয়াদ মোঃ নাহীন (সপ্তম শ্রেণি) -১ম
২০. ২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বিজয় ফুল উৎসবের জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা:
- গল্প রচনা (খ গ্রুপ): রাশেদুল ইসলাম (ষষ্ঠ শ্রেণি) -১ম
 - দলগত জাতীয় সংগীত (গ গ্রুপ): ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ -১ম
- সদস্যরা হলো-

- ১। নন্দিত বণিক (একাদশ শ্রেণি)
- ২। আরিয়ান রহমান (একাদশ শ্রেণি)
- ৩। সৌমিত্র শর্মা উৎস (একাদশ শ্রেণি)
- ৫। এস.এম ইমতিয়াজ মাহমুদ (একাদশ শ্রেণি)
- ৪। অরুণাময় দাস (নবম শ্রেণি)
- ৬। জয়তু কর্মকার (নবম শ্রেণি)

উল্লেখ্য যে, জাতীয় ফুল উৎসবের বিভাগীয় পর্যায়ে গল্প রচনায় ২য় হয়- রাশেদুল ইসলাম এবং দলগত জাতীয় সংগীতে ২য় হয় -DRMC সংগীত দল।

২১. ৭-৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ৭ম শহীদুল্লাহ স্মারক বিতর্ক উৎসবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে DRMC বিতর্ক দল।

বিতর্কিকরা হলো:

- ১। খান মোঃ ওমর (একাদশ শ্রেণি)
- ২। তাওহীদ সোহাগ (দ্বাদশ শ্রেণি)
- ৩। ইশতিয়াক তুর্জ (একাদশ শ্রেণি)

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- * কলেজের সিসি টিভি সার্ভার রুম তৈরি করা হয়েছে।
- * কলেজের জন্য ২টি ডুপলো মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- * ৪নং টিচার্স কোয়ার্টার সংস্কার করা হয়েছে।
- * উপাধ্যক্ষের বাংলো সংস্কার করা হয়েছে।
- * কর্মচারীদের আবাসিক কোয়ার্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।
- * কলেজের মাঠ সংলগ্ন নতুন ওয়াশ রুম তৈরি করা হয়েছে।
- * কলেজের পশ্চিম দিকের গেইটটি নতুন করে তৈরি করা হয়েছে।
- * কলেজের ক্যান্টিন সম্প্রসারণ ও সংস্কার করা হয়েছে।
- * কলেজের আবাসিক ছাত্রদের জন্য খাট ও টেবিল তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
- * কলেজের মাঠের ঘাস কাটার জন্য গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে।
- * কলেজের কেন্দ্রীয় মসজিদের ভিতরের পিলার ও বারান্দা সংস্কার করা হয়েছে।
- * কলেজের প্রেডাকশন রুমে (সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করার জন্য) ০৪টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে।
- * কলেজের গেইট ও অডিটোরিয়ামের জন্য ডিজিটাল ঘড়ি ক্রয় এবং সার্চ লাইট লাগানো হয়েছে।
- * কলেজের হাউজসমূহের জন্য ২০০০ লিটার পানির ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।
- * কলেজের কুদরত-ই-খুদা ও জয়নুল আবেদিন হাউসের সুয়ারেজ লাইন সংস্কার এবং নজরুল ইসলাম হাউস ও ফজলুল হক হাউসের পিছনে প্রায় ১০০ ফুট সুয়ারেজ লাইন সংস্কার করা হয়েছে।
- * কলেজের সকল শিক্ষাভবন ও হাউসসমূহের জন্য বিশুদ্ধ পানির ফিল্টার ও প্রশাসন ভবনে ১৬ লাইনের ইন্টারকম সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- * কলেজের শিক্ষাভবন-৩ এ সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।
- * কলেজের ছাত্রদের জন্য সেলুন তৈরি করা হয়েছে।
- * কলেজ অভ্যন্তরে বেতন বুথ তৈরি ও বিভিন্ন স্থানে ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়েছে।
- * কলেজের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় করা হয়েছে।
- * কলেজের জন্য একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।

টিচার কর্নার





এ স্মৃতি যায় না ভোলা

মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার

সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

[১৫ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম সেলিমের আকস্মিক মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ।]

কোথা থেকে শুরু করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সম্ভবত ১৯৮৭ সালের শেষের দিকের ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ক্যান্টিনে পরিচয় হয়েছিল সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে। পুরো নাম মোঃ রফিকুল ইসলাম সেলিম, বাড়ি জামালপুর। আমারও নাম পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। বললাম মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার, বাড়ি ফরিদপুর। পরিচয় পর্বে একটা বিষয়ে মিল পাওয়া গেল, সেটা হচ্ছে দু'জন একই ডিপার্টমেন্টের ছাত্র। সেলিম ভাই শুধু আমার এক বছরের সিনিয়র। এরপর বিভিন্ন সময়ে ক্যান্টিন, ডাইনিং, কমনরুম, টিভিরুম, লব্ধি অথবা যাওয়া-আসার পথে দেখা হলেই স্বভাবসুলভ হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করত, কেমন আছ? আরও নানা কুশলাদি জানতে চাইতো। আর ডিপার্টমেন্টে তো দেখা হতোই। আস্তে আস্তে সখ্য ও বন্ধুত্ব গভীর হতে লাগল। ক্রমে সেলিম ভাইয়ের সহপাঠী ও বন্ধুরা জানতে পারল আমাদের সম্পর্কের গভীরতা সম্পর্কে। একইভাবে আমার বন্ধু-সহপাঠীরাও ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করল।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৬-১৯৮৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হই। আমাদের সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হল অ্যাটাচমেন্ট কেন্দ্রীয়ভাবে বরাদ্দ দিতে শুরু করে। যতটুকু জানা এর আগে শিক্ষার্থীদের পছন্দমত হল অ্যাটাচমেন্ট দেওয়া হত। আমাদের সময়কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল দুটোর নির্মাণ কাজ একই সাথে শেষ হয়েছে। ফার্নিচার বা

আনুষঙ্গিক সব কিছু সেট-আপ হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের বর্ষের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীদের এই দু'টো হলে অ্যাটাচমেন্ট দিয়েছিল। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নোটিশের মাধ্যমে অন্যান্য হলে অ্যাটাচমেন্টের ছাত্রদেরও হল মাইগ্রেশনের সুযোগ দিয়েছিল। আমার ধারণা সত্যি নাও হতে পারে, ৩০%-৪০% সিট পুরোনো হলগুলোর ছাত্রদের জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছিল হল জীবনাচরণ, বিধি-বিধান অথবা মিথক্রিয়া বজায় রাখার জন্য। যাহোক যে কারণে কথাগুলো বলা, সেলিম ভাই সূর্যসেন হলের অরিজিনাল বোর্ডার আর আমি হচ্ছি বহিরাগত। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন হল দু'টো চালু হবে। আমি আমার অরিজিনাল হলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ পর্যায়ের, একদিন সেলিম ভাই আমাকে বলল, আমি তোমার সাথে জিয়াউর রহমান হলে বোর্ডার হিসেবে যাব, যেহেতু হল মাইগ্রেশনের সুযোগ আছে। আমি ভীষণ খুশি হলাম। এরপর দু'জনে একই সাথে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের ৩২৬ নং রুমে উঠলাম। ফোর সিটেড রুম, আরও দু'জন নতুন বোর্ডার। পরিচয় হলো- একজন লোক প্রশাসন বিভাগের ছাত্র মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, বাড়ি কুমিল্লার চৌদ্দাম (বর্তমানে কর কমিশনার, কর অঞ্চল- খুলনা), আর একজন সমাজ কল্যাণ বিভাগের ছাত্র মোঃ ফরিদুল হক, বাড়ী সিরাজগঞ্জের কাজীপুর (বর্তমানে অধ্যক্ষ, এফ.ডব্লিউ.ভি.পি.আই. নিপোর্ট, বাংলাদেশ, রাজশাহী) দু'জন থেকে হয়ে গেলাম চারজন। অবশ্য ওনারা দু'জন সেলিম ভাইয়েরও এক বছরের সিনিয়র। অর্থাৎ চারজনের মধ্যে আমিই সর্বকনিষ্ঠ। শুরু হলো চারজনের এক সাথে চলা, অনেক স্মৃতি, অনেক কথা। হয়ত সব কিছু মনে নেই। মনে থাকলেও সব কিছুতো আর লেখা সম্ভব নয়।



ধরুন এই ছবিগুলোর কথাই। এমনভাবে আমাকে লিখতে হবে বলেই অথবা এমনভাবে আপনাদের সামনে আমাকে স্মৃতিচারণ করতে হবে বলেই হয়ত ছবিগুলো আমি স্বয়ং সৎগ্রহ করে রেখেছিলাম। ভাবতে অবাক লাগে। বিস্মিত হই... আল্লাহই ভালো জানেন।

আমাদের রুমমেটদের মধ্যে বেশ ভালো বন্ধুত্ব ছিল। ছুটির দিনগুলোতে আমরা খুব মজা করতাম, একসাথে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যেতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রোগ্রামে, বাংলা নববর্ষে, ইংরেজি নববর্ষে, বই মেলায়, বা জাতীয় দিবসগুলোতে বাংলা একাডেমি, টিএসসি, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একসাথে আড্ডা দিতাম। ২১ শে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে রাত ১২.০০ টার সময় হল থেকে নগ্ন পায়ে একসঙ্গে শহিদ মিনারে যেতাম।

একদিনের একটি ঘটনা প্রায়ই আমার মনে হয়। আমাদের হলের এক বন্ধু হঠাৎ একদিন বলল, দোস্ত একটা বিয়ের দাওয়াত আছে। ইন্সটানের সোহাগ কমিউনিটি সেন্টারে। আমরা ইয়ারমেট ও ক্লাসমেট মিলে প্রায় ১০/১২ জন হবে। সঙ্গে সেলিম ভাইকে নিয়ে গেলাম। অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখি, আমাদেরই ক্লাসমেট একটি মেয়ে, সম্ভবত ওর বোনের বিয়ে। আমাদের একসঙ্গে দেখে সবিস্ময়ে বলল, ও! নিশ্চয়ই তোমরা বর পক্ষের। তো যে বন্ধু আমাদের নিয়ে গিয়েছিল

সে নিঃসংকোচে বলল না আমরা কনে পক্ষের। তখন মেয়ে বন্ধুটি দ্রুত সংকুচিত করে বলল ও... তাই? অর্থাৎ ভাবটা এমন যে, এরা কনে পক্ষের অথচ আমি চিনি না! তখন কারো বুঝতে বাকী রইল না আসলে আমরা কোনো পক্ষেরই নই। অবশ্য আনন্দ-ফূর্তির ভেতর দিয়েই সে যাত্রায় বিয়ে খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য হলে ফিরে এসেছিলাম। এরকম অনেক স্মৃতি বিজড়িত ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে আমার রয়েছে, যা সার্বক্ষণিক আমাকে তাড়া করে।

তবে স্বভাবগতভাবেই সেলিম ভাই ছিলেন নম্র, ভদ্র, শান্ত প্রকৃতির নিপাট ভদ্রলোক। আমি ব্যক্তিগতভাবে হল জীবনে বা ক্যাম্পাসে আড্ডাবাজি বা কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক বুট-বামেলার মধ্যে প্রায়শই নিজেকে জড়িয়ে ফেলতাম। সেই সময়গুলোতে সেলিম ভাই আমাকে বড় ভাই/অভিভাবক/শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে আগলে রাখত। বলতে গেলে কর্মজীবনেও আমি সেলিম ভাইয়ের অনুজ। সেলিম ভাইয়ের মাধ্যমেই আমি কর্মক্ষেত্র হিসেবে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ কে আবিষ্কার করেছি।

বাস্তবিকই সেলিম ভাই যে নেই, তা মেনে নিতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। সেলিম ভাইয়ের মৃত্যুর পর ২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে তার সহপাঠী ও বন্ধুরা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর কনফারেন্স হলে সেলিম ভাইয়ের স্মরণে একটা আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। সেখানে সেলিম ভাইয়ের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাবীর আহমেদ সহ বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী সেলিম ভাই সম্পর্কে স্পর্শকাতর কিছু স্মৃতিচারণ করেন। তাঁদের মনের গণিকোঠায় সেলিম ভাই এর অবস্থান আমি সেদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। কারো কারো স্মৃতিচারণ শুনে আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিলাম না, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতেও কষ্ট হচ্ছিল। কেউ কেউ সেলিম ভাইয়ের মেধা-মনন-বিদ্যা-বুদ্ধিরও বেশ প্রশংসা করছিলেন। সত্যিকার অর্থেই সেলিম ভাই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং অন্তর্মুখী স্বভাবের একজন ব্যক্তিত্ব। কেননা একজন খাঁটি মানবিক বিভাগের ছাত্র হলেও সমসাময়িক তথ্য প্রযুক্তি বা কম্পিউটার বিজ্ঞানের মত Technical বিষয়ে তাঁর ছিল অসামান্য দক্ষতা। বিশেষ করে Apps এর মাধ্যমে চলমান সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতিকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছিলেন তিনি। Digital Content তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের অনেক শিক্ষকই উনার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। Official বা Unofficial ভাবে ঢাকা শহরের অনেক খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মশালায় উনি প্রশিক্ষক (Expert) হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কারিকুলাম প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও তিনি কাজ করেছেন। এসব দিক বিবেচনা করে আমি উনাকে শিক্ষা সহায়ক একজন Resource Person হিসেবে আখ্যায়িত করতে চাই।

লেখার পরিসীমা আর না বাড়িয়ে আমি তাঁর মৃত্যুর পূর্বকার কয়েকদিনের বিচ্ছিন্ন দু'একটা বিষয় উল্লেখ করে শেষ করব। তাঁর মৃত্যুর ২/৩ দিন পর তাঁর বড় বোন আমার বাসায় এসেছিলেন।



আপার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় ২৪/২৫ বছর আগে থেকে। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন, মৃত্যুর আগের দিন রাতে সেলিম ভাই ওনার বাসায় গিয়েছিলেন সায়মাকে (সেলিম ভাইয়ের মেয়ে) নিয়ে। নবোদয় হাউজিং-এ বোনের ফ্ল্যাটটি সেলিম ভাই কিনে দিয়েছেন। কিছুদিন ভাড়া দেওয়া ছিল। এখন সেলিম ভাইয়ের ভাগ্নে নাস্টিম (আমাদের কলেজের পুরনো ছাত্র) স্ত্রীসহ থাকবে এবং মাঝে মাঝে আপা এসে ছেলের সঙ্গে থাকবেন। বাসায় তখন তেমন ফার্নিচার কেনা হয়নি। মেঝেতে বসে সবাই মিলে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন, আর সেলিম ভাই আপাকে বলছিলেন, আপা দেখে শুনে আমি তোমাদের জন্য সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার কিনে দেব। এক সময় সেলিম ভাই বলছিলেন, আপা তোমাদের মতো আমিও কলেজের বাসা ছেড়ে দিয়ে আমার ফ্ল্যাটে উঠে যাব। তখন সায়মা বলছিল, না বাবা, আমরা কলেজের বাসাতেই থাকব। উত্তরে সেলিম ভাই বললেন, সায়মা, আমি যদি আজ মারা যাই, তোমাদের কলেজের বাসায় থাকতে দেবে কে? সত্যি সত্যি যে সেলিম ভাই পরদিন মারা যাবেন, তা কে জানত? তারপর বিদায় নিয়ে আসার সময় লিফটের সুইচ বেশ কিছুক্ষণ চেপে ধরে সেলিম ভাই আপাদের দিকে এক পলকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন এবং বলছিলেন আপা বিদায় নিচ্ছি, আপা বিদায় দিচ্ছ? এই বিদায় যে চিরবিদায় তাই বা কে জানত? ব্যাপারটা তখনই আপনার কাছে অস্বাভাবিক লেগেছিল। আর একটা বিষয় বলি, সেলিম ভাই আপাদের ফ্ল্যাট মালিক সমিতির সেক্রেটারি ছিলেন। মাত্র কয়েক দিন আগে ফ্ল্যাট মালিক সমিতির মিটিং-এ সেলিম ভাই নাস্টিম কে মালিক সমিতির সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, এখন থেকে আমি আর মিটিং-এ আসব না, আমার ভাগ্নে নাস্টিম ফ্ল্যাটের মালিক হিসেবে এখন থেকে দায়িত্ব পালন করবে। তাইতো প্রশ্ন, সেলিম ভাইয়ের অন্তর কী মৃত্যুর বার্তা জানত? এরপর সেলিম ভাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে আমি এবং আমার সহকর্মী ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ আরিফুর রহমান জামালপুরের তাঁর গ্রামের বাড়িতে যাই। তখন বাড়িতে সেলিম ভাইয়ের মা এবং বাড়ির পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পারছেন? সেলিম ভাইয়ের দুলাভাই প্রসঙ্গত বলছিলেন, আজ সকালে সেলিম ভাইয়ের মা ফজর নামাজ পড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। কিছু সময় পর ঘুম থেকে উঠে আমাকে

বললেন, বাবারে, সকালের ঘুমে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। একটা শিংওয়ালা বড় গরু তেড়ে এসে আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে, আমি অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ফেরাতে পারছিলাম না। তাহলে ছেলের মৃত্যুর খবর কী মায়ের মনে জানান দিচ্ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর এক আল্লাহই ভালো জানেন।

রাত প্রায় ১২ টা। সেলিম ভাইয়ের সকল আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং আমি ও আরিফ মৃতদেহ নিয়ে গেলাম শহরের কেন্দ্রীয় কবরস্থানে। সারাদিনই প্রায় টিপ টিপ বৃষ্টি হয়েছে। গিয়ে দেখি কবরের ভেতর প্রায় কোমর সমান পানি। লোকজন বালতি ভরে ভরে পানি সরানোর নিরন্তর চেষ্টা করছে কিন্তু মাটির ভেতর থেকেই অনবরত পানি উঠছিল। শেষ পর্যন্ত হাটুসমান পানির মধ্যেই লাশ দাফন করতে হলো। কী ভয়ানক দৃশ্য! মনে পড়লেই গা শিউরে ওঠে। আসলে মানুষের জীবন এমনই, বেঁচে থাকলে সে-ই সর্বো-সর্বা, মারা গেলে মুহূর্তের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবী তার প্রতিকূলে অবস্থান নেয়। আমরা প্রায়শই বলে থাকি অকাল মৃত্যু। সেলিম ভাইয়ের ক্ষেত্রেও হয়ত নিশ্চয়ই বলব অকাল মৃত্যু। আসলে মানুষের মৃত্যু নির্ধারিত। আল্লাহই মানুষের জীবন-মৃত্যু, রিজিক নির্ধারণ করে রেখেছেন। কেবল মানুষই জানে না, কখন কার ডাক আসবে। আমরা সেলিম ভাইয়ের রুহের মাগফেরাত কামনা করি। আল্লাহ সেলিম ভাইকে বেহেশত নসিব করুন, আমিন।

“কেমন করে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার/অবিশ্বাস করো [অকৃতজ্ঞ হও]? অথচ একসময় তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, তারপর তিনি তোমাদের প্রাণ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আবার তিনি তোমাদের প্রাণ দিবেন এবং সবশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। [সূরা বাকারাহ: ২৮]”



বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ

শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী

সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। প্রায় ২০০ বছরের উপনিবেশিক শাসন আর ২৫ বছরের নব উপনিবেশিক শাসন শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তিনি এসেই মূলত প্রশাসনিক কাজকর্মসহ দেশ পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই সময় বাংলাদেশের শুরু একেবারে জিরো থেকে বললেও ভুল হবে না বরং বলতে হবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সকল সূচকের মান ঋণাত্মক ছিল। বাংলাদেশের যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি পূর্নগঠনে এবং স্বাধীনতা অর্জনে জাতির জনকের অবদান সমান ও চিরস্বীকার্য।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন ধরনের তাই নিয়ে আজ লিখব। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। তা আগেও ছিল, তবে কেন নতুন করে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হচ্ছে, তার কারণ বর্ণনা করতেই আজ আমার লেখনীর অবতারণা। উন্নয়নের মাত্রাগত দিক থেকে পৃথিবীর দেশগুলোকে অর্থনীতিবিদগণ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন- উন্নত, অনূন্নত ও উন্নয়নশীল।

অনূন্নত অর্থনীতি হল- সেই সকল দেশের অর্থনীতি যাদের কোনরকম অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় না, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় না, জীবন যাত্রার মান সর্বদা একই রকম থাকে। আয়ের চরম অসমবন্টন বিদ্যমান। এ সকল দেশের আর্থিক আয় প্রাথমিক পেশার সঙ্গে অর্থাৎ মূলত: কৃষির সাথে জড়িত। এসকল দেশের উদাহরণ দিতে প্রথমেই মনে পড়ে আফ্রিকা মহাদেশের মালি ও মোজাম্বিকের নাম।



উন্নত অর্থনীতি বা উন্নত দেশ হল- যে সকল দেশে মাথাপিছু আয়সহ সকল অর্থনৈতিক নির্দেশকের মান অনেক বেশি, উন্নত জীবন যাত্রা শিল্পোন্নত দেশ, কৃষির উপর নির্ভরতা নেই বললেই চলে, শিক্ষার হার ১০০%, আয়ের সুখম বস্তু ইত্যাদি বিদ্যমান। উন্নত দেশের উদাহরণ হিসেবে ইউরোপের প্রায় সকল দেশ আমেরিকা ও কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের নাম উল্লেখযোগ্য।

এখন উন্নয়নশীল দেশ বলতে সেই সকল দেশের অর্থনীতিকে বুঝায়, যেখানে অর্থনীতির সকল নির্দেশকের মান ধীরে হোক, দ্রুত হোক বাড়ে, থেমে থাকে না। উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন চলমান। সে হিসেবে বাংলাদেশ আজন্ম একটি উন্নয়নশীল দেশ। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এর পরে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯৭৩ সালে মাথাপিছু আয় প্রথম নির্ণয় করা হয়, যার পরিমাণ ১২০ মার্কিন ডলার। ১৯৭৫ সালে তা হয় ২১০, ১৯৮১ সালে ২৪০, ১৯৯০ সালে ৩০০, ১৯৯৫ সালে ৩৩০, ২০০১ সালে মাথাপিছু আয় হয় ৩৮০ মার্কিন ডলার। স্বাধীনতার পরে ৩০ বছরে মাথাপিছু আয় বেড়েছে প্রায় ২৫০ থেকে ২৬০ মার্কিন ডলার। উন্নয়নের ধারায় বাংলাদেশের পথচলা খুবই ধীর। যার জন্য ১৯৭৫ সাল থেকেই জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। যে সকল দেশের মাথাপিছু আয় ১০২৫ মার্কিন ডলারের নিচে থাকে, তাদেরকে জাতিসংঘ LDC (Least Development Countries) এর অন্তর্ভুক্ত করে।

নতুন শতাব্দী নতুন করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ত্বরান্বিত করে। নতুন শতাব্দীতে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বাড়ার হারটা একটু বেশিই এগিয়ে যায়। ২০০৬/২০০৭ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় হয় ৫২০, ২০০৭/২০০৮ সালে ৬০৮, ২০১১/২০১২ সালে ৮৪৮ এবং ২০১৫ সালে ১২২৫ মার্কিন ডলার হয়। আমরা সকলেই জানি, ২০১৬ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৪৬৬ মার্কিন ডলার অতিক্রম করায় আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে অন্তর্ভুক্ত হই। ২০১৮ সালের ৫ই জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর শাসনকালের ৪র্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বক্তৃতায় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৭০২ ডলার বলে উল্লেখ করেন।

এই বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী মাথাপিছু আয় ১৭৫৮ ডলার হিসেবে ঘোষণা দেন। ২০০১ থেকে ২০১৮, এই ১৭ বছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেড়েছে প্রায় ১৪০০ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের উন্নয়ন কখনো থেমে থাকেনি বলে বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন পর্যায়েই অনুন্নত অর্থনীতির আওতায় ভুক্ত ছিলনা তবে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের শুরু শূন্য থেকে। প্রায় সোয়া দুই শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন শেষে বাংলাদেশের অর্থনীতি আস্তে আস্তে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। তাই আমরা অর্থনীতির ভাষায়

উন্নয়নশীল দেশ হলেও LDC Least developed Countries এর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। এক্ষেত্রে LDC এর সংজ্ঞাটি জানা যাক। The least developed Countries is a list of developing Countries that exhibit the lowest indicators of socio economic development, with the lowest Human development index saying for all Countries in the world. এই সংজ্ঞা থেকে দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি বাংলাদেশের অর্থনীতি শুরু থেকেই উন্নয়নশীল অর্থনীতি। কিন্তু স্বাধীনতারপর থেকে এর মাথাপিছু আয়, জীবন যাত্রার মান, দারিদ্র্যের হার, শিক্ষার হার, শিশু মৃত্যুর হার, জন্মহার অর্থাৎ সকল অর্থনৈতিক নির্দেশকের মান বেশি বাড়তে পারেনি, যার ফলে আমাদের অর্থনীতি LDC এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখন আমাদের অর্থনীতি উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে চলছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশকের ক্ষেত্রে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে আছি। এখন আমাদের দেশে দারিদ্র্যের হার ২১.৭% যেখানে ভারতে প্রায় ২৯%, পাকিস্তানে আরও বেশি। শুধু তাই নয়, গত সেপ্টেম্বর ২০১৮ তে পৃথিবীর ১৮৯ টি দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয় ও সম্পদের উৎস ও বৈষম্য, লৈঙ্গিক সমতা, দারিদ্র্য, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, বাণিজ্য, আর্থিক প্রবাহ, যোগাযোগ, পরিবেশের ভারসাম্য ও জনমিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি গবেষণা করে ইউ এনডিপি, এসবের মানদণ্ডে এবার বাংলাদেশের HDI (Human Development Index) মান হল .৬০৮ (১৩২তম)। গত বছরে এই মান ছিল ০.৫৭৯। এ তালিকার শীর্ষে থাকা উন্নত দেশ নরওয়ের HDI মান ০.৯৫৩। UNDP এর গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের আগে ভারত (১৩০তম), কিন্তু ভুটান (১৩৪তম), পাকিস্তান ও নেপালের অবস্থান যথাক্রমে ১৫০ ও ১৪৯তম। এসব কিছু সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই ফলে। বিশেষ করে ১৯৯৮ সালে যমুনা বহুমুখী সেতু উদ্বোধন হবার ফলে বিচ্ছিন্ন রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ ঢাকা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। উত্তরবঙ্গের অবহেলিত মানুষ খুব সহজে স্বল্পসময়ে রাজধানীতে এসে তৈরি পোশাক শিল্প গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়েছে। ফলে দারিদ্র্য কমেছে, কর্মসংস্থান বেড়েছে। ফলে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে। তাই আমরা আজ LDC থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠতে আশা পোষণ করছি।

ইতোমধ্যে জাতিসংঘ স্বল্পোন্নত (LDC) দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠতে যে শর্ত তা পূরণ করায় বাংলাদেশ আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করে। এরই মধ্য দিয়ে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের পথে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল। আগামী ২০২৪ সালে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক উত্তরণ ঘটবে।



তুমি পারো, তুমি পারবে

ড. রুমানা আফরোজ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রভাতি শাখা

“আমি পারি, আমি পারবো, আমি করবো
আমার নিজের জীবনকে আমি নিজে গড়বো।”

প্রিয় ছাত্রদের বলছি, মনের ভেতরে যদি এই কথাগুলোকে আমরা গেঁথে ফেলতে পারি, তাহলে জীবনে অসম্ভবকেও আমরা সম্ভব করতে পারবো। কী হতে চাও? কী তোমার ইচ্ছা? তুমি কি জান? যদি না-ই জান তাহলে তুমি কী পারবে? কী করবে? প্রথমে সুচিন্তিতভাবে তোমাকে তোমার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। তোমার লক্ষ্যকে কীভাবে বাস্তবে রূপ দেবে সেই কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে। তুমি কী সফল মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছ, নাকি আকাশ কুসুম কল্পনা করছো? ভেবে দেখো। জীবনের লক্ষ্য পৌঁছবার জন্য যদি তুমি তোমার কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে না পার, তাহলে সেটা হবে তোমার অলীক কল্পনা। লক্ষ্যটাকে স্থির করো। মনের ভেতরে একটা ছবি তৈরি করো তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের। এবার দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলো। তুমি ভাববে তোমাকে ক্লাসে প্রথম হতে হবে, জীবনে প্রথম হতে হবে। এই ভাবনাটা তোমাকে শক্তি যোগাবে। তোমার এই মানসিক শক্তিই তোমাকে জীবনে সফল একজন মানুষ হিসেবে তৈরি করতে সাহায্য করবে।

এবারে তোমাদের খুব প্রিয় একটা বিষয় নিয়ে বলছি। ভারুয়াল ভাইরাস। মাদকাসক্তি থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে পারলেও বিশ্বের লক্ষ-কোটি মা-বাবা তাদের সন্তানদের নিয়ে এই ভারুয়াল ভাইরাসের কারণে আতঙ্কিত। মোবাইলটাকে ভাবতে হবে বিনোদনের একটা ক্ষুদ্র অংশ। আমরা এটাকে জীবনের অপরিহার্য একটা অংশ ভাবি। ভিডিও গেমস্, বিভিন্ন আপস্ এগুলোকে আমরা নিত্যদিনের খাবারের মতো ভাবি। সমস্যাটা তৈরি হয় তখনই যখন আমরা স্মার্ট ফোনের দাস হয়ে যাই। মোবাইলটাকে যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহার করি তাহলে জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। মা-বাবারও অনেক দায়িত্ব আছে। নিজেরা সারাদিন মোবাইল নিয়ে বসে থাকবো, আর সন্তানকে বলবো ‘No Mobile’ তাহলে হবে না। আগে নিজেকে বদলাতে হবে। তবেই আমাদের সন্তানরাও পারবে। ওরা আমাদেরকে দেখেই শেখে। মুখে মুখে শুধু উপদেশ বা আদেশ না দিয়ে নিজেরা করে কাজটা করানো সম্ভব।

লেখাপড়া আর নামাজ— এই দুই কাজ করতে বসলে যেন রাজ্যের যত চিন্তা সব মাথায় এসে ভর করে। মনোযোগ দিতে হবে। একাধিকভাবে ভাবতে হবে তুমি এখন থেকে কতটুকু সময় পড়বে, কী পড়বে। এই পড়াটা তুমি যখন প্রয়োজন তখনই মনে করতে পারবে। মোবাইলটা বন্ধ করে রাখো, পড়ার টেবিল থেকে সরিয়ে রাখো। আশেপাশের মানুষগুলোকে বলো, কেউ যেন তোমায় বিরক্ত না করে। তোমার মনোযোগ যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। পড়া শুরু করার আগে চোখ বন্ধ করে নিজেকে উপরের কথাগুলো বলো। আর সেইমত কাজগুলো করো দেখবে তুমি অবশ্যই ক্লাসে প্রথম, জীবনের প্রথম হবে।

ছোটবেলা থেকে আমরা ধর্ম বইয়ে, মা-বাবা-গুরুজনদের কাছে শুনে আসছি “সবসময় সত্য বলবে, ভালো কাজ করবে, সৎ পথে চলবে, গীবত করবে না, অন্যের অপকার করবে না...” ইত্যাদি আরও অনেক ভালো ভালো কথা। আসলে মূল কথাটা হলো নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করা যাবে না, নেতিচিন্তাও করা যাবে না, নেতিবাচক কাজ তো অবশ্যই করা যাবে না। প্রতিটি মানুষের ভেতরেই ভালো-খারাপের বসবাস রয়েছে। কখনো ভালো কাজ, ভালো চিন্তা; কখনো খারাপ কাজ, খারাপ চিন্তা একটা মানুষকে জীবনে সামনে এগিয়ে যেতে বাধা দেয়। একটা সাইকেলের চাকা সামনে এবং পিছনে একসঙ্গে টানলে সাইকেলটা যেমন চলতে পারেনা, বাধাপ্রাপ্ত হয়, মানুষের জীবনটাও তেমনি। তাই কখনো নেতিচিন্তা করা যাবে না। সবসময় ইতিবাচক চিন্তা এবং কাজ করতে হবে। এর ফলে জীবনে সাফল্যের স্বর্ণদুয়ারে খুব সহজে আমরা পৌঁছে যেতে পারবো।

প্রিয় পাঠক, আপনি ভাবছেন, যা পড়লাম সবই আমি জানি। আসলেই তাই। আমরা জানি, কিন্তু মানি না। সবসময় আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদাকে বজায় রেখে ভাল কাজগুলো করার চেষ্টা করতে হবে। অন্তত চেষ্টা তো করতে পারি, ইচ্ছাটাকে তো জাগাতে পারি। আমরা দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বদলাতে পারি। জীবনটাতো আমার। এ নশ্বর দেহকে পৃথিবীতে অবিনশ্বর করে রেখে যেতে পারি একমাত্র আমি। জীবনটাকে বদলানোর জন্য আমাদের ইচ্ছাটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সবচাইতে বড় শক্তি। ভাবতে হবে আমি এক অনন্য মানুষ। আমি পারবো পৃথিবীটাকে জয় করতে।



খ্রিচ মানমন্দিরে একদিন

সাবরিনা শরমিন

প্রভাষক, ভূগোল



ছোটবেলা থেকে বেড়াতে খুব ভালো লাগে। নতুন কোন জায়গায় যাওয়ার লোভ সামলাতে পারিনা। বিশেষ করে নবম শ্রেণিতে ভূগোল বই পড়ার সময় থেকেই ভ্রমণের ইচ্ছেটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিষয় নিয়ে পড়ার খুব ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে পূরণ হয়েও যায়। অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, মূলমধ্যরেখা, নিরক্ষরেখা পড়ার সময় কল্পনায় অনেক কিছু ভাবতাম। যেখানে থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা হয় এবং যেখান বসে ইংরেজ জ্যোতির্বিদেদরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সময় নির্ধারণ, অবস্থান নির্ণয়, গ্রহ-নক্ষত্র ও মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন সেই স্থানটিতে যেতে খুব ইচ্ছে করত। তোমরা কি কেউ বলতে পারবে স্থানটি কোথায়? হ্যাঁ ইংল্যান্ডের খ্রিচ মানমন্দির (Royal Observatory Greenwich)। যেখান থেকে শূন্য ডিগ্রী (0°) মূল মধ্যরেখা কল্পনা করা হয়। এই রেখা থেকে পূর্ব দিকে গেলে সময় বাড়ে এবং পশ্চিম দিকে গেলে সময় কমে।

ছোটবেলার ইচ্ছেটা একদিন সত্যি হয়ে গেল। স্বামীর উচ্চশিক্ষার সুবাদে ইংল্যান্ডে যাওয়ার ও বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের সুযোগ যখন পেয়েই গেলাম, তখন এই ইচ্ছে পূরণ করাটা আরও সহজ হয়ে গেল। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে স্বপ্নের সেই মান মন্দির ভ্রমণের সুযোগটা পেয়ে গেলাম। যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের ঠিক মাঝামাঝি এর অবস্থান। অসাধারণ মায়াময় ছায়া সূনিবিড় একটি পার্কের (Greenwich Park) ভেতর দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে গেলে একটি উঁচু টিলার মত জায়গা। একটি ঢালু রাস্তা দিয়ে টিলার ওপরে উঠতে হয়। ওপরে উঠে গেলেই সেই মায়াময় স্থানটি। ভেতরে ঢুকতে টিকিট প্রয়োজন হয়। যারা টিকিট ছাড়া যায় তারাও কিন্তু কম উপভোগ করে না। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ সেখানে ছড়িয়ে আছে। বসে থেকেও সারাদিন প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করতে পারবে।

মূল ভবনের বাইরে মূল মধ্যরেখাটি মোটা দাগ এঁকে চিহ্নিত করা আছে। সকলে এসে এই রেখার দুইপাশে দুই পা দিয়ে ছবি তুলছে।

রেখাটি মন্দিরের বাইরেও বেশকিছু অংশে অংকন করে রাখা আছে। যারা ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না তারা এই রেখা দেখে মূল মধ্যরেখার অবস্থানটি দেখে নিবে। মূল ভবনে প্রবেশের আগে একটি ছোট কক্ষ রয়েছে। সেখানে রাখা আছে ক্যামেরা অবস্কিউরা (Camera Obscura)। এটি একটি অন্ধকার কক্ষ, যেটি কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। ছাদের উপর একটি অংশ (বৃত্তাকার কাঁচ লাগানো) খোলা, যেখান দিয়ে কক্ষটির ভিতর আলো প্রবেশ করছে। কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি সাদা মনিটরের মত স্থান যেখানে ঐ ফাঁকা অংশ দিয়ে আসা আলো পড়ছে এবং সেখানে বাইরে পার্কের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে। অদ্ভুত এই যন্ত্র ক্যামেরা অবস্কিউরা। মূল ভবনটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম ভবনটির ভেতরে প্রবেশ করে অদ্ভুত এক অনুভূতি মনে জেগে ওঠে।

সেখানে আছে বিভিন্ন সময়ের ভূগোলোক, মানচিত্র, পৃথিবীর প্রথম তৈরি ঘড়িসহ বড় বড় আকৃতির সব ঘড়ি, অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করার সূত্র এবং মডেল। এডমন্ড হ্যালি সহ অনেক জ্যোতির্বিদ ও বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও ছবি টাঙানো আছে দেয়ালে। দোতলায় একটি হলরুম রয়েছে যার চারদিকে আছে বড় বড় কাঁচের জানালা। প্রতিটি জানালার সামনে রয়েছে বড় বড় আকৃতির দূরবীন। এগুলোর মাধ্যমে মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করা হত।

পাশেই আছে আরেকটি ভবন। এই ভবনটির ভেতর দুটি বড় আকৃতির টেলিস্কোপ রাখা আছে। একটি নীচতলায়, অপরটি দোতলার একটি গম্বুজাকৃতির কক্ষে। দোতলার টেলিস্কোপটি আকাশের দিকে তাক করে রাখা আছে। মজার বিষয় হচ্ছে যখন টেলিস্কোপটি ব্যবহার করা হয় তখন কক্ষটি দুটি অংশে ভাগ হয়ে সরে যায় এবং বাইরের অংশ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ভাবতে অবাক লাগে! এত বছর আগে এত উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই আশ্চর্যজনক। এভাবে সবকিছু দেখতে দেখতে কখন যে সারাদিন কেটে গেল! মনের মধ্যে অদ্ভুত এক ভালোলাগা নিয়ে ফিরে এলাম।



রহস্যময় ব্ল্যাক হোল

খন্দকার আজিমুল হক পাণ্ডু

প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

বিজ্ঞানজগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর ও কৌতূহলী বিষয় হলো ব্ল্যাক হোল। Hole শব্দটির অর্থ হলো গর্ত। কিন্তু ব্ল্যাক হোল শব্দটি দ্বারা কোনো গর্ত বোঝায় না। ব্ল্যাক হোল এমন একটি জায়গা যেখানে খুবই অল্প জায়গায় অনেক অনেক ভর ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। এই অতি বিশাল ভরের কারণে ব্ল্যাক হোলের আকর্ষণ বলও অত্যন্ত বেশি। এত বেশি যে কোনো কিছুই এর কাছ থেকে রক্ষা পায় না; এমনকি সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন আলোও নয়! এই ১০০ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। এমন অনেক আবিষ্কার হয়েছে, যা আগের শতাব্দীতে মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কারের মাধ্যমে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বা জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিস্ময়কর আবিষ্কার ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বর।

ব্ল্যাক হোল বলতে সাধারণভাবে এমন একধরনের নক্ষত্রকে বোঝায়, যার মহাকর্ষীয় বল এতটাই তীব্র যে মহাবিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির আলো পর্যন্ত এর মধ্যে থেকে বের হতে পারে না। ব্ল্যাক হোলের ধারণা মানুষের মনে সৃষ্টি হয় অনেক বছর আগে। কল্পকাহিনি কিংবা পৌরাণিক কাহিনিতে যেমন অনেক অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর জীব বা বস্তু পাওয়া যায়, তেমনি বাস্তবেও অনেক অদ্ভুত এবং ভয় সৃষ্টিকারী বস্তুর দেখা মিলে। ব্ল্যাক হোল হলো সেই রকম বস্তু। ভয়ঙ্কর কিন্তু আকর্ষণীয়। ব্ল্যাক হোল এমন এক বস্তু, যা থেকে আলোকরশ্মি পর্যন্ত বের হতে পারে না এবং এর ভেতরে পদার্থবিজ্ঞানের কোনো সূত্রও খাটে না। বিখ্যাত পদার্থবিদ কিপ থর্নের ভাষায়, “ইউনিকর্ন (এক শিংওয়ালা ঘোড়ার মতো কাল্পনিক প্রাণী) থেকে গুরু করে গার্গয়েল হয়ে হাইড্রোজেন বোমা, যা-ই বলুন না কেন, মানুষের কল্পনায় তৈরি সবচেয়ে অসাধারণ সৃষ্টি হলো ব্ল্যাক হোল। মহাশূন্যের মাঝে এমন একটা গর্ত, যাতে যেকোন কিছু ঢুকতে পারে কিন্তু বের হতে পারেনা, এমনকি আলোকরশ্মি পর্যন্ত নয়। এমন একটি গর্ত যার স্থান ও কালকে একীভূত (space-time warping) করে। অনেকের কাছে এইরকম মহাজাগতিক দানবীয় বস্তুর ধারণা কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি মনে হতে পারে কিন্তু এটাই হলো বাস্তবতা। থর্নের মতে,

“পদার্থ বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রের সাহায্যেই দেখানো সম্ভব যে ব্ল্যাক হোল আছে আমাদের গ্যালাক্সিতেই কয়েক মিলিয়ন (১ মিলিয়ন= ১০ লাখ) ব্ল্যাক হোল থাকতে পারে।”

যদিও আমাদের গ্যালাক্সিতে অসংখ্য ব্ল্যাক হোল থাকে তারপরও এদের পর্যবেক্ষণ করা কিংবা এদের অবস্থান সম্পর্কে জানা প্রায় অসম্ভব। কারণ এদের আমাদের চোখে দেখা সম্ভব নয়। অন্ধকার তাদের আগলে রাখে, যেহেতু আলো বের হতে পারেনা। তাই জ্যোতির্বিদদের এদের খুঁজে পেতে অনেক কষ্ট হয়। এই কারণে ব্ল্যাক হোল সবার কাছে অদ্ভুত একটা বস্তু এবং একই কারণে এটা অসম্ভব রকমের আকর্ষণীয়। যেহেতু আলোও ব্ল্যাক হোল থেকে বের হতে পারে না এবং এটা দেখাও যায় না, কাজেই এর থেকে একটা বিপদের সম্ভাবনা সব সময় থেকেই যায়। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, যতই তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করুক না যে ব্ল্যাক হোলের ভিতরে কী আছে বা হচ্ছে এটা আমাদের অজানাই রয়ে যাবে। এ সম্পর্কে একটু ধারণা দেয়া যাক। ব্ল্যাক হোলের কাছে গেলে কী হতে পারে! প্রত্যেকটি ব্ল্যাক হোলের ঘটনা দিগন্ত আছে, যেটির সীমানায় কোনো কিছু গেলে ব্ল্যাক হোল সেই জিনিসকে গ্রাস করে।

এখন যদি কেউ ব্ল্যাক হোলের ঘটনা দিগন্তে চলে যায় তা হলে স্বাভাবিকভাবেই ব্ল্যাক হোল তাকে গ্রাস করবে। কিন্তু ঘটনাটা কীভাবে ঘটবে? ধরা যাক, কারো পা ব্ল্যাক হোলের দিকে আছে। ফলে তার কী ঘটছে তা দেখতে পাবে? পা ব্ল্যাক হোলের দিকে থাকার কারণে শরীরের নিচের অংশ বেশি আকর্ষণ অনুভব করবে। আকর্ষণের টানে শরীর চুইংগামের মতো হয়ে যাবে। তারপর একসময় শরীর নুডলসের মতো হয়ে যাবে। অবশেষে ছিন্নভিন্ন শরীর ব্ল্যাক হোলের একটি বিন্দুতে পতিত হবে এবং এরপর কী হবে তা বিজ্ঞানীদের জানা নেই। এখন বিজ্ঞানীরা এটাও বিশ্বাস করেন যে, ব্ল্যাক হোলের মাঝে স্পেস-টাইম (স্থান-কাল সম্পর্ক) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা সম্পর্ক থাকতে পারে। মানে আমাদের ত্রিমাত্রিক স্পেসের সাথে চতুর্থ মাত্রা সময়ের সম্পর্ক। ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি স্পেস-টাইম বিচি

রকমের আচরণ করে। এ সম্পর্কে বিগলম্যান বলেন, “কেউ যদি ব্ল্যাক হোলের ঘটনা-দিগন্তের খুব কাছ থেকে চারপাশে অরবিট করতে পারে তা হলে সময় তার জন্য স্থির হয়ে যাবে। ফলে সে মহাবিশ্বের পুরো ভবিষ্যৎ দেখে ফেলবে, যদিও তার কাছে সময়টা খুব সামান্য মনে হবে। আর কেউ যদি ব্ল্যাক হোলের ঘটনা-দিগন্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তবে অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে পারে, কারণ যেহেতু আমরা ব্ল্যাক হোলের অভ্যন্তর সম্পর্কে কখনোই জানতে পারব না। যদিও আমাদের পক্ষে এই ঘটনার ফলে বাইরে কী পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, তা সম্পর্কে ধারণা থাকা সম্ভব।” আশার কথা হলো, ব্ল্যাক হোল কীভাবে আচরণ করে তা জানার জন্যে ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। বিজ্ঞানীদের বহু বছরের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ দূরত্ব থেকে তা জানা যাবে। সূর্যের চেয়ে কমপক্ষে দশ গুণ বড় নক্ষত্রদের জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে এরা সঙ্কুচিত হতে হতে অতি ক্ষুদ্র অন্ধকার বিন্দুতে পরিণত হয়। এ ধরনের ব্ল্যাক হোল কে বলা হয় স্টেলার ম্যাস (Stellar Mass) ব্ল্যাক হোল। বেশির ভাগ ব্ল্যাক হোলই এ ধরনের। কিন্তু নক্ষত্রের সঙ্কুচিত হয়ে ব্ল্যাক হোলে পরিণত হওয়ার পরও ব্ল্যাক হোলে নক্ষত্রের সমান ভর ও অভিকর্ষজ টান থাকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে, আমাদের গ্যালাক্সিতে ১০০ মিলিয়ন ব্ল্যাক হোল রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে প্রতি সেকেন্ডে একটি ব্ল্যাক হোল সৃষ্টি হয়। আরেক ধরনের ব্ল্যাক হোল হলো সুপার ম্যাসিভ (Super massive) ব্ল্যাক হোল। তাদের এক মিলিয়ন তারার ভর এমনকি এক বিলিয়ন তারার ভরও থাকতে পারে। সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলরা কোনো গ্যালাক্সির মিলিয়ন বা বিলিয়ন তারাকে একত্রে ধরে রাখে। ব্ল্যাক হোলের আকর্ষণ এতই বেশি যে এর থেকে দৃশ্যমান আলো, এক্স-রে, অবলোহিত রশ্মি কিছুই রক্ষা পায় না। এ জন্যই ব্ল্যাক হোল আমাদের কাছে অদৃশ্য। বিজ্ঞানীরা তাই ব্ল্যাক হোল নিয়ে গবেষণা করার সময় খেয়াল করেন ব্ল্যাক হোল তার আশপাশকে কীভাবে প্রভাবিত করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ব্ল্যাক হোল থেকে প্রায় উজ্জ্বল গ্যাস ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফোয়ারা নিষ্ক্ষিপ্ত হয়। এ ধরনের পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীরা অতি বৃহৎ ও দারুণ শক্তিশালী ব্ল্যাক হোল আবিষ্কার করেন। Hlavacek Larrondo বলেন, মনে হয় আমরা যে ধরনের আশা করেছিলাম তার চেয়ে বড় ও শক্তিশালী ব্ল্যাক হোল পাচ্ছি এবং যা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা জানি বড় ব্ল্যাক হোলে অতি শক্তিশালী গ্যাস কিংবা বিকিরণের ফোয়ারা আছে এত, যা ছড়ালে সহজেই গ্যালাক্সির আকার পার হয়ে যাবে। ভেবে অবাক হতে হয়, এত ক্ষুদ্র কিছু কীভাবে এত বৃহৎ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে এক সমাবেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, কিছু কিছু ব্ল্যাক হোল এতই বড় যে তা ‘আলট্রা ম্যাসিভ (Ultra Massive) নামের নতুন নাম দাবি করে। এ ধরনের ব্ল্যাক হোল সূর্যের তুলনায় ১০ বা ৪০ বিলিয়ন গুণ বেশি ভর ধারণ করে। ‘আলট্রা ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলরা বিলিয়ন বছর আগে তৈরি হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে ভর অর্জন করে এত বৃহৎ ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়েছে। বড় ব্ল্যাক হোলরা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে এটিই একমাত্র রহস্য নয়! এই ব্ল্যাক হোলরা কীভাবে সহস্র বিলিয়ন তারা ধরে রাখে তাও বিশাল রহস্য। সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলরা আগে সৃষ্টি হয়েছে নাকি গ্যালাক্সির গুচ্ছ বা ক্লাস্টার আগে সৃষ্টি হয়েছে তা আজও অজানা। সব গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটা করে দানব ব্ল্যাক হোল থাকে (জায়ান্ট ব্ল্যাক হোল), যাকে কেন্দ্র করে মাত্র এক মিলিয়ন কিলোমিটার ব্যাসার্ধে কয়েক হাজার নক্ষত্র প্রবল বেগে ঘুরতে থাকে।

অর্থাৎ এখানে স্টার ডেনসিটি গ্যালাক্সির অন্যান্য জায়গা থেকে প্রায় কয়েক লক্ষ গুণ বেশি। এই গতির তুলনায় আমাদের সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্র, যেগুলো গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে দূরে, তাদের প্রায় স্থির ধরা যায়। ব্ল্যাক হোল মহাবিশ্বের বহু মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং ঘটনাপ্রবাহের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ মহাকর্ষ, স্টেলার ইভলিউশান, ফরমেশান অব গ্যালাক্সি এবং স্পেস টাইমের ঘটনাগুলোর সাথে ব্ল্যাক হোল সম্পর্কের অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন বলা যায়, ব্ল্যাক হোল শুধু তীব্র মহাকর্ষ বলই সৃষ্টি করে না, বরং তারা এমন একটা প্রক্রিয়ার সাহায্যে সৃষ্টি হয় যে, মহাকর্ষ বিশাল পরিমাণ পদার্থকে খুবই অল্প জায়গায় দুমড়ে-মুচড়ে দেয়। যার ফলে ব্ল্যাক হোল একটি প্রচণ্ড ঘনত্বের বস্তুতে পরিণত হয়। এর ভর এবং ঘনত্ব এতই বেশি যে, এর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সাধারণ গ্রহ নক্ষত্র থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি। বস্তুত ব্ল্যাক হোল মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এতটাই তীব্র যে, মহাবিশ্বের সবচেয়ে দ্রুততম বস্তু আলোও এর থেকে বের হতে পারে না। এই কারণে ব্ল্যাক হোলকে কালো বা অন্ধকার দেখায়। কারণ এর থেকে এমন কোনো আলোকরশ্মি বের হয় না, বা মানুষের চোখ বা টেলিস্কোপের কাছে এর অস্তিত্বের জানান দেবে। মহাকর্ষীয় বল আর ব্ল্যাক হোলের এই নিবিড় সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে এদের মহাকর্ষীয় বলের সৃষ্টি বা ‘ক্রিয়েচার অব গ্রাভিটি’ ও বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আলবার্ট আইনস্টাইন যখন তাঁর মহাকর্ষের একটি নতুন তত্ত্ব প্রস্তাব করেন তখন ব্ল্যাক হোলের ধারণাটি আবার পুনর্জাগরণ পায়। ১৯১৫-১৯১৬ সালে প্রকাশিত থিওরি অব রিলেটিভিটির একটি অংশে তিনি এই প্রস্তাবটি করেন। এর মাধ্যমে তিনি নিউটনের সার্বজনীন মহাকর্ষীয় সূত্রকে ভুল প্রমাণ করেননি, বরং এর মাধ্যমে তিনি স্পেসের (স্থান) প্রকৃতি এবং মহাকর্ষ কীভাবে স্পেসে ক্রিয়া করে, তা নিউটন থেকে আলাদাভাবে দেখান। ১৯৬৭ সালে ‘ব্ল্যাক হোল’ শব্দের অবতারণা পারিভাষিক দিক থেকে গুরুত্বহীন হলেও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ছিল অসম্ভব তাৎপর্যপূর্ণ। এই নাম দেয়ার পর থেকেই নতুন করে অনেক জ্যোতির্বিদ এবং জ্যোতির্পদার্থবিদের মাঝে এ ধারণা তৈরি হতে লাগল যে, ব্ল্যাক হোল কোনো কল্পনাপ্রসূত বস্তু নয়, বরং এ ধরনের বস্তু খোঁজার পেছনে সময় ও অর্থ ব্যয় করা দরকার। গত বছরের একটি আবিষ্কার ব্ল্যাক হোল নিয়ে রহস্যকে আরো ঘনীভূত করেছে। জ্যোতির্বিদ Jonelle Walsh ও তাঁর সহকর্মীরা হাবল টেলিস্কোপের সাহায্যে NGC 1277 নামের একটি গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেছেন। গ্যালাক্সিটি ২০০ আলোক বছরের চেয়েও অধিক দূরে অবস্থিত। NGC 1277 আকার আমাদের মিল্কিওয়ের এক চতুর্ভাগ। কিন্তু Jonelle Walsh ও তাঁর সহকর্মীদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী গ্যালাক্সিটির কেন্দ্রে একটি ব্ল্যাক হোল আছে, যার আকার এই পর্যন্ত যত বড় ব্ল্যাক হোল আবিষ্কার হয়েছে তার তুলনায় অনেক বড়। আগে ধারণা করা হতো ব্ল্যাক হোল ও গ্যালাক্সি একসাথে বড় হয় এবং একসাথেই বড় হওয়া থেমে যায়। কিন্তু এই নতুন আবিষ্কার অনুযায়ী হয় ব্ল্যাক হোল তার আশেপাশের তারা ও ব্ল্যাক হোল খেয়ে শুধু বড়ই হতে থাকে অথবা শুরু থেকেই এটি কোনো উপায়ে বেশি বড় হয়ে গিয়েছে। ব্ল্যাক হোল এ মহাবিশ্বের অতি রহস্যময় ব্যাপার! আর বিজ্ঞানীরা লেগেই আছেন এই রহস্যের পেছনে। আস্তে আস্তে রহস্যের জাল থেকে বেরিয়ে আসবে এই রহস্যময় ব্ল্যাক হোল। তখন অনেক কিছুই হয়তো ব্যাখ্যা করা যাবে, যা এখন আমরা খুঁজে বেড়াছি।



সুশিক্ষাই হোক আমাদের প্রত্যাশা

মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রভাষক, রসায়ন বিভাগ



আমাদের দেশের বেশিরভাগ পরিবারই মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত। মৌলিক অধিকারের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম, কারণ সুশিক্ষিত জাতিই পারে বলে আনতে দেশের উন্নয়ন। স্বাধীনতা পরবর্তী ও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে বিস্তর তফাৎ। পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে একজন ছাত্রের পেছনে তার পিতা-মাতার অবদান সর্বাধিক। সে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে অধ্যয়নরত অবস্থায় ও অধ্যয়ন শেষে বিভিন্নসময় বিভিন্ন চিন্তা করে। স্নাতকে অধ্যয়নরত অবস্থায় বা এর পূর্ব থেকেই চিন্তা করে কীভাবে ভাল চাকুরি অর্জনের মাধ্যমে পরিবারকে সহায়তা করা যায়। সেজন্য ছাত্রটি তার একাডেমিক পড়ায় মন না দিয়ে চাকুরি অর্জনের পড়ায় মন দেয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্র রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা, চাকুরি অর্জন ইত্যাদি কারণ উচ্চতর শিক্ষায় গবেষণার প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক কারণ ও চাকুরিতে প্রবেশের বয়সসীমার কারণে অনেক ছাত্র গবেষণায় আগ্রহী হয় না। আর যারা চাকুরি প্রাপ্তির পর গবেষণার সুযোগ পায় তারা দেশের বাইরে পাড়ি জমায়। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণায় যেসকল প্রতিকূলতা পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হল- প্রয়োজনীয় উপকরণ, ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও সগোষ্ঠকরণ। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য চাকুরিতে প্রবেশ করে, ফলে গবেষণায় আর অংশ নেয়া হয়না। তাছাড়া আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি বিভাগে পড়াশুনা করে চাকুরিতে প্রবেশ করে ভিন্ন ক্ষেত্রে, যা তার পূর্বের অধ্যয়নরত বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বর্তমানে শিক্ষার খরচ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। তাছাড়া প্রাইমারি, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিটি সেকশনে ছাত্রসংখ্যা অতিরিক্ত হওয়ায় উপযুক্ত জ্ঞানার্জন না হওয়ায় শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশ ঘটেনা। প্রাইমারি পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক সকল বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দেন। ফলে শিক্ষার্থীর হাতের লেখা, গণিতের যোগ, বিয়োগ,

গুণ, ভাগ ও ইংরেজি বিষয়ের শব্দ, শব্দের অর্থ, গঠন যথাযথভাবে শিক্ষার্থীর আয়ত্তে আসে না। শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিই এর জন্য দায়ী। তাছাড়া প্লে, নার্সারি, কেজি সেকশনের মাধ্যমে সারাদেশে কোমলমতি শিক্ষার্থীর মনে ভয় ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। অভিভাবকরা প্রাথমিক পর্যায়ে সচেতন হলে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ যথাযথভাবে ঘটে। এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে পড়ানো ও আনন্দময় শিক্ষা প্রয়োজন।

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ হওয়ায় ছাত্ররা অল্প বয়স হতে ক্যালকুলেটর ব্যবহার ও মোবাইলে আসক্ত হয়। যার প্রভাবে মোবাইলের রেডিয়েশন বা একাধিক দিকে মনোযোগ দেয়ায় শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

যে সকল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক পর্যায়ে মুখস্থবিদ্যা কম থাকে, বোধগম্যতা বেশি থাকে তারাই পরবর্তী সময়ে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও অন্যান্য পর্যায়ে ভালো করে থাকে। তাই দেশের উন্নয়ন অর্জনে দরকার সকল পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা, সরকারিভাবে গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণ, গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সে গবেষণায় প্রকাশনার কোর্স চালুকরণের মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা বেগবান করা। পিতা-মাতার ইচ্ছা সন্তানের সফলতা অর্জন, শিক্ষকের প্রত্যাশা ছাত্রের উন্নতি অর্জন। এর সাথে শিক্ষা হোক মানবতার জন্য ও দেশের কল্যাণের জন্য, এই কামনা।





জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র: দক্ষিণ সুদান

অসীম কুমার দাস

প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ, প্রভাতি শাখা

জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। মূল উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীর স্বাধীন দেশ সমূহ এই সংস্থার সদস্য। তবে কিছু দেশ এখনো জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করতে পারেনি, যারা জাতিসংঘের সহযোগী দেশ হিসেবে রয়েছে। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে ১৯৫টি স্বাধীন দেশ আছে। এদের মধ্যে জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র হলো দক্ষিণ সুদান। এটি জাতিসংঘের ১৯৩তম সদস্য রাষ্ট্র। দেশটির স্বাধীনতা অর্জনে জাতিসংঘের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

দক্ষিণ সুদান : দক্ষিণ সুদান, সুদান থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ৯ জুলাই ২০১১ সাল। এক গণভোটের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান, সুদান থেকে আলাদা হয়।

ভৌগোলিক পরিচয়

- ✦ মহাদেশ : আফ্রিকা মহাদেশ
- ✦ মোট আয়তন : ৬৪৪৩২৯ বর্গ কি.মি.।
- ✦ সীমারেখা : দক্ষিণ সুদান পূর্ব-মধ্য আফ্রিকায় অবস্থিত। এর মোট ভৌগোলিক সীমারেখা ৬০১৬ কি.মি.। মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের সাথে এর সীমারেখার দৈর্ঘ্য ১০৫৫ কি.মি., গণপ্রজাতান্ত্রিক কঙ্গোর সাথে দৈর্ঘ্য ৭১৪ কি.মি, ইথিওপিয়ার সাথে দৈর্ঘ্য ১২৯৯ কি.মি.। কেনিয়ার সাথে দৈর্ঘ্য ৩১৭ কি.মি., সুদানের সাথে দৈর্ঘ্য ২১৫৮ কি.মি., উগান্ডার সাথে দৈর্ঘ্য ৪৭৫ কি.মি.।
- ✦ অক্ষাংশ : ১২° ৫১' ৪৫.৬৬" উত্তর
- ✦ দ্রাঘিমাংশ : ২৯° ৪১' ৪১.৭২" পূর্ব
- ✦ মোট জনসংখ্যা : ১২.৫৮ মিলিয়ন (২০১৭)
- ✦ জনসংখ্যার ঘনত্ব : ২২.১/কি.মি.^২ (২০১৮)
- ✦ রাজধানী : জুবা
- ✦ সরকারের ধরন : প্রজাতান্ত্রিক
- ✦ মুদ্রা : পাউন্ড
- ✦ মাথাপিছু আয় : \$১,৭০০, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস : ৫০.৬%
- ✦ ভাষা : ১১৪টি ভাষা রয়েছে। প্রধান ভাষা সুদানি আরবি। অন্যান্য

ভাষাগুলো হলো- বেজা, টাইগ্রি, ফুর, নুবাইন, কোরডোফানিয়ান, কোপটিক, মেরোইটিক ইত্যাদি।

- ✦ শিক্ষার হার : ৭০.২%। পুরুষ-৭৯.৬%, নারী-৬০.৮%
- ✦ ধর্ম : ইসলাম (৯৭%)
- ✦ কোড : +২১১
- ✦ উপকূলীয় সীমারেখা : ০ (স্থলবেষ্টিত দেশ)
- ✦ ভূমিরূপ : দেশটির সামান্য অংশ পর্বতময়, অধিকাংশ অঞ্চল সমভূমি। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ডেলিক কালডেরা (৩০৪২ মি.), যা দেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। অপর আরেকটি শৃঙ্গ রেড সি হিল দেশের উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত। উত্তরাংশ সমতল এবং মধ্যভাগ উঁচু।
- ✦ জলবায়ু : আন্তঃক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বৃষ্টিবহুল উষ্ণ "আবহাওয়া বিরাজ করে। দক্ষিণের উচ্চভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং উত্তরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কম। পৃথিবীর অর্ধ ভূমি সমূহের মধ্যে এটি অন্যতম।
- ✦ ভূমি ব্যবহার : কৃষিভূমি: ১০০%
স্থায়ী চারণভূমি: ১০০%
বন: ০%
- ✦ সেচযোগ্য ভূমি : ১০০০ বর্গ কি.মি. (২০১২)
- ✦ প্রাকৃতিক সম্পদ : জলবিদ্যুৎ, উর্বর কৃষিভূমি, সোনা, হীরা, খনিজতেল, কাঠ, লাইস্টোন, আকরিক লৌহ, তামা, আকরিক ক্রোমিয়াম, জিংক, টাংস্টেন ও দস্তা।
- ✦ বসতি : শহরাঞ্চলে গুচ্ছ বসতি লক্ষ করা যায়। সাধারণত পশ্চিমে নীলনদের চারদিকে অধিকাংশ বসতি গড়ে ওঠেছে।
- ✦ প্রধান শহর : আবায়ই, অকবো, বেনটিউ, বোর, জুবা, গগরিয়াল, কাজোকেজি, কাপোয়েটা, মালাকাল, মারিফি, নিমুলে, রুমবেক, টোরিট, ইয়েই, ইয়াখিন্ত।
- ✦ শিল্প : প্রধান শিল্প খনিজ তেল উত্তোলন, কটন, বস্ত্র, সিমেন্ট, ভোজ্যতেল, চিনি, সাবান, ঔষধ, অলংকার, গাড়ি নির্মাণ।



খাদ্যে বিষবাস্প এবং রসায়ন

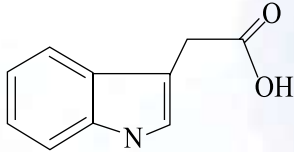
হরি পদ দেবনাথ

প্রভাষক, রসায়ন বিভাগ

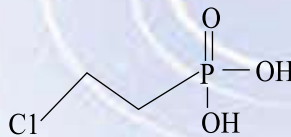
ঢাকা রেডিডেনসিয়াল মডেল কলেজ।

পাকা পাকা আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল আর কলা-
পেট ভরে খাব শাক-সবজি মলা-ঢেলা
নাচবো, গাইবো আর খেলবো সারাবেলা।

কী সুন্দর! খেলছিল ছেলেটি। গাছ থেকে পাড়া সদ্য ঔষধ প্রয়োগকৃত দুটি লিচু খেয়ে থেমে গেল সব খেলা। এমনি কত শত ঘটনা খবরের পাতায় দেখা যায়। দুর্কির মেডিকেল স্টাডিতে দেখানো হয়েছে পাঁচ বছরের এক মেয়ে কার্বাইড দিয়ে পাকানো অপরিপক্ব খেজুর খেয়ে আট ঘণ্টা বিলাপসহ কোমায় ছিল। এমনিভাবে বিষাক্ত খাবার খেয়ে হাজার হাজার মানুষ বিষের জ্বালায় জর্জরিত যা চোখে দেয়া যায় না। সুন্দর পোশাকে ঢাকা থাকে মৃত্যু। বিষের জ্বালা মেটাতে খেয়ে নেই ঔষধ নামক আর এক প্রকার বিষ। বিষে বিষক্ষয় কিন্তু সেটা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। খাদ্যে বিষ প্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে জমিতে রাসায়নিক সার দেয়া থেকে শুরু করে ভোজ্য পর্যন্ত। গাছে মুকুল আসলেই প্রয়োগ করা হচ্ছে বিভিন্ন কীটনাশক। একটু বড় হলেই প্রয়োগ করা হচ্ছে সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্যবর্ধক জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। ফলমূল ও শাকসবজি ঘরে উঠানোর সাথে সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে ফরমালিন এবং ফল পাকানোর জন্য বিভিন্ন ক্ষতিকর রাইপেন। যদিও রসায়ন ও প্রযুক্তির কল্যাণে ক্রমবর্ধমান জনগণের চাহিদা মিটছে, কিন্তু সকল খাদ্য হারিয়েছে তার আসল স্বাদ। বর্তমানে তরকারীর স্বাদ বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, যা বাঙালি জেনে না জেনে হরহামেশা ব্যবহার করছে।



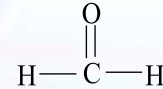
(১) ইনডোল এসিটিক এসিড



(২) ইথোফেন



(৩) ক্যালসিয়াম কার্বাইড

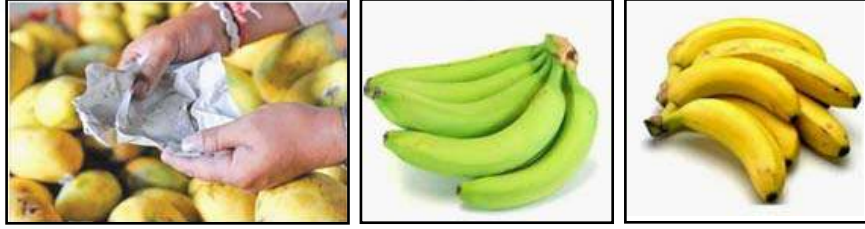


(৪) ফরমালডিহাইড

চিত্র: ফলের বোটা থেকে নিঃসৃত এই যৌগটি ফলকে প্রাকৃতিকভাবে পাকাতে সাহায্য করে।

চিত্র: (২) ও (৩) যৌগ দুটি কৃত্রিমভাবে ফল পাকাতে সাহায্য করে এবং (৪) যৌগটি ফলমূল, মাছ ও শাক-সবজি সংরক্ষণে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত বিষাক্ত ফরমালিনের প্রধান যৌগ।

সাধারণত উদ্ভিদ কাণ্ডের মুকুলে ইন্ডোল-৩-এসিটিক এসিড উৎপন্ন হয়, যা থেকে এক পর্যায়ে ইথিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং এই গ্যাসের প্রভাবেই ফল পেকে যায়। পাকা ফল দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা কঠিন এবং ফলে দাগ পড়ে যায় বা যাতায়াতের জটিলতার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ব্যবসায়ীগণ কাঁচা ফল পেড়ে বিক্রয়কেন্দ্রে নিয়ে এসে কৃত্রিমভাবে ফল পাকাতে বেশি আগ্রহী। উন্নত দেশে ফল ব্যবসায়ীগণ জেনারেটরের মাধ্যমে উৎপন্ন ইথিলিন গ্যাস পরিমিত পরিমাণে প্রয়োগ করে ফল পাকায়। ফল পাকানোর জন্য গুদাম ঘরের বাতাসে ০.১% ইথিলিন গ্যাস যথেষ্ট। কিন্তু অতিরিক্ত ইথিলিন গ্যাস মানুষের শ্বাসতন্ত্রকে দুর্বল করে। এটি চোখ, ত্বক, ফুসফুস ও মস্তিষ্কের ক্ষতি করে। এর প্রভাবে অক্সিজেন সরবরাহের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা দেখা দেয়। অক্সিজেন সরবরাহ কমে গেলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা সৃষ্টি হয়। ফল পাকানোর জন্য বিভিন্ন দেশে ইথোফেন নামক হরমোন ব্যবহৃত হলেও বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহৃত হয়। ইথোফেন ইথিলিন গ্যাস উৎপন্ন করে এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড পানির সাথে বিক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন করে। অ্যাসিটিলিন গ্যাসও ইথিলিনের মত ফলকে পাকিয়ে দেয়। এটির অতিরিক্ত ব্যবহার মানব শরীরে একই সমস্যা তৈরি করে। শিল্প শ্রেণীর ক্যালসিয়াম কার্বাইডে বিষাক্ত আর্সেনিক ও ফসফরাস থাকে। তাই বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে এই সকল কৃত্রিম রাইপেন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি। ব্যবসায়ীগণ গোপনে এটি ব্যবহার করছে, ফলে এদেশের জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকি দিন দিন বেড়েই চলেছে।



চিত্র: কার্বাইড দিয়ে দ্রুত পাকানো অপরিপক্ক আম ও কাঁচাকলা

বর্তমানে আনারসে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ গুলো হচ্ছে Pronofix, Superfix, Crops care এবং Adur যা আনারসকে দ্রুত বড় করছে, পরে দ্রুত পাকানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে Ripen, Harvest, Promot, Saragold, Itpus, Alpen ইত্যাদি। এই সকল রাসায়নিক পদার্থ আনারস চাষের আশেপাশে সহজে এবং সস্তায় পাওয়া যায়। সম্প্রতি Gorvoboti নামক রাসায়নিক পদার্থ অপরিণত গাছেই ফল ধরাচ্ছে। এক চাষী জানান ১০ বছর আগে কোন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার হতো না, ফলে আনারসের স্বাদ ও গন্ধ ভালো ছিল। বর্তমানে এইসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে সেই স্বাদ আর নেই। এমনকি অন্য কোন প্রাণীও আনারস খায় না।

একজন রাসায়নিক পদার্থ বিক্রেতা বলেন, কৃষকরা বড় ফলের আশায় ১৬ লিটার পানিতে ২ মিলি রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তে ১০০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করছে, যা বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য হুমকীস্বরূপ। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেন এই অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে কিডনি, ভোকাল কর্ড ও অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এগুলো ক্যান্সারসহ অন্যান্য মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করছে।

শুধু ফল পাকানোতেই খেমে নেই রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার। এরপর শুরু হয়ে যায় পাকা ফল ও অন্যান্য শস্য কীভাবে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে বা গুদামজাত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা যায়, বেশি মুনাফা অর্জন করা যায় তার প্রতিযোগিতা। এর জন্য ব্যবহার করছে মারাত্মক বিষ ফরমালিন। ফরমালিনের ফরমালডিহাইড প্রোটিন বা DNA এর নাইট্রোজেনের সাথে $-CH_2-NH-$ লিংকেজ সৃষ্টি করে টিস্যুকে ফিল্ড করে বা সংরক্ষণ করে। ফলে ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য বিয়োজক জীবাণু এই লিংকেজকে ভাঙতে পারেনা তাই ফল নষ্ট হয় না। এমনকি মাছিসহ অন্যান্য কীটপতঙ্গ ফরমালিন ব্যবহৃত ফলমূল, মাছ ও শাকসবজিতে বসে না। বাতাসে ফরমালডিহাইডের পরিমাণ 0.5-6.0 ppm হলে নাক, চোখ, ত্বক ও গলা জ্বালাপোড়া করে, পালমোনারি ও নিউরোলোজিকেল পরিবর্তন সাধন করে এবং একজিমা ও এলার্জির ঝুঁকি বাড়ায়। WHO এর IARC দেখান যে ফরমালডিহাইড একটি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ। বিশেষ করে ন্যাসোফ্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্সার এবং লিউকোমিয়া হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। অধিক মাত্রায় ফরমালডিহাইড শরীরে প্রবেশ করলে তীব্র পেট ব্যথা, বমি, কোমা, কিডনি সমস্যা এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। ১৯৯৬ সালে ৮.৭ মিলিয়ন টন ফরমালডিহাইড উৎপন্ন করা হয়। বর্তমানে এর উৎপাদনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালেও আমেরিকার NTP প্রকাশ করে যে ফরমালডিহাইড মানুষের ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের ঢাকায় ৭০% এবং সারাদেশে ৫০% খাদ্যে ভেজাল। আজকাল দুধেও মেশানো হচ্ছে ফরমালিন। জীবনরক্ষাকারী ঔষধে ট্যালকম পাউডার ও আটা-ময়দা মেশানো হচ্ছে। অসহায় শিশু আর রোগী জিম্মি মানবতা বিবর্জিত এই লোভী ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে। এই সকল রাসায়নিক পদার্থ শরীরে ক্যালসিয়ামের বিপাকীয় কার্যাবলী বন্ধ করে অস্টিওপোরোসিস সৃষ্টি করে ফলে হাড় দুর্বল এবং ভেঙে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন বিভিন্ন ফুড এডিটিভস দীর্ঘ মেয়াদে কিছু সমস্যা ও বিপদ সৃষ্টি করে। যেমন এলার্জি, হাইপার এসিডিটি এবং এই অল্পতার কারণে ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটে, ফলে এক পর্যায়ে ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। ফলমূল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে কিন্তু রাসায়নিক পদার্থ জারণ পদ্ধতিকে হ্রাস করে। অক্সিটোসিন নামক এক প্রকার হরমোন ফলমূলে প্রয়োগ করা হচ্ছে যার ফলে শরীরে হরমোনের অসামঞ্জস্য দেখা দিচ্ছে।

অর্থলিপ্সু ব্যবসায়ীগণ জেনে শুনেই এই সকল বিষ খাবারে মিশাচ্ছেন। সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাস্তা অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে।” সম্প্রতি বাংলাদেশে ‘বিশুদ্ধ খাদ্য বিল-২০০৫’ নামে একটি আইন করা হয়েছে। প্রায়ই বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য আটক ও ধ্বংস করা হচ্ছে এবং দোষীদের বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তিও প্রয়োগ করা হচ্ছে। তারপরও এইসকল ধুরন্ধর ব্যবসায়ীদের দৌরাত্র কমছে না। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য দরকার জনসচেতনতা, ব্যবসায়ীদের অর্থলোভ এবং রাতারাতি বড়লোক হওয়ার ধাক্কাবাজি ত্যাগ, সরকারের নজরদারি জোরদার, খাদ্য বিষাক্ত হয় এমন রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহ বন্ধ করা। এই দুর্নীতির কু-অভ্যাস মানুষের রক্ত থেকে দূর করার জন্য ছাত্র-শিক্ষক সমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে সব ক্লাসেই ‘খাদ্যে ভেজাল এবং আমাদের করণীয়’ নামক প্রবন্ধ শেখানো হয়। সুতরাং ছাত্রসমাজ বিভিন্ন শেল গঠনের মাধ্যমে এমনকি নিজেদের পরিবারের জড়িত সদস্যকেও সচেতন করতে পারে। যে সকল শ্রমিক এবং কৃষক রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ এবং প্রয়োগ করে তারা এগুলোর সংস্পর্শে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষিকাজে অনুমোদিত সার, কীটনাশক ও ফুড প্রিজারভেটিভস্ কীভাবে সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করলে খাদ্যের পুষ্টিগুণ ঠিক থাকবে এবং তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা এই বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন এবং অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে তাদেরকে সচেতন করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত না করলে উন্নত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব নয়।



ভালো কাজে প্রতিযোগিতা

আবদুল কুদ্দুস
প্রভাষক, যুক্তিবিদ্যা

প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার মধ্যে যে কী আনন্দ, যে কোনোদিন কোনো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে পারেনি সে কখনো তা বুঝবে না। অনেকদিন আগের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। দশ সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সামগ্রিক মূল্যায়নে তিনি ফার্স্ট হয়েছিলেন। পুরস্কার গ্রহণের সময় উদ্দাম আনন্দের পরিবর্তে কান্না ও অশ্রুসিক্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন, “আজ যদি আমার মা বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁর হাতে এটি তুলে দিতাম, তিনিই সবচেয়ে খুশি হতেন। মা নেই। আজ কাকে বলব? কাকে দেখাব?” এই ধরনের দৃশ্য হয়ত আমরা অনেকেই দেখেছি। আসলে ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা এবং বিজয়ী হওয়া দুটোই সম্মানের বিষয়।

ছাত্রদের জন্য কোনটি ভালো কাজ বা কোন ভালো কাজে তাদের প্রতিযোগিতা করা দরকার? প্রথম কাজ, অবশ্যই পড়ালেখা করা। কোনো ক্লাসে পরীক্ষায় বেশি নাম্বার পেয়ে যারা প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হয় এবং সবাই যখন তাদের চিনতে পারে ও স্নেহ করে তখন নিশ্চয়ই তা তাদের জন্য বিরাট প্রেরণাদায়ক, এমনকি সারা জীবন সে এ নিয়ে গর্বও করতে পারে। পড়ালেখার পাশাপাশি সহ-পাঠ্যক্রমিক বিষয় হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময় নানান প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। যেমন, বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি, বিতর্ক, সাধারণ জ্ঞান, হামদ-নাট, গল্প-রচনা লেখা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রদের সুস্থ প্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে। যারা এগুলোতে বিজয়ী হতে পারে তারা আরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজেকে আরো উন্নত করতে চায়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার জন্যই প্রত্যেক প্রতিযোগীকে অংশ নিতে হয়। যদি কেউ বারবার অংশ নিয়েও কোনোটিতে বিজয়ী হতে না পারে তাহলে হতাশ না হয়ে আরো দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতে হয়। বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরও যারা চেষ্টা অব্যাহত রাখে তাদের জন্য কোনো এক সময় সফলতা আসবেই। তবে এতে কিছু কৌশলগত বিষয়ও আছে। যেমন, সবার মধ্যে সব যোগ্যতা থাকবে এটা খুবই বিরল, কিন্তু কারো মধ্যে একটি যোগ্যতাও থাকবে না সেটা আরো বিরল। এজন্য কোনো একটি প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিমাণ ইঙ্গিত পাওয়ার সাথে সাথে সেটি নিয়েই সাধনা শুরু করতে হয়। একটি বিষয়ই কাউকে সম্মানিত ও খ্যাতিমান করার জন্য যথেষ্ট। মহানবী (সা:) মানুষকে স্বর্ণ রৌপ্যের খনির সাথে তুলনা করেন। স্বর্ণখনি থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করা তেল-গ্যাস-কয়লার খনির মত সহজলভ্য নয়। কোনো কোনো স্বর্ণের খনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলন খুবই কঠিন ও শ্রমসাধ্য। কিন্তু

তাই বলে এটিকে কেউ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেনা। ঠিক একইভাবে প্রতিভার বিকাশ ঘটতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, ভেঙ্গে পরলেই শেষ। মহানবী (সা:) বলেছেন, কিয়ামতের আগে ইউফ্রেটিস নদীর নীচে স্বর্ণের স্তূপ পাওয়া যাবে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা মহানবী (সা:) এর বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যগুলোকে অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেন, এই জন্য তারা ইউফ্রেটিস নদীর উৎস থেকে পতন পর্যন্ত গোপনে নিয়মিত খোঁজ রাখছেন। নিজের প্রতিভার বিকাশের জন্যও এভাবে নিয়মিত অনুসন্ধান কাজ অব্যাহত রাখতে হয়।

ক্লাসের দুর্বল ও সহজ-সরল ছাত্রদের নিয়ে অন্যরা হাসি-তামাশা করে, বিভিন্ন খারাপ নামে ডাকায় তারা মনে ব্যথা পায়, কিন্তু সে কষ্টের কথা তারা কাউকেই বলতে পায়না। কী দরকার তাদের নিয়ে মশকরা করা? শেখ সাদি বলেছিলেন, মৃত ও শুষ্ক বনের ভেতর দিয়ে চলার সময়ও সতর্ক থাক, বাঘ এখানেও লুকিয়ে থাকতে পারে। সুতরাং কচ্ছপের মত নিরবে পথ চলা শুরু হোক আর খরগোশের মত যারা লাফিয়ে চলতে পারে তাদেরও গতি ঠিক রেখে (মাঝে পথে না ঘুমিয়ে) বিজয়ী হওয়ার অভিযান শুরু হোক। কারো উপদেশের অপেক্ষা করার কী দরকার? হ্যাঁ, বড়দের সাথে পরামর্শ করা যায়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তাদের পরামর্শ শুনতেই হবে, বরং এর অর্থ এই তাদের পরামর্শের চেয়েও আরো কত কৌশলে এবং উৎকৃষ্ট পন্থায় এগুনো যায়।

কেউ কেউ আবার বিজয়ী হওয়ার আনন্দে মেতে উঠে। বাহবার জন্য যে নিজেকে অন্যদের চেয়ে অসাধারণ ভাবে শুরু করে, ক্লাসের নিয়মিত পড়ালেখা বাদ দিয়ে বাইরের পুরস্কারের জন্য কাজ করে, ওদের ভবিষ্যৎ এখানেই শেষ। যে বিজয় মানুষকে বিনয়ী করে, আরো বড় বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হতে বলে, ছাত্র জীবন, কর্ম জীবন, অবসরোত্তর জীবন এবং এমনকি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বড় বিজয়ে উদ্বুদ্ধ করে সে বিজয়ই প্রকৃত বিজয়। কেউ কেউ জীবনের শত পুরস্কার নিয়েও মরণের পরের অনন্তকালের জীবনের জন্য একটি পুরস্কারও অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, সেই সবচেয়ে হতভাগা। তার ছোট বিজয়গুলো বড় বিজয়ের জন্য তাকে উদ্দীপ্ত করে।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত। একজন লোক খুব সকালে হত দরিদ্র ও বৃদ্ধ এক নারীকে খাবার দিয়ে আসত। কয়েকদিন দেওয়ার পর লোকটি বুঝতে পারল তারও আগে কে যেন বৃদ্ধাকে খাবার দিয়ে অতি গোপনে চলে যায়। লোকটি গভীর চিন্তায় পড়ে গেল, কে আমাকে পরাজিত করে

ফেলল? গভীর রাতে বৃদ্ধার বাড়ির পাশের এক আড়ালে দাঁড়িয়ে সে আবার ঐ লোকটির অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ দেখতে পেল, সে যে এরই প্রিয় বন্ধু! আড়াল থেকে বের হয়ে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে লোকটি চোখের পানি ফেলে চলল, “ভাই আমি কোনোদিন তোমাকে কোনো ভালো কাজে পরাজিত করতে পারব না।” সম্ভবত এ দুই ব্যক্তির পরিচয় সবারই জানা আছে।

এবার কথা শেষ। মহান আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা কল্যাণের কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর।” (আল মায়িদা-৪৮) তাহলে আমরা কি পারিনা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করতে? নিয়মিত পাঁচওয়াক্ত নামায

পড়ার ক্ষেত্রে, অন্যের উপকার করার ক্ষেত্রে, অন্যের সাথে ভালো কথা বলার ক্ষেত্রে, ভালো নিয়ম মানার ক্ষেত্রে আমরা কি পারিনা অন্যদের চাইতে অগ্রসর হতে? অন্যের ক্ষতি না করে যে কেউ নিজেকে বড় করতে পারে, অন্যের ক্ষতি করে সামান্যতম বিজয়ও অর্গৌবরের। সুষ্ঠু প্রতিযোগিতায় সমাজ যেমন সুন্দর হতে পারে, তেমনি অসুস্থ ও খারাপ কাজের প্রতিযোগিতা সমাজকে দুর্নীতিপরায়াণ ও অশান্তিময় করে দিতে পারে।



মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। কারণ তার রয়েছে উন্নত মস্তিষ্ক, বিবেক। আর যা না থাকলে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হতেই পারত না তা হলো- মুষ্টিবদ্ধতার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা আছে বলেই তো আমি আজ দু-কলম লিখতে বসলাম। প্রতিটি মানুষেরই জন্ম হয় স্বপ্ন নিয়ে বা স্বপ্ন দেখে। ভাবতে একটু অবাক লাগলেও আব্দুর রহমানের বাবা যখন বিয়েই করেননি, তখন ডাক্তারের কাছে গিয়ে ভেবেছেন আমার সন্তান হলে আমি তাকে ডাক্তার বানাবো। আবার, তার মা যখন বাড়ির কাজ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারের কাছে গিয়েছিলেন আর ভেবেছিলেন তার ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন। এভাবেইতো সবাই স্বপ্ন দেখে আর জন্ম নেয় নতুন স্বপ্নের আর আশার।

আজ আব্দুর রহমান কী হয়েছেন তা ঠিক জানি না। তবে শুনেছি তিনি নাকি একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তাহলে তো আর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো না। তবুও কি আবার স্বপ্ন কেউ দেখবে? হ্যাঁ, দেখবে, সবাই দেখবে আর স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকবে। আব্দুর রহমানের বাবা মায়ের মত তার কর্মস্থল তথা স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকেরাও স্বপ্ন দেখে যে, তাদের সন্তানেরা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে এবং দেশ ও দশের সেবা করবে।

রহমান সাহেবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। তেমনি একটি অনুষ্ঠানে যেখানে প্রাক্তন ছাত্ররা বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্রদের পরামর্শ দিচ্ছিল।

মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া শিক্ষার্থী বর্তমানে অধ্যয়নরত স্কুল কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলছিল যে-

স্বপ্ন যাত্রার সূত্রপাত হয় জে.এস.সির মাধ্যমে। কারণ; জে.এস.সি তে প্রাপ্ত GPA এর ভিত্তিতে Science দেয়া হয়। তাই GPA-5 পেতে হবে। এর মধ্য দিয়েই স্বপ্নের ঠিকানার একধাপ পার হওয়া যাবে।

- * Science গ্রুপ পাওয়ার পরই তাকে ঠিক করে নিতে হবে আমি কী স্বপ্ন দেখব?
- * স্বপ্ন যদি হয় দেশের সাপেক্ষে ভাল থাকা তথা ডাক্তার হওয়া তবে তাকে SSC-তে GPA-5 পেতে হবে। এর মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় ধাপ পার হবে।
- * এরপর তাকে HSC-তে GPA-5 পেতে হবে। প্রশ্নটা আসতে পারে, কেন আমাকে GPA-5 পেতে হবে? কারণটি হলো

SSC ও HSC-এর প্রাপ্ত GPA থেকে % হারে একটি স্কোর নির্ধারিত হয়।

* মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ নম্বর SSC ও HSC এর প্রাপ্ত GPA থেকে হিসেব করে নেয়া হয় এবং ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা হয়। SSC এর প্রাপ্ত GPA থেকে ৪০ এবং HSC এর প্রাপ্ত GPA থেকে ৬০ নম্বর নেয়া হয়।

* বোঝার সুবিধার্থে যদি কোন শিক্ষার্থী SSC ও HSC তে GPA-4.5 পায় তবে তার স্কোর হবে- $80 \div 5 = 16 \times 8.5 = 136$
 $60 \div 5 = 12 \times 8.5 = 102$

 ৯০

কিন্তু কেউ যদি দুটি পরীক্ষাতেই GPA-5 পেত, তবে তার স্কোর হতো-১০০। সুতরাং SSC ও HSC-এর ফলাফলের দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে।

এরপর প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থী বর্তমানে স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিল-

SSC ও HSC পরীক্ষার ফলাফলই স্বপ্ন বাস্তবায়নের একমাত্র রাস্তা নয়। কারণ, আমাদের দেশে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যারা SSC ও HSC-তে GPA-5 পেয়েও স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারে না। সেই কারণে সকলকে পরিকল্পিতভাবে অধ্যবসায় করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে SSC ও HSC থেকে স্কোর যদি হয় ৮০ আর ১২০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা হয়। SSC এর GPA থেকে ৩০ এবং HSC-এর GPA থেকে ৫০, মোট ৮০ স্কোর হিসাব করা হয়। তবে এক্ষেত্রে 4th Subject-এর GPA বাদ দিয়ে হিসেব করা হয়। যেমন একজন শিক্ষার্থী বাংলা ও পদার্থবিজ্ঞানে A পেয়েছে তবে 4th Subject-এ A+ পেয়েছে যার কারণে তার সার্বিক ফলাফল GPA-5 দেখালেও তার প্রাপ্ত GPA কম হবে। যদি ঐ শিক্ষার্থীর SSC ও HSC-এর GPA-4.5 হয় তবে তার স্কোর হবে-৭২ ($30 \div 5 = 6 \times 8.5 = 51$ এবং $50 \div 5 = 10 \times 8.5 = 85$)।

যা বলছিলাম, পড়াশুনা হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী। ধরি, কোন পরীক্ষার্থী পদার্থ বিজ্ঞানের ৩০টি MCQ-এর উত্তর দিচ্ছে। যদি এগুলো গাণিতিক সমস্যা সম্বলিত হয়, তবে কি ৩০ মিনিটে সব গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা সহজ? নাকি নয়? পক্ষান্তরে যদি ৩০টি জীববিজ্ঞানের MCQ উত্তর দিতে থাকে তবে কি তার উত্তর দিতে ৩০ মিনিটের প্রয়োজন হবে, নাকি নয়?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ৩০টি গণিত, ৩০টি পদার্থ, ৩০টি রসায়ন ও ৩০টি জীববিজ্ঞানের MCQ এর উত্তর দিতে হয়। তবে কারো কোন বিষয় না থাকলে বাংলা, ইংরেজি বা অন্য বিষয় উত্তর দেয়া যায়। এই পরীক্ষার মোট সময় ১০৫ মিনিট। সুতরাং প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য গড় সময় ১ মিনিটেরও কম। সুতরাং কম সময়ে অধিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ কোথায়? তা সবার কাছে পরিষ্কার। আবার প্রত্যেক প্রশ্নের মানও কিন্তু সমান। এমন হবে না গণিত এর ১ নম্বর = জীববিজ্ঞানের ২ নম্বর।

তাই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দরকার সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পড়াশুনা।

সবশেষে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী তার কলেজের বা স্কুলের ছোট ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বলেছিল যে-

* প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইলে গণিত, পদার্থ ও রসায়নের বিকল্প নেই। তাই সবাইকে প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে।

* শ্রেণিকক্ষে মনোযোগী হতে হবে আর শিক্ষক যা পড়াবেন বাসায়/হাউসে গিয়ে তা পড়তে হবে আর আগামী ক্লাসে শিক্ষক কী পড়াবেন তা অন্ততপক্ষে একবার হলেও Reading দিয়ে আসতে হবে।

* কোন কিছু না বুঝলে লেকচারের মাঝে প্রশ্ন না করে শেষে প্রশ্ন করবে। আর যদি ঐদিন ক্লাসে আর সময় না থাকে তবে সমস্যাগুলো লিখে রাখবে বা সরাসরি পরবর্তী ক্লাসের শুরুতেই জেনে নিবে।

* বিশেষ করে XI-XII শ্রেণির ছোট ভাইয়েরা অবশ্যই অধ্যয়নভিত্তিক পড়ার সময় কাজিক্ত স্বপ্নের পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নাবলী সমাধান করবে। এতে করে স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছানোর জন্য দীর্ঘ সময় পাওয়া যাবে। আর যদি ভাবা হয় যে, পরের বিষয় পরেই ভাববো তবে কিন্তু স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

যদি আমরা সবাই প্রতিদিন আমাদের স্বপ্নের পথে হাঁটি আমাদের বিশ্বাস আমাদের স্বপ্ন আমাদের কাছে ধরা দেবেই। প্রয়োজন শুধু সময়ের।

তাই পরিশেষে বলতে চাই আমাদের কলেজের ছাত্ররা এতটাই মেধাবী যে তারা একটু সচেতনতা ও তার করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করলেই সবার চেয়ে অনেক ধাপ এগিয়ে থাকবে স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছাতে। আর স্বপ্ন নিয়ে জন্ম সার্থক হবে। ইনশাআল্লাহ।



বাসনা

মোঃ আরিফুল হক

প্রভাষক

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ

প্রভাতি শাখা

জন্মদাত্রী বাংলা মা মোর
আমি তোর ছেলে বলছি ওরে,
ভালো যাকে বেসেই গেলি
সারাটি জনম ধরে।

কেন যে এমন করে আমায় ভালো বাসিস্,
আমি শত ব্যথা দিলেও মিষ্টি করে হাসিস্।
আমি পাইনা আজো ভেবে'
এমন দাতা কোথায় আছে
না পেলে সে দেবে?

আমি দেখি শুধু তোকে।
দিয়েও তুই মরে যাস্ না দিতে পারার শোকে।
এই যে আমায় এমন করে দিয়ে শুধু গেলি।
আমার থেকে বলতো মা তুই কী পেলি?

চাহিদা যত ছিল তোর সামনে করেছি জড়ো
পূরণ করে সবই তা করলি আমায় বড়।
বুঝে না বুঝে তোর কাছে চেয়েছি আমি কত
দিয়েছি তুই সবই আমায় তোর সাধ্য মত।

এমনি করে তোর কোলেতে নিতেই বুঝি এলাম
না দিয়ে কিছু তোকে, আমি নিয়েই শুধু গেলাম।
তবু তুই আমার কাছে কিছুই না যাচিস্
দানদাত্রীর মতোই তুই দিতে পারলেই বাঁচিস।

তোকে বলব কীরে আর?
বুঝি ছেলের তরে জান দিলেও
মন ভরে না মা'র।
যখন যাবার সময় হবে
সঙ্গী যারা, তখন তারা
কেউ রবে না, কেউ রবে।

তুই গ্রহণ করিস্ মোরে।
বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখিস
পরান পাখি করে।

আর ভালোবাসিস্ তেমনি
দুষ্টিটাকে এখন তুই
ভালো বাসিস্ যেমনি।
শেষ বাসনা এইটুকু
পূরণ যেন করে খোদা
দোয়া করিস্ খুকু।

স্টুডেন্টস কন্যার

ছড়া ও কবিতা



বেঁচে থাকি মোটে তিন-চার মাস
স্বপ্ন আয়ুর জন্য
সারাক্ষণ তাই উপকার করে
জীবনটা করি ধন্য।

রক্তদানকে উৎসাহ দেই
চারপাশে যারা সুস্থ
আহা রে! সবাই লাল রক্তের
কত কাজ যদি বুঝতো।

রক্ত

ফারহান আবেদিন স্বচ্ছ
কলেজ নং : ১০২৯৩
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : খ (দিবা)

মানুষে মানুষে রঙে ভেদাভেদ
ভিন্ন রঙের চামড়া
তাদের ভিতরে বসবাস করি
এক রঙ নিয়ে আমরা।

আমরা যে কারা বুঝতে পারাটা
নয় তো মোটে শক্ত
ঠিকই ধরেছ, আমরা আছি
পরিচিত লাল রক্ত।

তিন ধরনের কোষ আমাদের
কাজ ও কর্ম ভিন্ন
সকলে আমরা কাজ না করি তো
থাকে না মানবচিহ্ন।

কোষে, ফুসফুসে অক্সিজেনের
নিয়মিত সরবরাহে
লোহিত কণিকা কাজ না করলে
তোমরা তো পুরো ধরা হে!

শ্বেতকণিকার বিশাল ভূমিকা
তোমাদের রোগ ঠেকাতে
শত্রুকে মেরে শিক্ষাটা দিয়ে
পালানোর পথ দেখাতে।
রক্তক্ষরণ ভালো কিছু নয়,
আসলে ভীষণ মন্দ
জমাট বাঁধিয়ে অনুচক্রিকা
করে দেয় সেটা বন্ধ।

আমরা কোথায় তৈরি হচ্ছি
না জেনে পাচ্ছ লজ্জা?
জন্মস্থান হাড়ে থাকা সব
নরম অস্থিমজ্জা।



বিজয়

ফাইজুর রাফিদ
কলেজ নং : ১০৪০৭
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : গ (দিবা)

বিজয় মানে নদীর তীরে
এক খেয়াতরী,
বিজয় মানে বলমলে দিন
রোদের ছড়াছড়ি।
বিজয় মানে মাঠ ভরা ধান
বুকভরা আশা,
বিজয় মানে রক্তঝরা
সংগ্রামেরই ভাষা।
বিজয় প্রাতে কণ্ঠে সবার
নতুন দিনের গান,
বিজয় মানে বীর বাঙালির
দৃষ্ট অভিযান।



আমার মা

তাসদিক উদ্দিন জাহিন
কলেজ নম্বর : ১০২৮৯
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : খ (দিবা)

আমার মা
মাগো আমার লক্ষ্মী মা
একটা জবাব দাও না,
পৃথিবীতে সবাই কেন
তোমার আদর পায় না?
তোমার আদর এতো দামী
বাজারে কেনা যায় না
যাদের কাছে তুমি নেই
তারা কেমন হয় মা?
তাই না,
বল আমার মা।



জীবন

আশ শাহিদ রব্বানী
কলেজ নম্বর : ৯৩৮২
শ্রেণি : চতুর্থ, গ (দিবা)

আমাদের জীবন ধাতুর মতন
চলিতেছে যে নিজের মতন।
জীবনের গঠন সুখে দুঃখের মিলন
এ যেন এক প্রবহমান নদীর মতন।
কখনো আলো কখনো আঁধার
জুড়ে দেয় হাসিমুখে কান্না
এই তো আমাদের জীবন
চলিতেছে যে চক্রের মতন
রয়েছে এত হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা
সবকিছুরই সংমিশ্রণ।



একুশ আমার

আহসান আহাদ সাইম
কলেজ নম্বর : ১৫২৬৪
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : ক (প্রভাতি)

একুশ আমার প্রিয় মনের
মিষ্টি মধুর দ্রাণ,
একুশ আমার বিরহ ব্যথার
গোপন অভিমান।

একুশ আমার ব্যথায় কাতর
চোখের বারি ধারা,
একুশ আমার শূন্য হিয়ার
আকাশ ভরা তারা।

একুশ আমার রক্তে রঙিন
কৃষ্ণচূড়ার ডাল,
একুশ আমার ঝাঁঝরা হওয়া
ছোট্ট ঘরের চাল।



আমার সুপার মম

সাকিব ইবনে হাসান

কলেজ নম্বর : ১৫৩৩৩

শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)

আমার মায়ের চার মেয়ে
কোনো ছেলে নাই;
কিন্তু তবু ছেলের চেয়েও
বেশি আদর পাই।

সবাই বলে ছেলে হলে
হতো বেশি ভালো,
মা বলে কী, “কে বলেছে?”
মেয়েরাই তো আলো।

আমার মা গৃহিণী
এটাই তাঁর পেশা,
সত্যি বলতে এটা তাঁর
পেশা এবং নেশা।

পড়াশোনা ঘরকন্না
কিংবা রান্নাবান্না;
সামলান তিনি একাই সব
নিজের সময় পাননা।



মায়ের কামনা

এল. এম. মাহির লাবিব

কলেজ নম্বর : ৯৪৩৭

শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : ক (দিবা)

কান্না নিয়ে জন্ম তোমার
হাসি নিয়ে থেকে
অন্ধকারকে দূরে ঠেলে
আলো জ্বলে রেখে।

ভবিষ্যতের আলো জ্বলে
তুমি আমি দুজন মিলে
থাকবো সুখে একসাথে
দুঃখ হবে না পাশে।

আমি যদি হই আকাশ
তুমি হবে বৃষ্টি
মেঘের মতো উড়বে তুমি
ঘুরবে না মোর দৃষ্টি।

মা বলে ডেকেছে তুমি
মায়ের কাছে থেকে
সুখে দুঃখে সব সময়
নিজের কাছে রেখ।

ফাঁকিবাজি

এ. এম. সাদমান হক তাকি

কলেজ নম্বর : ১৫২৬৮

শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)

পড়তে বসলে মাথায় ব্যথা,
খেতে বসলে নাই
লিখতে বসলে হাত ব্যথা,
অঙ্ক কষলেও তাই।
রাতের বেলা পড়ার সময়
ঘুম আসে খুব জোরে
তখন বলি থাক না এখন
পড়বো না হয় ভোরে।
এমনি করে দিন কাটিয়ে
পরীক্ষাতে গিয়ে
বাড়ি ফিরে এলাম খাতায়
দুটো শূন্য নিয়ে।



মানুষ হবো

কার্জী সাজিদুর রহমান

কলেজ নম্বর : ১৫২৮৯

শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)

স্বপ্ন দেখি মানুষ হবো,
প্রিয় নবীর মতো।
ভালো কাজে সবার আগে,
থাকব অবিরত।
সত্য কথা বলবো সদা
আবু বকর যেমন।
বিপদ এলে ভয় পাব না
উমর ছিলেন যেমন।
দুঃখীজনের বন্ধু হবো
দেব সুখের ভাগ
মুছে দিব চোখের পানি
আনতে অনুরাগ।
সবার মাঝে আলো দিব
হয়ে নূরের তাজ,
সত্যিকারের মানুষ হবো
পণ করেছি আজ।



কত কিছু প্রিয়

মোঃ তাহামিদ হাসান

কলেজ নম্বর : ১৫২৩৭

শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)

বাবার প্রিয় অফিস করা,
মায়ের প্রিয় রান্না।
আপুর প্রিয় নাচানাচি,
আমার প্রিয় কান্না।
দাদার প্রিয় গল্প বলা,
দাদুর প্রিয় পান।
দাদা দাদুর গল্প শোনে
দাদু দাদার গান।
সাগরের প্রিয় বড় বড়
অঙ্ক নিয়ে বসা
আমি শুধু দু'হাত দিয়ে
মারতে থাকি মশা।

পড়তে বস

লিসান আহমেদ

কলেজ নম্বর : ১৫৩১৪

শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)

আবু বলে পড়তে বস
আমু বলে লিখ,
ভাইয়া বলে কানটা মলে
পড়াশোনা শিখ।
আবু বলে দুই ছেলে
কোথাও যাবি না,
পড়াশোনা না শিখলে
খেতে পাবি না।
পড়তে বস পড়তে বস
একই কথা শুনি,
আমি শুধু বসে বসে
ঘড়ির কাঁটা গুনি।





মশার দেমাগ

মিনহাজুল ইসলাম মাহিন

কলেজ নম্বর : ১৪৫১০

শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : খ (প্রভাতি)

একটা মশা উড়ে এসে বলল কানে কানে,
হতচ্ছাড়া, দুষ্ট ছেলে, বসো তো এইখানে।
দুষ্ট ছেলে চুপটি করে বসতে গেল যেই
পিচ্চি মশা কুটুস করে কামড় দিল সেই।

দুষ্ট ছেলে বলল তখন,-“শোনো মশা ভাই
না না না, কাজটা তুমি ঠিক করো নাই।”
আমি বলি আমার কথা চুপটি করে শোনো
আমায় কামড় দেওয়ার তোমার কারণ ছিল কোনো?

এখন তোমায় করতে হবে, বলব আমি যা যা,
দুষ্ট তুমি,এবার তোমায় পেতে হবে সাজা।
রেগেমেগে যখন সে মশা মারতে গেল,
কোথায় মশা? চড়টা সে নিজের গালেই খেলো!!!



মনের আশা

ফেরদৌস আহমেদ

কলেজ নম্বর : ১০৩২৯

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ (দিবা)

আমাদের স্কুলে
লেখা পড়া করবো,
লেখা পড়া করে সবে
জীবনটা গড়বো।
এই স্কুলে পড়ে মোরা
দেশের সেবা করবো,
দেশের প্রয়োজনে সবাই
জীবন দিয়ে লড়বো।
প্রভু তুমি পূরণ করো
আমার মনের আশা,
কী করে যে বলব তোমায়
পাইনা খুঁজে ভাষা।



জন্মভূমি

ফেরদৌস আহমেদ

কলেজ নম্বর : ১০৩২৯

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ (দিবা)

বাংলা আমার জন্মভূমি
বাংলা আমার জান,
দেশের জন্য দিয়ে গেছে
লক্ষ মানুষ প্রাণ।
দেশকে নিয়ে কত কবি
লিখে গেছেন গান,
তাই বুঝিগো মোদের মনে
দেশের জন্য এত টান।
এইখানেতে রাখাল বাজায়
মধুর সুরে বাঁশি,
সেই বাঁশিরই মধুর সুরে
ছুটে ছুটে আসি।
সোনাবরণ দেশটি আমার
অনেক ভালোবাসি
এই দেশেতে জন্ম আমার
তাইতো সুখে আছি।
ধন্য মাগো জন্মভূমি
তোমায় ভালোবেসে,
মরণ যেন হয়গো আমার
সোনার বাংলাদেশে।



প্রিয় বাংলাদেশ

জারিফ রহমান নফি

কলেজ নম্বর : ১৫৪০০০৮

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক (দিবা)

আমার দেশ
প্রিয় বাংলাদেশ।
দেশ ছোট হলেও,
সৌন্দর্যের নেই কোন শেষ।
আছে নদী-নালা,
আছে গাছ-পালা।
আছে বিখ্যাত সুন্দর বন,
দেখে মুগ্ধ হয় মানুষজন।
আছে কক্সবাজার,
এখানে বেড়াতে আসে মানুষ
হাজার হাজার।
আছে ছয় ঋতু,
হচ্ছে পদ্মা সেতু।
গর্বের নেই শেষ
আমার প্রিয় বাংলাদেশ।



শাবাস বাংলা

নকিবুল ইসলাম জিদান

কলেজ নম্বর : ১০৩৫৩

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ঘ (দিবা)

প্রাণের কথা প্রাণের ভাষা
মায়ের শেখানো বুলি;
কেড়ে নিতে চায় মুখের কথা
প্রিয় বর্ণগুলি।

কিন্তু বাঙালি তো ভীর্ণ নয়, দমবার নয়
তবে কেন মুছে যাবে অ,আ,ক,খ?
কেন মুছে যাবে মধুর বাংলা কথা?
কেন হার মানবে বাঙালি?

পেছনে ফেলে সকল বাঁধা, সকল অবহেলা
ভীর্ণ নয়, সাহসী তাঁরা
শাবাস বাংলা!
দুর্গম পথ পেড়িয়ে, রাজপথ রক্তে রাঙিয়ে
প্রাণ বাংলা ভাষা!
ভাষা কোটি মানুষের, কোটি মানুষের আশা।



দুরন্ত পথিক

ফাতিম অনজুম আলভী
কলেজ নম্বর : ১৫২০৩১৬
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : খ (দিবা)

দুরন্ত পথিক চলল আবার
দুর্গম পথ দিয়ে,
যে পথে খেললো কত না খেলা
বিভীষিকা তাকে নিয়ে।
তবু ভয় নাই দুরন্ত পথিকের
সামনে আগাতে যায়,
মরার মতো মরতে পারলে
বীর হয়ে রবে চির ঠায়।
নিজের জীবন দিয়ে অন্যের জীবন
গড়া হলো তার কাজ
আসুক যতই বিপদ সামনে
আছে অকুতোভয়ের তাজ।



আমার প্রাণের বাংলাদেশ

মুহাম্মদ তালহা তানবীর
কলেজ নম্বর : ১৫৩০০৪৭
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক (প্রভাতি)

বাংলাদেশ,
তোমার সৌন্দর্যের নেই কোনো যে শেষ
বাংলাদেশ,
তোমার গান আমি গাই বেশ।
তোমার প্রতি ভালোবাসা,
তোমার প্রতি মনের আশা,
না তো হবে কভু যে শেষ।

তুমি এমন এক দেশ
যার কথায় আমি মুগ্ধ হই বেশ
তোমার জন্য দিতে পারি প্রাণ
দিতে পারি জান
তবুও রক্ষা করব আমি যে তোমার সম্মান।

তুমি দিয়েছ আমায়
আলো আর বাতাস,
এই সুন্দর আকাশ
আমি তোমার কাছে ঋণী
তাই চিরদিনই।

বাংলাদেশ,
তুমি আমার প্রাণের দেশ
তোমার সৌন্দর্যের নেই কোনো যে শেষ।



বর্ণমালা

মাহামুদ জিলানী
কলেজ নম্বর : ১৫৩০১৬৭
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক (প্রভাতি)

ফুল ফুটেছে চারিদিকে
ফাগুন এসেছে,
বর্ণমালা বলছে হেসে
সালাম এসেছে।

পলাশ বনের লাল দেখে
সবাই মেতেছে
বর্ণমালা বলছে হেসে
রফিক এসেছে।

ফাগুন মাসের আগুন দেখে
এ দেশ হেসেছে,
বর্ণমালা বলছে হেসে
জব্বার এসেছে।

কোকিল ডাকা এই ফাগুনে
বাংলা এসেছে,
মা কেঁদে কয় ঐ যে আমার
বরকত এসেছে।

রাশি রাশি ফুল ফুটেছে
এই বাংলা জুড়ে,
হঠাৎ দেখি এ ফুল নয়,
শফিক জেগে ওঠে।

বলছে তারা বাংলা ভাষা
ভালোবাসবে তোমরা,
ভুলে যেওনা মুমিয়ে যাইনি,
জেগে আছি আমরা।



কৃষকের কান্না

মোহাম্মদ নাইম
কলেজ নম্বর : ১০৩৫২
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ (দিবা)

বৃষ্টির বানে ভাসল জমিন
বৈশাখ আসার আগে
কার্তিকের সেই খুশির জোয়ার
আর কি প্রাণে জাগে?
ধান নিয়েছে বানে
কান্না এলো যে প্রাণে
হাসতে গেলেও এখন যে
কেমন কেমন লাগে!
কাঁদতে থাকে গাঁয়ের কৃষক
ক্ষেতের দিকে চেয়ে
বুক ফেটে যায়, অশ্রু বারে
চোখের পাতা বেয়ে।

ধান ভেসেছে, জাল ভেসেছে আর ভেসেছে হাসি,
কান্না করেন মা-বাবা আর আমার প্রতিবেশী।
কান্না করেন গ্রামের দাদা
সবুজ হলো সাদা
আর্তনাদে উঠলো কেঁদে গাঁয়ের গরিব চাষা!
আর্তনাদের সুর উঠেছে আজকে প্রাণে প্রাণে
মন ভরেনি পাকা ধানের মধুর ছাণে ছাণে!
বান উঠেছে মেতে
সোনার সবুজ ক্ষেতে
কার্তিকের সুখ করলো মাটি প্রলয়কারী বানে!



স্বাধীনতার জন্য

সামিউল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ১০৫৬৩
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ক (দিবা)

স্বাধীনতার জন্য মাগো
যদি দিতে পারি জান,
তবেই আমি সার্থক মাগো
ধন্য হবে এই প্রাণ।

আমি মাগো যেমন করে
থাকি তোমার কোলে
সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আজ
মা-মাটি এবং দেশ রক্ষার জন্য
ভাসে রক্তের জলে।

কেউবা কাঁদে পুত্রের শোকে
কেউবা কন্যা স্বামী
প্রিয়জন হারানো কেমন কষ্ট-যন্ত্রণা
জানে শুধু অর্ন্তস্বামী।

আমাকে মাগো আজ
যেতে করোনা মানা
পাকিস্তানি বর্বর জাতির মোদের
আজ সারা দেশে দিচ্ছে হানা।

সীমালংঘনকারীদের করতে ক্ষমা
নাহি মাগো পারি,
অত্যাচারী, হরণকারী, অমানুষদের
কী করে মোরা ছাড়ি।

আজ হানাদারদের করব ধ্বংস
কখনো ছাড়বোনা আর,
আমরা যে বাঙালি বীর
চির তরে ভেঙে দিব
অনধিকার প্রবেশকারীদের
সকল অন্যায় শাসন- শোষণের নীড়।



বিদায়

সামিউল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ১০৫৬৩
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ক (দিবা)

বিদায় বিদায় বিদায়
বন্ধু তোমায় বিদায়
তোমার সঙ্গে কেটেছে সাত বছর
হাসি-কান্না মান অভিমান দিয়ে।
বন্ধু তোমায় জানাই হাজার সালাম
তোমার নিকট আছে আমার ছোট নিবেদন।
বন্ধু ওগো ভুলোনা আমায়,
রেখ আমায় মনে,
তোমার সঙ্গে কাটানো ঐ সকালগুলো নিয়ে।
রোজ সকাল ৭টা বাজে যেতাম তোমার কাছে,
পড়া-লেখা আর টিফিন শেষে ফিরতাম বারো টাতে।
তোমার সঙ্গে দুই বছর ভালোই কেটেছিল,
তাই আজ তোমার কাছে আমার বিদায় নিতে হল।
বন্ধু আমি যেথায় থাকি,
যদি ভালো রেজাল্ট করি
শপথ করছি তোমার নিকট আসবো আবার ফিরে
এখন তবে বিদায় বন্ধু,
যাই পরীক্ষা দিতে।



ইচ্ছে জাগে

মাহাফির মোহাম্মদ রাতুল
কলেজ নম্বর : ৮০২৬
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ক (দিবা)

আমার বড় ইচ্ছে জাগে
ফুল পাখিদের জানান
তাদের মতো মুক্ত জীবন
এই আমারও মানার।

সাত-সকালে সবুজ ঘাসে
লেপটে যাওয়া শিশির
কিংবা হতে ইচ্ছে জাগে
জোনাক পোকা নিশির।

ভোমরা হয়ে লুটতে মধু
ফুল থেকে সব গাছের,
কারণটা এই ফুল পাখি-ফল
সবাই তোমার কাছের।



কলেজ আমার অঙ্গীকার

বাসিতুন জেদান
কলেজ নম্বর : ১৪১৩৮
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
আমরা একটি জাতি পরিবার
শিক্ষাদানে জ্বালাব প্রদীপ
এই আমাদের অঙ্গীকার।

এই দেশে ভরে আছে পশ্চাত্পদ বিশ্বাস
মুক্ত করে হব একদিন প্রদীপ ইতিহাস
দেশের জন্য জাতির জন্য
গড়ব নতুন অহংকার।

শিক্ষার মাঝে শিক্ষার্থীরা জীবন গড়তে পারে
জ্বলতে পারে সূর্যের মতো নিগুচ অন্ধকারে
এই বিশ্বাসে এই উচ্ছ্বাসে
চলব সামনে দুর্নিবারে।



জাতির পিতা

নাফিস ফুয়াদ

কলেজ নম্বর : ১৫৪২৫

শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : খ (প্রভাতি)

বঙ্গবন্ধু হলো পৃথিবীর ইতিহাসে
সাহসী সৈনিক
তঁার কথা যে সব বাঙালিরা
স্মরণ করে দৈনিক
এই দেশ গড়তে তঁার রয়েছে
গুরুত্বপূর্ণ অবদান
বাঙালির হৃদয়ে আজও তিনি
কত যে মহান।
বাঙালিদের সব ভালবাসা
তঁারই জন্য আছে,
তিনি অতি প্রিয়জন
বাঙালির কাছে।
তিনি হলেন বাঙালির কাছে
সবচেয়ে বড় নেতা,
তঁারই জন্য আমরা পেয়েছি
প্রিয় স্বাধীনতা।
তঁারই জন্য আমরা পেয়েছি একটি
স্বাধীন দেশ,
তঁারই জন্য পরাধীনতার
সব গ্লানি হলো শেষ।
তঁার মতো আর দ্বিতীয় কেউ
এই দেশেতে নাই,
তাইতো বাঙালিরা শুধুই তাঁকে
মন প্রাণ দিয়ে চায়।
এদেশের সব বাঙালির মন
তিনি করেছেন জয়
বাঙালির হৃদয়ে আজোও
তিনি রয়েছেন অক্ষয়।
তিনি হলেন বাঙালির কাছে
সবচেয়ে দামি,
তিনি ছিলেন এই পৃথিবীর কাছে
আপোষহীন সংগ্রামী।
আমরা বাঙালিরা সবাই
তাকে করি যে মান্য,
যত ভালোবাসা চিরদিন থাকুক
শুধু তঁারই জন্য।



শুভ্র শরৎ

মোঃ মুস্তাকিমুর রহমান

কলেজ নম্বর : ৮০১৯

শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : গ (দিবা)

শরতের শুভ্রতা দেখতে কি চাও?
সুনীল আকাশ ছাওয়া গাঁও ঘুরে যাও।
গাঁয়ের সে মেঠো পথ একেবেঁকে চলে,
কেউ চলে আনমনে, কেউ কথা বলে।
নীল আকাশের বুকে তুলোর সে ছাপ,
মেঘ যেন একে দেয়, নিজ মনোভাব।
তাল পাকা সুগন্ধি ছড়ায়েছে বায়,
সবুজ ধানের শীষ দোল খায়।
কিষণ যতন করে, কথা নেই মুখে,
সোনালি ধানের গোলা, কিষণির চোখে।
টলমলে নদীজল কলতান করে,
মাছরাঙা বসে দেখে বিপ্লয়ভরে।
শুকনো বালুর চরে সাদা কাশবন,
শিউলি ছড়ানো যেন মুক্ত রতন।
কিছু ফুল ঝরে পড়ে, কিছু থেকে যায়,
কেউ ফুলে মালা গাঁখে, দেয় দেবতায়।
অপরূপ স্নিগ্ধতা শরতের কাল,
এতসব দেখিবারে মন বেসামাল।



মাতৃভাষা

অভিরূপ সরকার

কলেজ নম্বর : ৮০৯৯

শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ক (দিবা)

মাতৃভাষা বাংলা মোদের
সবাই জানে বিশ্বে
মায়ের কথাই আমার ভাষা
সকল ভাষার শীর্ষে।

ভাষার জন্য কে শুনেছে
করতে জীবন দান
একুশ এলেই বীর শহিদের
শ্রদ্ধাতে উজাড় করি প্রাণ।

বাংলাভাষা আমার ভাষা
সবার চেয়ে গৌরবের
স্মৃতির ভাষা বাংলা আমার
মিষ্টি মধুর সৌরভের।



হাউসবয়

সৌমিত্র শর্মা উৎস

কলেজ নম্বর : ১৬২৯০

শ্রেণি : নবম, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

বন্দিশালার পাখির মতো
নতুন এ জীবন
বায়ান্ন একরের সব কিছু মোর
কতই না আপন!
শৃঙ্খলার মাঝে আমরা
শিখছি কত কিছু
পরিবারের কাছে তাই আর
নেই অবুঝ শিশু।
ভোর সাড়ে পাঁচটায়
উঠতে মন না চায়
সুস্বাস্থ্যের জন্য সবার
পিটি করতে হয়।
ছোটো বড়ো সকলে মোরা
সবাই সবার ভাই
ছুটিতে বাড়ি গেলে তাদের
মিস করি তাই।
স্পোর্টস, কালচার ফেস্টগুলোতে
রাখছি অবদান
বহিরঙ্গনে কলেজের হয়ে
আনছি সম্মান।
তাই আজ প্রাণ খুলে বলতে
নেই কোনো ভয়,
'আমি গর্বিত, আমি হাউস বয়।'



শপথ

উৎসব কুমার প্রামাণিক

কলেজ নম্বর : ১৬৩১৩

শ্রেণি : নবম, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

সর্বকালের সেরা সৃষ্টি,
আমরা মানব জাতি।
বুদ্ধি পেশায় দক্ষতায়-
আমরা হব খাঁটি।

আমরা চলব তাল মিলিয়ে
সত্য নির্ণায় সাথে
চলার পথে মৃত্যুবরণ!
দুঃখ নেইকো তাতে।

চল মোরা এগিয়ে চলি
পরস্পরকে নিয়ে
গড়ব মোরা মোদের সমাজ
মনুষ্যত্ব দিয়ে।



শোকের পাখি

মোঃ ইমাম হাসান
কলেজ নম্বর : ১৬২৬৪
শ্রেণি : নবম, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

আগস্ট মাসে শোকের পাখি ডাকে,
গাছের ডালে সবুজ পাতার ফাঁকে।
শেখ মুজিবের জন্যে কাঁদে পাখি,
শেখ রাসেলের জন্যে ডাকাডাকি।
কিচিরমিচির শব্দ গাছের ডালে,
পনেরো আগস্ট সাক্ষী মহাকালে।
মহাকালের সাক্ষী শোকের পাখি
শেখ মুজিবের ছবি চলো আঁকি
পাশেই আঁকি শেখ রাসেলের মুখ
লাল করে দেই ওই সবুজের বুক
শেখ রাসেলের দুই মিষ্টি হাসি,
বলে- ও দেশ তোমায় ভালোবাসি।



স্বপ্ন

এস, এম, ইবনুল ওয়াসিফ
কলেজ নম্বর : ১৬৩৭০
শ্রেণি : নবম, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

আমার একটি আকাশ চাই;
মুক্ত কিছু বাতাস দিবে?
আমি তোমায় স্বপ্ন দেব
আমার একটা স্বপ্ন নেবে?

চাই একটি মুক্ত মাঠ
ঘাস-গরু আর রাখাল ছেলে;
দিতে পারি স্বপ্ন হাজার
একটি ঘন জঙ্গল পেলে।

সুনীল সাগর বিশাল নদী
এনে যদি দাও মোরে
স্বপ্ন রাজ্য ঘোরাতে পারি
পঞ্জীরাজের পিঠে চড়ে।



নব ভোরের আহ্বান

এস, এম, ইবনুল ওয়াসিফ
কলেজ নম্বর : ১৬৩৭০
শ্রেণি : নবম, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

তরুণ স্বরের দুলাকি চালে আগুন ওঠে বুক ফুঁড়ে
এই ভোরেতে মানুষ জাগে অন্ধকারের ঘুম ছুঁড়ে।
অন্যায়েরই বিরুদ্ধে আজ শত-সহস্র মুখ ফোটে
রুখে দেয় সেই দুর্নীতিকে যা মানুষের সুখ লোটে
জোয়ান-বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর সবার মুখে এক বাণী
মাথার খুলি, বাহুর জোরে সুন্দর এক দিন আনি।

আগামীর ডাক শুনতে কি পাও? কান পেতে দাও রাজপথে
কিশোর তরুণ উঠছে ফুঁসে দৃশ্য দারুণ শপথে।
ছোট্ট দু'পা ভাঙছে পাহাড় দেশের নিশান তার হাতেই
রক্ত দাও হে, শক্ত কর, মুক্তি দেখব এই প্রাতেই।



বাংলাদেশের সৃষ্টি

মোঃ মেহেদি হাসান নাইম
কলেজ নম্বর : ১১১২২
শ্রেণি : নবম, শাখা : ঘ (দিবা)

একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর
এ দেশ হয়েছে মুক্ত,
দেশ স্বাধীনের পেছনে আছে
অনেক সংগ্রাম যুক্ত।

মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল এদেশে নয়মাস,
পাকিস্তানিরা এদেশকে করতে চেয়েছে গ্রাস।
তখন, এদেশের মানুষ হয়ে থাকেনি স্তব্ধ।
বসে থাকেনি এদেশের কিছু নারী সমাজ,
দেশকে বাঁচাতে তারাও নিলো রণসাজ।
বসে থাকেনি এদেশের নারী তারামন,
দেশকে বাঁচাতে যুদ্ধ করেছে জীবনপণ।

বহু ত্যাগের পর,
এদেশের হয়েছে জয়,
সৃষ্টি হয়েছে নতুন দেশ,
জেনেছে বিশ্বময়।

ও পৃথিবীর মানুষ
একবার দাও এদেশের দিকে দৃষ্টি,
অনেক রক্তের বিনিময়ে
হয়েছে বাংলাদেশের সৃষ্টি।





রোড ল্যাম্প

সিহাব খন্দকার

কলেজ নম্বর : ৯৬৭০

শ্রেণি : দশম, শাখা : ঙ (দিবা)

আমি রোড ল্যাম্প
দিনের আলোয় ঘুমাই আমি
চোখ তো খোলাই থাকে,
যানবাহনের ভীড় জমে যায়
এই সময়ের ফাঁকে।
রিকশাওয়ালা হাঁকছে ঐ তো
'ও ভাই সাইড দ্যান!'
কিরিং কিরিং হর্ন বাজিয়েই
যাচ্ছে পেপারম্যান।
দেখি তো সেই ছোকরাটাকেও, -
উশকো- খুশকো চুল,
হেঁটে কিংবা দৌড়ে বেড়ায়, -
হাতে অনেক ফুল।
ফুল বেঁচে সে টাকা কামায়
এখায় সেখায় পাড়ি জমায়
মায়ের জন্য গোলাপ দুটো
তার কাছ হতেই কেনা।
আমি রোডল্যাম্প!
গভীর রাতেও জেগেই থাকি
ঘুমাইনারে ভাই,
এই নগরীর রহস্যময়
মানুষ দেখতে পাই!
মানুষগুলো হেঁবি চালাক!
পকেট মেরে খায়!
বুক মাঝে পিস্তল ঠেকায়,
কেউই না টের পায়!



দীর্ঘশ্বাস

মাহদী দাঙ্গিয়ান

কলেজ নম্বর : ১২৫৪৮

শ্রেণি : দশম, শাখা : গ (প্রভাতি)

কবিতা লেখার জন্য আর
কলমটা হাতে নেয়া হলো না
ঋদ্ধ খাতাটা অসম্পূর্ণই থাকল।
ছেঁড়া বুটজোড়াটা আর সেলাই করা হলো না
ফুটবলটা খাটের নিচেই পরে থাকল।
মাইকটা আর হাতে নেয়া হল না,
গিটারটার ওপর ধূলা জমতেই থাকল।
মাথার ভেতরে আর কোরাস বাজানো হল না
নূপুরটা জং ধরাই থাকল।
অসমাপ্ত গল্পগুলো আর শেষ হলো না
কলমের কালি কলমেই জমে থাকল।
স্বপ্নগুলো আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠল না
শৈশবের ফেলে আসা আমিতেই থাকল,
বুক ফাটিয়ে কান্না আসা হলো না।
অনুভূতিটা কোথায় মরে থাকল?

বল তো, কী হলাম আমি বাস্তবতার চাহিদায়?
রোবট? যন্ত্র?
হয়তো তাই...

হৃৎপিণ্ড চিড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসল
শৈশবের আমি ছাড়া তা কারো শোনা হলো না।



মানবতা

মোঃ লাবিবুল আহসান আলিফ

কলেজ নম্বর : ১৬৪১৬

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

মানবতা তুমি কোথায়
হারিয়ে গেছো আজ,
মানবতা শুধু তোমার জন্য
করণ আর্তনাদ।
তুমি কি দেখছ
জলে ভেসে আসা
নাফ নদীর ঐ ভীড়,
যাদের ভাগ্যে জোটেনি আজো
বেঁচে থাকার মতো নীড়।
তুমি কি দেখোনি,
অবুঝ শিশুর ক্ষত-বিক্ষত লাশ,
প্রশ্নের কি কোনো উত্তর আছে
কেনো এ সর্বনাশ?
তুমি কি দেখোনি,
রোহিঙ্গাদের ঐ করুণ আর্তনাদ
নির্যাতনের স্টিমরোলার চলে
কে করবে প্রতিবাদ।
মানবতা শুধু তোমার অপেক্ষায়
তাকিয়ে লক্ষ চোখ
অনবরত যাদের খামচে মারছে
নরপিশাচদের নখ।
মানবতা তুমি জেগে উঠো আজ
মানুষের অন্তরে,
যে অন্তরে বাসা বেঁধে আজ
অন্ধকার বাস করে।



যদি তুমি চাও

আব্দুর রহমান সাকিব

কলেজ নম্বর : ১৬৫৩০

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ক (প্রভাতি)

প্রিয় আদরের পুত্র,
ভালোই আছি আমি।
একটি বছর পেরিয়ে গেল,
খবর নাও নি তুমি।
মনে হচ্ছে বেশিদিন বাঁচব না,
খোদা ডাক দিয়েছে আমায়।
ভেবেছিলাম আর জ্বালাব না,
কী করব, তোমাকে বড়ই মনে পড়ে।
দেখতে তোমায় অনেক ইচ্ছে হয়।
এসো একবার যদি মনে লয়।
বউমা কি আসবে?
যদি পারো এনো।
দাদুদের কি আনবে
দেখো, কষ্ট হয় না যেন।
শেষবারের মতো তোমায় দেখতে চাই,
দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে সময় বেশি নাই।
একবার এসো, একটি বার দেখা দাও আমায়।
বাবার শেষ ইচ্ছা, জানালাম তোমায়।
চিঠি দিলাম হাতে যদি পাও,
এসো কিন্তু, যদি তুমি চাও।



আমার চাওয়া

নাহিদ মাহমুদ আকাশ

কলেজ নম্বর : ১৬৮০৬

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ক (প্রভাতি)

আমি পেতে চাই, সেই মধুময় জীবন,
যেথায় আনন্দ দিয়ে ভরে থাকবে সারাক্ষণ
জীবন জুড়ে থাকবে শুধু কাজিফত সুখ
সবার চক্ষু দেখবে আমার হাসি মাথা মুখ
আমি পেতে চাই না, সেই কষ্টকময় জীবন,
যেথায় তামাকের ধোঁয়ার সাথে থাকবে আলিঙ্গন,
দিন যাবে নেশার ঘোরে, কাটবে সারা রাত্রি,
হতে হবে বিপথগামী, মৃত্যুযানের যাত্রী।
অচেনা রমণী পারে না যেন বাঁধতে আমায়
ক্ষণস্থায়ী সুখের আশায় জীবনের লক্ষ্য না হারায়।
আপনাকে ভালোবাসব,
আলোর পথে এগিয়ে যাব,
আমি সেই আদর্শ জীবন চাই।
লেখাপড়াকে ভালোবেসে,
দিন শেষে বিজয়ের হাসি হেসে,
মা-বাবার স্বপ্ন করব পূরণ
গড়ব আমার স্বপ্নের ভুবন।



কবিতা

মোহাম্মদ সিফাত

কলেজ নম্বর : ১৬৮২৭

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (প্রভাতি)

কবিতা লেখার সময় কোথায়
আছে অনেক কাজ
কাজের ফাঁকে হঠাৎ একটা
কবিতা লিখছি আজ।
মুখে হাত বসে আমি
ভাবছি সারাবেলা
কীভাবে আমি করব শুরু
এই জাদুর খেলা।
কীভাবে যে কবি লেখেন
এমন কবিতা
যে কবিতায় ভেসে উঠে
গাঁয়ের ছবিটা।
কবিতা লেখার নিয়ম-কানুন
কিছুই জানি না
তাইতো আমার কবিতাও
লেখা হলো না।



শিশু

মোঃ লাবিবুল আহসান আলিফ

কলেজ নম্বর : ১৬৪১৬

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

ছোট বলে যারে তুমি
কর অবহেলা,
ভাবিয়াছ তার মনে
কত রকম খেলা।
মনে কত আঁকা তার
জলরঙা ছবি,
হয়তোবা তারও আছে
কতরকম ছবি।
মুখখানা যেন তার
চাঁদে ভরা আলো
কখনো কি লক্ষ করে
বলিয়াছ ভালো?
কখনো কি আনন্দের সাথে
জবাব দিয়াছ তারে,
বিপ্লয়ে পুলকিত হয়ে
যখন অবোধ প্রশ্ন করে।
হয়তোবা করো তারে
পোশাকে পরিপাটি,
জেনেছো কি কখনো তার
মন কত খাঁটি।
বেড়াতে যাওয়ার ছিল তার
আকুল আবেদন,
দিয়েছো তাকে তুমি
ব্যস্ততার নিদর্শন
ভালোবাসার প্রকৃত বন্ধনে
বাঁধো যদি তবে,
আজকের শিশু ঠিক একদিন
আগামীর ভবিষ্যত হবে।





মায়ের জন্য ভালোবাসা

পারভেজ আলম

কলেজ নম্বর : ১৬৮৯১

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

মা আমার বড়ই আপন
তবু মানিনা তারই বচন।
জানি মাতা চান ভালো মোর
তবু তার বিপরীত করি গমন।
আজ যদি মা গুধান মোরে
উপেক্ষা করি নানা ছলে।
যদি মা কিছু নিষেধ করে
মন ভরে আসে বেদনার জলে।
যেদিন মাতা থাকবেনা আর
চলে যাবে সেই পরপার,
সেদিন আমি কেমন করে
থাকব জগৎ সংসারে,
যেদিন মাতা যাবেন চলে
করে এতিম একলা মোরে।
সেদিন মোরে করবে কে স্নেহ
থাকবে না কেউ আপন বলে।
আজ আমি খোদার তরে
প্রার্থনা করি বারে বারে
পারবনা বইতে সে ভার কাঁধে
যদি মা আমার আগে যান চলে।



স্বপ্নের DRMC

আসিফ এহসান

কলেজ নম্বর : ১৬৫৯৪

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

DRMC -
তুমি মানেই তো ৫২ একরের স্বর্ণ
DRMC -
তুমি মানেই তো শত শত মানুষের ভালোবাসার স্বপ্ন।
DRMC -
তুমি মানেই তো ঢাকার সৌন্দর্য,
DRMC -
তুমি মানেই তো সারা দেশের ঐতিহ্য।
DRMC -
তুমি মানেই তো সাফল্য
DRMC -
তুমি মানেই তো উৎকর্ষ সাধনে অদম্য।
DRMC -
তুমি মানেই তো পড়াশোনা আর খেলাধুলা
DRMC -
তুমি মানেই তো ক্লাস্ত বিকেলে স্বস্তির আভাস পাওয়া।
DRMC -
তুমি মানেই তো ক্লাসে ব্যাক বেঞ্চের সাথে গল্প করা
DRMC -
তুমি মানেই তো গল্প করার জন্য শান্তি পাওয়া
DRMC -
শিক্ষা, শৃঙ্খলা, চরিত্র, দেশপ্রেম, সেবা তুমি দিয়াছ শিক্ষা
মানুষের মত মানুষ হতে আমাদের রুখে কেবা কোথা?
DRMC -
তোমার অভ্যন্তরের হাউস,
দিয়াছে শিক্ষা বহু,
মানুষের সাথে মানুষের পরিচয় হতে
করেছে মোদের মনকে উদ্বাহ।
DRMC -
তোমার কাছ থেকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা নিব,
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে,
মোরাও অবদান রাখব।



অলরাউন্ডার

সৈয়দ জারিন সাদাফ দ্বীপ্ত

কলেজ নম্বর : ১৬৫৭৩

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (প্রভাতি)

আমি বড় অলরাউন্ডার
ক্রিকেট খেলায় ভাই,
ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিংয়ে
আমার জুড়ি নেই।

ব্যাটিং করতে আমি যখন
ওপেনিং এ নামি,
পঞ্চাশ ওভার শেষ করে
তার পরেতে থামি।

বিশ ওভার শেষ না হতেই
সেঞ্চুরিটা দেয় হাতছানি,
বিপক্ষ দল কাত হয়ে
মুহুর্তে থাকে ঘামের পানি।

আমি যখন জ্বলে উঠি
প্রতি বলেই ছয়,
এক ওভার ঠিক ঠিক
ছত্রিশও হয়।

আমার চেয়ে বড় কোনো
অলরাউন্ডার নাই
শতীন-লারা যতই থাকুক
আমার কাছে ছাই।

ব্যাটিং শেষে যখন
গুরু করি বোলিং
মুখ খুবড়ে পড়ে ওদের
রান ছাড়া ব্যাটিং।
ত্রিশ ওভার হওয়ার আগেই
করতে পারি অল আউট,
আমার হাতের বোলিং তোপে
কে না হয় বোল্ড আউট?

দর্শক বলে সোনার ছেলে
জানে কত খেলা,
এমন খেলাই দেখতে পারি
বসে সারা বেলা।



ইচ্ছে

আহমেদ এহসান নাঈম

কলেজ রোল : ১৬৪৩৪

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

ইচ্ছে করে দেশের মানুষের কথা ভাবতে,
তাদের সবাইকে নিয়ে চলতে।
মা বলে কার মতরে খোকা?
আমি বলি মা তুমি তো আস্ত বোকা!
তুমি শুনো নাই সে বজ্রধ্বনি?
তুমি দেখো নাই সে তীক্ষ্ণ চোখের চাহনি?
তোমার মনে নাই সে ৭ই মার্চের কথা?
শেষ বিকেলের সে মুক্তমঞ্চে
অবীর আঁধারে গোটা বাংলা শুনছে,
স্বাধীনতার ফুল ফোটাতে তীব্র ইচ্ছে জাগে।
ইচ্ছে করে, মা, বড়ই ইচ্ছে করে,
জাতির পিতাকে একবার হলেও দেখতে।
সে মায়ার ডাক ডাকতে ইচ্ছে করে,
আর তীব্র কণ্ঠে বলতে ইচ্ছে করে,
“এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।”
অশ্রুজলে মা বলে, ওরে বোকা,
তুই-ই তো হবি আগামীর খোকা।



বৃষ্টি

মোঃ আরিফ হাসনাত

কলেজ নম্বর : ১০৭৯১

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঘ (দিবা)

ঝুম ঝুম শব্দে পতিত হওয়া বৃষ্টি
মনে আলোড়ন তোলে,
বদলে দেয় মনের দৃষ্টি,
হয়তো কখনো রোমান্টিকতা করে সৃষ্টি।
হয়তো কারো কাছে
এটি এক অলিখিত অভিশাপ,
কারো কাছে হয়তো
এক হৃদয়বিদারক স্মৃতি।
বৃষ্টি কারো কাছে
এক আশীর্বাদের নাম,
কারো কাছে তা
অস্থির এক মুহূর্ত।
তবে আমার মনে
বৃষ্টি মানে
কবি মনের উত্থান,
কবিতার জয়গান।



তুচ্ছমাত্রার বিন্দু আমি

মোঃ হাদীউজ্জামান

কলেজ নম্বর : ১০৯৭১

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : খ (দিবা)

তুচ্ছমাত্রার বিন্দু আমি
আমি সামান্য তুচ্ছতম ব্যক্তি
যার রয়েছে অগাধ স্বপ্ন
এমন কি যার মনে নেই কোনো সংশয়।
আমি সে,
যে যেতে চায় হারিয়ে সেই জগতে
আমি সেই,
জোনাকি পোকার আলোর নিশ্চিতি রাতে
যখন,
হাজার বিন্দুর মতো মানুষ থাকে ঘুমিয়ে
তখন,
আমি হারিয়ে যেতে চাই গহীন বনের আড়ালে।
আমি চাই হাঁটতে,
আকাশের প্রতিটা পথ ধরে ধরে
আমি চাই দেখতে,
সাগরের প্রতিটা বিন্দু ঘুরে ঘুরে
কিছু হায় আজ,
কে যেনো রেখেছে আমায় খাঁচার ভিতর পুরে।

কিছু আমি যে নিরুপায়,
কারণ কেউ যে নেই হিসেবে সহায়
কেউ আমাকে
জানতে চায় না
ব্যখ্যা করতে চায় না,
কেউ আমার
সঞ্চয় করা ভালোবাসা বোঝে না কিছু
কেউ তো
ঘোরে না আমার মতো ভালো লাগার পিছু পিছু
শেষবারের মতো হতাশায় আমি
বেড়া জালে এখনো বাঁধা
প্রতিভার মূল্য নেই
কিছু দিনে দিনে,
সূর্যের আলোর মতো জাগে বারে বারে প্রত্যাশা
আজ হোক না সেই বারের
অপেক্ষায় আছি মুক্তিবারের
যেখানে দিন-তারিখের থাকবে না কোনো হিসাব
কারো কাছে দিতে হবেনা কোনো ধরনের জবাব
আমি মুক্ত আকাশে হেঁটে চলবই আজীবন
হাঁটতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত হবে না আমার মরণ।



আমি দায়ী

মোঃ আরিফ হাসনাত

কলেজ নম্বর : ১০৭৯১

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঘ (দিবা)

আজ আমি উন্মত্ত

আমি আজ কত কিছু হারিয়েছি।
হারিয়েছি আমার বিবেকের মর্যাদা,
হারিয়েছি শত নদীর কলকল ধ্বনি,
হারিয়েছি পাখির কলকলি,
হারিয়েছি বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য।
এ জন্য আমি কি দায়ী নই?

অবশ্যই দায়ী।

আজ আমি দায়ী বৃক্ষ নিধনের জন্য,
আমি দায়ী জলাশয়ের পানি দূষণের জন্য,
আমি সত্যিই দায়ী
মৃত বিবেক পুষে রাখার জন্য।
আজ আমি উন্মত্ত
আমি আজ কত কিছু হারিয়েছি।



আবার দেখা হবে

ফাহিম শাহরিয়ার তুহুল

কলেজ নম্বর : ১০৯৫৬

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (প্রভাতি)

আবার দেখা হবে এক সকালে
যখন আকাশজুড়ে প্রকাণ্ড লাল সূর্য উঠবে
আবার দেখা হবে এক দুপুরে,
যখন রৌদ্রের বলমলতায় পাখিরা
আনন্দে গান গেয়ে উঠবে।
আবার দেখা হবে এক বিকেলে,
যখন গ্রামের ছেলেমেয়েরা নদীর ধারে
খেলায় ব্যস্ত থাকবে।
আবার দেখা হবে এক সন্ধ্যায়,
যখন নদীতীরে সূর্যাস্ত দেখা যাবে,
আবার দেখা হবে এক কৃষ্ণপক্ষের আঁধারে,
যখন চন্দ্রমাসের এক পক্ষে চন্দ্রের ক্ষয় হবে।
আবার দেখা হবে এক রাত্রিতে,
যখন আকাশ ভরে পূর্ণ চাঁদ হাসবে।



কুসংস্কার

সাকিব হাসান জিতু

কলেজ রোল : ৯৭৭১

শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : চ (দিবা)

ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি আসে
মোরগ ডাকলে ভোর,
কুকুরে ডাকলে লেজ গুটিয়ে
ছিটকে পালায় চোর।
পেঁচা ডাকলে অশুভ হয়
শকুন ডাকলে মরণ,
হঠাৎ কোন বিপদ নাকি
কাক ডাকার কারণ।
পাখি ডাকলে কুটুম আসে
মিষ্টি হাতে নিয়ে,
বৃষ্টির মাঝে রোদ হাসিলে
শিয়াল মামার বিয়ে।
সত্য মিথ্যা যাচাই করে
টিকটিকি টিক টিক ডাকে,
বউ পাগলা হয় সেই লোকটা
ঘাম থাকে যার নাকে
হঠাৎ করে চোখ কাঁপিলে
দুঃখ আসে বটে,
বসা নাকি যাবে না
ঐ ঘরেরই চৌকাঠে।
যাত্রা নাকি অশুভ হয়
দেখলে খালি কলস পথে,
কাড়ি কাড়ি টাকা আসে
চুলকালে ডান হাতে।
ভাঙা আয়নায় মুখ দেখিতে
মুরবিবদের মানা,
কুসংস্কারে আমরা আজও
চোখ থাকিতে কানা।



মায়ের ব্যথা

মোঃ রবিউল হাসান

কলেজ নম্বর : ১০৭৭৯

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : চ (দিবা)

আমার মায়ের বিয়োগ ব্যথায়
ডুকরে ওঠে মন,
মা জননীর স্মৃতিগুলো
কাঁদায় সারাক্ষণ।
সপ্তবর্ষ পার করেছি
মা ডাকটি ছাড়া,
মা হারিয়ে কাঁদি আমি
কাঁদে আমার পাড়া।
খেজুর গাছের তলে মাকে
শুইয়ে দিলেন বাপ
ছোট ছিলাম মাকে আমার
কেটেছিল সাপ।
মায়ের জন্য কাঁদি আমি
কাঁদে আমার বোন,
মা হারিয়ে পাগল প্রায়
অবুঝ দুটি মন।



বৃষ্টি

মোঃ সাইফ আরমান

কলেজ নম্বর : ১০৭৯১

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (দিবা)

তাকিয়ে আছি আকাশ পানে
আসবে কখন বৃষ্টি
ঘুমিয়ে থাকা পুষ্পকলির
ফুটবে কখন দৃষ্টি
ঐ শোনা যায় বজ্রধ্বনি
আকাশ হলো কালো
রিম বিম বিম মুজাগুলো
ছড়িয়ে দিল আলো।

কষ্ট

যাদের কোনো নেই ঠিকানা
জীবন যাদের ছন্ন
তাদের কথা কেউ ভাবনা
সবাই তাদের অন্য।



জ্যোৎস্না রাতে

মাহামুদুল হাসান

কলেজ নম্বর : ১৬৬৮৫

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : চ (প্রভাতি)

জ্যোৎস্না রাতে দেখেছিলাম আমি
দাঁড়িয়ে ছিলে ছাদের কোণায়,
তোমায় দেখে রাতে জোনাকি
কত শত গান বুনায়ে।
তোমায় দেখে চাঁদও হাসে
একটু মিষ্টি করে,
তাইতো, তখন সুবাস ছড়ায়
রাতের মায়া ভরে।
তোমার চোখের দৃষ্টিকোণে,
ছড়িয়ে থাকে আলো।
জানো না তোমায় আমি
কত বাসি ভালো।

গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি



ছোট পাখি মুনিয়া

মোঃ মিশরাত মাহমুদ

কলেজ নম্বর : ১০২৮৪

শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : খ (দিবা)

সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। আমি তো অনেক অনেক খুশি। পার্টি হবে। আমার বন্ধুরা আসবে। সবাই মিলে অনেক মজা করব। আমি আর আপু মিলে রঙিন কাগজ আর বেলুন দিয়ে ঘর সাজালাম। রাতে সবাই আসল। বাবা অনেক বড় একটা কেক আনলেন। আমি অনেক খেলনা পেলাম উপহার হিসেবে।

ওমা! একী উপহারের মধ্যে কী সুন্দর একটি পাখি। কী যে সুন্দর তার গায়ের রং। একটা সোনালী খাঁচার মধ্যে রাখা পাখিটা। আমি বাবাকে বললাম, বাবা এটা ব্যাটারিতে চলে না চাবি দিলে ঘোরে? বাবা বললেন, কাছে গিয়ে দেখই না কী হয়? আমি তো কাছে গিয়ে অবাক। ওমা! এতো জ্যাস্ত। মানে সত্যিকারের মুনিয়া পাখি। আমার তো খুব খুশি লাগল।

রাতে সবাই চলে গেলে পাখিটার কাছে ছুটে গেলাম ওর সাথে খেলা করার জন্য। দেখি পাখিটি খুব মন খারাপ করে বসে আছে। মাকে বললাম, ওর এত মন খারাপ কেন? কেক খেতে দেইনি তাই? মা বললেন, “তুমি তো তোমার মা-বাবার সাথেই আছো। কত আনন্দ করলে জন্মদিনে। আর ওকে তো মা-বাবার কাছ থেকে আলাদা করে এনে খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। ওর তো মন খারাপ হবেই। এখন যদি কেউ তোমাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে খাঁচায় বন্দি করে রাখে তোমার কি ভালো লাগবে? এই পাখিটিরও ঠিক তেমনই লাগছে এখন।” আমার খুব কান্না পেল। পাখিটির জন্য খুব মন খারাপ হলো। মাকে বললাম, ওকে যদি এখন ছেড়ে দেই, ওকি যেতে পারবে ওর মার কাছে? মা বললেন, ও ঠিক পথ চিনে নেবে।

আমি তখনই মা-বাবার সাথে ছাদে গিয়ে পাখিটাকে আকাশে উড়িয়ে দিলাম। সে কী খুশি। মনের সুখে কিচির মিচির করতে করতে উড়ে গেল। যেতে যেতে একবার ফিরে তাকালো আমার দিকে। মনে হলো যেন আমাকে বলল ‘শুভ জন্মদিন মিশু। অনেক ভালো থেকে।’ আমিও বললাম, তুমি অনেক ভালো থেকে ছোট পাখি। মার কাছে ফিরে যাও।



রাজুর ভূত দেখা

মোঃ আলীউর রহমান

কলেজ নম্বর : ১৬১২২

শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : ক (প্রভাতি)

একদিন রাজু হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে সে তার বাসার দিকে যাচ্ছিল। তখন রাত ১০ টা বাজে। হঠাৎ মনে হলো কেউ তার পিছনে পিছনে হাঁটছে। সে চমকে উঠল। পিছনে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। সে আবার হাঁটতে শুরু করল। এবার কে যেন কাঁপা কাঁপা গলায় তার নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। রাজু, ও রাজু কই যাও? ডাক শুনে রাজু থমকে গেল। ভয়ে তার বুকের ভিতর টিপিস টিপিস করছিল। এবার আর সে পিছনে তাকাল না। সে দৌড়াতে লাগল। তখন ভূতটা সামনে এসে দাঁড়াল। সাদা কাপড়ে পুরো শরীর ঢাকা। মুখ থেকে লাল রক্ত বের হচ্ছে। রাজুকে দেখে সে হেসে উঠল হো হো করে। ভূতটা এবার নাকি গলায় চিৎকার করে উঠল, রাজু এই রাজু আমি তোমার রক্ত খাব, আমি তোমার মাংস খাব। এগুলো শুনে রাজু অজ্ঞান হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন রাজুর জ্ঞান ফিরল, দেখল তার পাশে হাবিব, আলিম, ফিরোজ, নাফিস, আফতান বসে আছে। রাজু যখন চোখ খুলে তাকালো তখন তার বন্ধুরা এক সঙ্গে সবাই বলল Sorry বন্ধু, আমরা সবাই মিলে তোমাকে ভয় দেখিয়েছি। তুমি কিছু মনে করো না। সবাই কথা শুনে রাজু হেসে দিল। আমার গল্পটা শেষ হলো।



তেঁতুল গাছের ভূত

মোঃ হাছান মশউর তাবিব

কলেজ নম্বর : ১৫২৪২

শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)

অনেক দিন আগে এক গ্রামে সবুজ নামে এক ছেলে বাস করত। তার বিদ্যালয় থেকে বাড়ির মাঝে রয়েছে এক ঘন জঙ্গল। বিদ্যালয় থেকে সে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরত। ঐ জঙ্গলের ঠিক মাঝখানে ছিল একটি তেঁতুল গাছ। একদিন সবুজ যখন বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরছিল সন্ধ্যায় যখন সে তেঁতুল গাছটি পেরিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ সেই তেঁতুল গাছের পাতা নড়ে উঠে। সবুজ খুব ভয় পেয়ে গেল এবং সে ছুটে বাড়ির দিকে রওনা হল। সে বাড়িতে গিয়ে সব ঘটনা বলে। কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। তারপর দিন সে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু রাফিকে সব সত্য খুলে বলে। তারপর তারা ঠিক করে দুজনে এক সাথে আজ বাড়ি ফিরব। তারা যখন বাড়ি ফিরছিল তখন মাগরিবের আযান দিচ্ছিল। যেই না আযান শেষ হলো তারাও তেঁতুল গাছের সামনে পৌঁছালো। তখন তেঁতুল গাছের পাতা খুব জোরে নড়ে উঠলো। তখন কোনো বাতাস বইছিল না, তারপর তারা দুজনে বাড়ি ফিরে। কিন্তু সেই দিন তারা কাউকে কিছু বলে নি। তারপর দিন স্কুল বন্ধ ছিল। সবুজের কাকা ছিল একজন কাঠুরে। তাই সে ভালো কাঠের আশায় জঙ্গলের ঠিক মাঝখানে চলে যায় তারপর সে কাঠকাটা শুরু করে সন্ধ্যায় যখন সে বাড়ি ফিরে তখন কোনো কিছুতে পা তার আটকে পড়ে সে পরে অজ্ঞান হয়ে যায়। যখন তার জ্ঞান ফিরে তখন প্রায় রাত আটটা বাজে। তারপর সে বুঝতে পারে কেউ তাকে টানছে। তাকে টানতে টানতে তেঁতুল গাছের উপর নিয়ে যায়। সে পিছনে

তাকিয়ে দেখে খুবই ভয়ঙ্কর দেখতে এক লোক যার প্রায় তিন চোখ এবং বড় বড় দাঁত ও নখ এবং সে ছিল সম্পূর্ণ কালো এবং চোখ ছিল লাল। সবুজের কাকি তো খুব চিন্তায় পড়ে যায়। সে সবুজের বাসায় গিয়ে তার কাকার না ফেরার কথা বলে সবুজ বুঝতে পারে তার কাকার সাথে নিশ্চই কোন খারাপ কিছু হয়েছে। সে একমুহূর্ত দেরি না করে তাদের সাথে ঘটা সব ঘটনা বলে। তারপর তার কাকার না ফেরার কথা পুলিশদের জানায়। পরের দিন সবুজ যখন বিদ্যালয়ে যায় তখন চামড়া ও জুতা দেখতে পায়। এরপর সে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি খুব জলদি ছুটে যায়, তারপর সেই সব জিনিস দেখায়। তারপরের দিন সবুজ তার এক বন্ধু তাহমিদ যে ঢাকায় থাকে তাকে ফোন দেয় এবং সব ঘটনা বলে ও আরো বলে যাতে সে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেই পুরো জঙ্গলের তথ্য খুঁজে বের করে। সেই রাতে সবুজ সহ আরো বন্ধু মিলে ঠিক করে মশাল নিয়ে দুজন যাবে ও দুটো লাইট নিয়ে যাবে। সঙ্গে থাকবে দিয়াশলাই, সাইকেল ও কিছু ছোঁড়ার জন্য মারবেল। তারা সাইকেলে করে যখন যায় তার ঠিক ৪৮ মিটার আগে একজনের সাইকেল থেকে পাম চলে যায়। তারপর ২৫ মিটার দূরত্বে আর একজনের সাইকেলের পাম চলে যায়। এরপর ১২ মিটার দূরত্বে আর একজনের, এবং সর্বশেষ সবুজেরটা ফেটে যায়। তখন তারা ছিল সেই তেঁতুল গাছটির সামনে। তারা চালাকি করে কোন বাতি জ্বালায়নি। তারপর সবুজ কিছু একটার সাথে ধাক্কা খায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাতি জ্বালায় এবং দেখে সেই ভূত, তারপর তারা মশাল বের করে এবং পুড়িয়ে দেয় কিন্তু সে পুড়ল না। তারপর তারা লাইট ও মশাল এক সাথে ছুড়ে মারল। তারপর ভূতটি পুড়তে লাগল সেই আগুন প্রায় একঘণ্টা পর্যন্ত জ্বলছিল। তার পরের দিন সবুজের বন্ধু তাহমিদ তাকে ফোন দিয়ে বলে, অনেক বছর আগে সেই জঙ্গলে তেঁতুল গাছটিতে এক নারী ও পুরুষকে বেঁধে মারা হয়েছিল। আর তারপর থেকে তারা সর্বদা সেই গাছ এড়িয়ে চলত।



কল্পবাজার ভ্রমণ

রাফসান আহমেদ

কলেজ নম্বর : ৯৪৮৩

শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (দিবা)

আমি ভ্রমণ করতে পছন্দ করি। এখন শীতকাল। আমরা কল্পবাজার ভ্রমণ করতে যাব। ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ এই দিনে আমরা কল্পবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হবো। আমি, আমার আব্বু-আম্মু, আমার ছোট ভাইয়া, আর আমার খালামনি সহ সবাই মিলে রওনা করলাম সন্ধ্যা ৭ টায়। আমাদের ট্রেন ছাড়লো রাত ৮ টায়। আমাদের ট্রেনের কেবিনটা ছিল ভিআইপি। সেখানে ওপরে নিচে চারটা বেড ছিল আমরা আমাদের কেবিনে ঘুমিয়ে, গল্প করে, হালকা নাস্তা করে অনেক মজা করে রাতটা পার করলাম। সকাল ৭টায় আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছলাম। আবার অন্য একটি গাড়িতে করে কল্পবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বেলা ১১টায় আমরা কল্পবাজার পৌঁছলাম। আমাদের হোটেলের নাম 'ওশেন-প্যারাডাইস'। আমরা হোটলে বুকিং দেওয়া হয় তলার একটি ফ্যামিলি সুইট রুমে উঠি। তারপর আমরা ফ্রেশ হয়ে নেই। তারপর আমরা ওই হোটলেই দুপুরের খাবার খাই। আমরা রুমে গিয়ে একটু বিশ্রাম করি। বিকেলে আমরা সবাই সমুদ্র দেখতে বের হই। আমি প্রথম সমুদ্র দেখলাম এবং এই বীচের নাম সুগন্ধা বীচ। আমরা



জলবায়ু পরিবর্তন

ইনতিসার হক জোয়াদ্দার

কলেজ নম্বর : ৮৬০৮

শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : গ (দিবা)

জলবায়ু হলো আবহাওয়ার দীর্ঘ সময়ের গড় অবস্থা। কোনো নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়ার সামগ্রিক অবস্থাই জলবায়ু। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ বলে। এর ফলে আবহাওয়ার উপাদানের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটছে। এর ফলে বিশ্বের জলবায়ুও বদলে যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড তাপ আটকে রাখে। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠ সবসময় উত্তপ্ত থাকে। আর তাপ ধরে রাখার এ ঘটনাকেই গ্রিন হাউজ প্রভাব বলে।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, জলবায়ুর এই পরিবর্তন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সমস্যার সৃষ্টি করবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগঝুঁকি বৃদ্ধি করবে। আর এ প্রভাব মোকবেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন। নিম্নে এটি ব্যাখ্যা করা হলো- জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। সুতরাং বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধির হার কমিয়ে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে পারি। এজন্য তেল, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো অনবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহার কমাতে ও অধিক হারে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন কমানো যায়। এ

সকল কর্মকাণ্ড দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমায়ে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন পরিবর্তিত জলবায়ুতে টিকে থাকার জন্য গৃহীত কর্মসূচিই হলো জলবায়ু পরিবর্তনের খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন। এর উদ্দেশ্যে হলো সৃষ্ট ঝুঁকি কমানো ও পরিবর্তিত জলবায়ুতে টিকে থাকার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

যেমন :

- ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, কলকারখানা ইত্যাদি অবকাঠামোর উন্নয়ন।
- লবনাক্ত পরিবেশে বাঁচতে পারে এমন ফসল উদ্ভাবন;
- উপকূলীয় বন সৃষ্টি;
- জীবনযাপনের ধরন পরিবর্তন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কিত ধারণা সকলকে জানানো;
- বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।



সড়ক দুর্ঘটনা

নাফিস মোস্তাকিম

কলেজ নম্বর : ১৫১০০৪৪

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ (প্রভাতি)

বর্তমানে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। এবং আহত হন অসংখ্য মানুষ। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে ঈদের যাত্রায় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার পুরুষ, নারী এবং শিশু। মূলত অসতর্কতার কারণে এমনটি হয়ে থাকে। গত ২৫.০৮.২০১৮ তারিখে এমনই একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম। ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার পর রাজধানী ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। তবে রাস্তায় এক মর্মান্বহত দুর্ঘটনার শিকার হবো তা ভাবতে পারিনি। আমি বাবা এবং আমার মা সকালের নাস্তা খেয়ে আনুমানিক ৯.৩০ মিনিটে গাড়িতে ওঠার জন্য বের হলাম। বাসস্টপে যাওয়ার সময় খানিকটা জ্যামে পড়েছিলাম এই অসংখ্য জ্যামে আর সি এন জি চালিত অটোরিক্সায় বসে থাকতে পারলাম না, সিএনজি থেকে নেমে হাঁটা ধরলাম শত শত মানুষ। মনে হলো সবাই জীবিকার টানে রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। খানিকটা যেতে না যেতেই দেখলাম অনেকগুলো মানুষ ছমড়ি খেয়ে পড়ে কী যেন দেখছে। সাথে ৩ থেকে ৪ জন পুলিশ অফিসার। ভীড়ের ভেতরে চোখ দিতেই লক্ষ করলাম কেউ একজন কাঁদছেন এবং বারবার বলছেন, “সোহেল সোহেল তুই কই গেলি রে ফিরে আয়।” আমি অবাক হয়ে গেলাম; ভাবলাম মৃত্যু কত ভয়ঙ্কর! একটি ছোট শিশু রাস্তায় পড়ে আছে, সারা শরীর রক্তে মিশে গেছে, মগজ অর্ধেকটা বের হয়ে গেছে। দেখে ভয় পেয়ে গেলাম, তারপর জানা গেলো ছেলেটি তার মায়ের সাথে জীবিকার টানে ঢাকায় আসছিলো। তবে রাস্তায় যে এইভাবে শেষ হয়ে যাবে তা ভাবতে পারিনি তার মা। সকালে বাসস্টপে রাস্তা পার হওয়ার সময় মায়ের হাত ছেড়ে দৌড় দিয়েছিলাম। তবে তার সামনে থাকা একটি ট্রাক ধাক্কা দিয়ে তাকে জীবনে শেষ শ্বাসটুকুর দুয়ারে পৌঁছে দিলো। সাথে সাথে এই ছোট শিশুটিকে অসময় এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো। অসতর্কতার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আমরা সবাই নিরাপদে চললে আমাদের সড়ক আমাদের হাতে নিরাপদ হবে।



মুমিনের সহজ মৃত্যু

বি এন তাইনীন সাজনান

কলেজ নম্বর : ১৫৪০৩৫০

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক (দিবা)

প্রতিটি মুমিন ও মুসলিম ব্যক্তি চায় ইহকাল ও পরকালের শান্তি। আর এ শান্তি নির্ভর করে নেক আমলের ওপর। আল্লাহর বান্দার নেক আমল তাকে দুনিয়া ও পরকালের শান্তির সুসংবাদ দেয়। মুমিন ব্যক্তির নেক আমলের কারণে সে প্রাপ্ত হয় সহজ মৃত্যু। মৃত্যুর কষ্ট বড় কঠিন যা লেখে শেষ করা যাবে না।

মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর সময়ই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে যায়। মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া হতে শেষ বিদায় নিয়ে আখিরাতের পথে যাত্রা শুরু করে তখন তার কাছে আসমান থেকে একদল ফেরেশতা আগমন করেন। তাদের চেহারা এত উজ্জ্বল ও জ্যোতিময় যে চেহারার ভিতর যেন দীপ্তিমান সূর্য ভাসছে। তাদের সঙ্গে আছে জান্নাত হতে আনিত কাফন ও খুশবু তারা মুমিন ব্যক্তির সুদূর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বসে যায়। অতঃপর মালুকুত মউত তার শিয়রে উপবেশন করে এবং তাকে বলে, হে নফছে মুতমাইন্বা হে আল্লাহ পাগল রুহ, তুমি আল্লাহর হুকুম মেনে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী জীবন কাটিয়েছে। এখন আল্লাহর ক্ষমা ও তারপরম সমস্তুষ্টির স্বাদ আশ্বাদন করার জন্য বের হয়ে আসো। রুহ তখন সহজেই বের হবে।

ফেরেশতার জান্নাতি কাফন ও খুশবু দ্বারা রুহকে আবৃত করে নেয়। তা থেকে দুনিয়ার অতীত সুগন্ধময় মেশক তীব্র সুগন্ধ ছড়াতে থাকে। অতঃপর তারা তাকে নিয়ে উর্ধ্ব জগতের দিকে যাত্রা শুরু করে। যখনই ফেরেশতাদের কোন দলের সঙ্গে সাক্ষাত হয় তারা জিজ্ঞেস করে যে কে এই পবিত্র রুহ? কী তার পরিচয়? বহনকারী ফেরেশতার দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ উত্তম নাম সমুহ বলে তার পরিচয় পেশ করে যে ইনি অমুকের সন্তান অমুক। এভাবে তাকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছে। অনুরূপভাবে সব আসমান অতিক্রম করে। যখন সপ্তম আসমানে পৌঁছানো হয়। যখন আল্লাহ বলেন যে বান্দাটির নাম লিপিবদ্ধ কর এবং কবরের সওয়াল জওয়ালের জন্য তাকে জমিনে নিয়ে যাও। অতঃপর রুহকে দেহে প্রবিষ্ট করানো হয়। এরপর তার কাছে দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসায় এবং প্রশ্ন করে যে তোমার রব কে আল্লাহ? তোমার ধীন কী ইসলাম? তারা আবার প্রশ্ন করে কে এই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। আবার প্রশ্ন তুমি তা কীভাবে জানলে। সে উত্তর দেয় আমি আল্লাহর কিতাব পবিত্র কোরআনে সব বক্তব্য সত্য বলে গ্রহণ করেছি। এ সময় আসমান থেকে এক মহান ঘোষণাকারী যথাসময় আল্লাহ পাকই ঘোষণা করেন আমার বান্দা সঠিক সত্য জবাব দিয়েছে। অতএব তার জন্য জান্নাতের বিছানা দাও। তাকে জান্নাতি পোশাক পড়িয়ে দাও। তার শান্তির জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতের বাতাসও জান্নাতি খুশবু আসতে থাকবে। কবরকে তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কে মুমিন হয়ে মৃত্যু বরণ করার তওফিক দান করুন।



বিস্ময়কর রাত

ফখরুল আলম (ফাহিম)

কলেজ নম্বর : ১৫২০৩১৫

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ (দিবা)

অনাকাঙ্ক্ষিত সেই রাতটির কথা মাথায় আনলে বিম্বিম্বিত করে ওঠে। ২০১৭ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে ছিলাম। পিএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ ছুটি পেলাম। আমরা ছয় বন্ধু (আমি, ফাহিম, আলভী, রাইয়ান, রিয়াজুল, ফেরদৌস ও ফাইয়াজ)। এই বন্ধু আমরা শ্রেণিশিক্ষকের সাথে কথাবার্তা বলে সিদ্ধান্ত নিলাম কুমিল্লার পাহাড়তলিতে যাওয়া হবে। ৩ নভেম্বর আমরা যথাসময়ে সেখানে পৌঁছলাম। সবাই অনেক খুশি হয়ে ঘুরা-ফিরা করছে। রাইয়ান বলল কার কাছ থেকে যেন শুনেছিলাম- সামনে ‘মৃতবন’ নামক একটি জায়গা রয়েছে। সামনে সাইনবোর্ডে দেখলাম “সামনে মৃতবন যাবে না মরণ।” এ কথা শুনে আমরা আরও আগ্রহী হলাম। তবে ফেরদৌস এবং রাইয়ান আমাদের সাথে গেল না। যাই হোক আমরা আগানো শুরু করলাম। কাউকে কিছু না জানিয়ে আমরা গেলাম। একটু দূর এগোতেই আমরা বুঝলাম, এখানে মানুষ কখনই থাকার কথা না। রাস্তার পাশে একটি ছোট খালি মাঠ। সব পরিষ্কার কোনোদিকেও এতটুকু ময়লা নেই। অবশেষে আমরা ‘মৃতবন’ পৌঁছলাম চারদিকে ঘন জঙ্গল। পাশে একটি পুকুর অদ্ভুত ব্যাপার- পুকুরটির পানি পুরো লাল। মনে হচ্ছিল রক্ত। সামনে পুরো অন্ধকার। পাশে একটি পুরনো একটি বাড়ি দেখলাম। অন্ধকার হওয়ায় সবাই বলল, আজ এ বাড়িতে থেকে যাই। সকলেই সম্মত হলাম। দরজা খুলতেই অনেকগুলো বাদুর বের হলো। আমরা দেখি, একজন বৃদ্ধ চাচা আমাদের বলছে, “এখানে তোমরা আসলে, তোমরা জানো তোমরা কত বড় ভুল করেছ।” যাই হোক আজ এখানে থাকো, আমরা তখন বাড়িতে ঢুকলাম। বাড়িটি বেশ বড় এবং একটু আজব ধরণের। লোকটি আমাদের জন্য নাস্তা বানানোর জন্য গেল। আমি ও আলভী নিচে গিয়ে দেখি রান্নাঘরে বৃদ্ধ লোকটি তার মেয়ে ও স্ত্রীকে বলছে, আজ দীর্ঘ ৬০ বছর পর পেট শান্তি পাবে। তারা পাটা, ছুরি, বটি ঠিক করছিল। আলভীর গায়ে লেগে একটি বোতল পড়ে আওয়াজ হল, তারাও বুঝে গেল। আমরা দুজন রিয়াজুল ও ফাইয়াজকে ডাক দিয়ে সর্বোচ্চ গতিতে দৌড়ানো শুরু করলাম। আমরা বুঝে গেলাম তারা রক্তক্ষয়ী হিংস্র প্রাণী। সামনে রাস্তার দুদিকে দেখি মানুষের কঙ্কাল ও হাড়, যা থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। মনে হয় যেন, ৬-৭ ঘণ্টা আগের। আরো সামনে দেখি পুরোই মৃতদেহ। কারো গলা-কাটা, কারো পা নেই। আবার কার ও হাত- পা, গলা কিছুই নেই। আমরা ভয়ে কাতর হয়ে উঠলাম। আমরা দৌড়াতে থাকলাম এমন সময় বিভৎস চেহারার এক দানব আমাদের সামনে হাজির হল। এক চোখ কানে, আরেক চোখ কপালে, চুল কোঁকড়ানো দেহের রং ভীষণ কালো। ফাইয়াজ ভয়ে কেঁদেই দিল। দৌড়াতে গিয়ে রিয়াজুল পায়ে ব্যথা পেল এবং বসে পড়ল। দানবটি সামনে এগোচ্ছে, ঠিক এমন সময় এশার আযান শোনা গেল। আযান শোনা মাত্রই দানব ও লাশগুলো উধাও হয়ে গেল। মনোরম পরিবেশ ফিরে এল। রিয়াজুল-এর পা মচকে গেছে, ফাইয়াজ হাতে ব্যথা পেয়েছে, আমার ও আলভীর অবস্থাও ভালো নয়। আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। একসময় আমরা শহরে পৌঁছলাম। সেখানকার লোকজন আমাদের দেখামাত্রই পরিচয় নিয়ে আমাদের শিক্ষকের কাছে নিয়ে যায়। কারণ আমরা হারানো মাত্রই শিক্ষকরা লিফলেট ও মাইকে ঘোষণা করেছিল। পরে আমরা ৪ বন্ধু বিশ্রাম নিই। সবাইকে সব কথা খুলে বলি। শিক্ষক বললেন, সেখানে- এর আগে নির্মম রাজা মতিউর সেনের শাসনকাল ছিল। সে কাউকে ক্ষমা করত না। যাকে ইচ্ছে তাকে ফাঁসি দিত। ছোট অপরাধে নারীদের নির্যাতন করত। এবং

কঙ্কাল সংরক্ষণ করত। এসব শনার পর থেকে মানুষ বলে, এখানে ভূত-প্রেত বাস করে। তোমরা সেখান থেকে কীভাবে বেঁচে আসলে? আমরা বললাম সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায়। এরপর সেখানে কেউ যাওয়ার নামও নেয়নি। রহস্য রহস্যই থেকে গেল।



গল্প ডায়েরি

নকিবুল ইসলাম জিদান

কলেজ নম্বর : ১০৩৫৩

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ঘ (দিবা)

২০-১০-৫০২০; সকাল ৮ টা

০১. নিউইয়র্কের অমেগা সিটিতে সর্ববৃহৎ ‘রিকিয়াম টাওয়ার’- এ আমি গত তিন দিন ধরে বন্দি। মাথায় শত-সহস্র চিন্তা, সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে; কিছুই পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছি না। তাই ডায়েরি লিখে মন শান্ত করতে চাচ্ছি। আমি বর্তমানকালের বিজ্ঞান একাডেমির প্রধান ড. রিকিয়াম জারিফ। আমি ডায়েরিতে আগেও লিখেছি, আমার নামের শেষে এই “জারিফ” নামক অদ্ভুত অংশটুকু খুব সম্ভবত দক্ষিণ-এশীয় কোনো নাম। যদিও এশিয়া মহাদেশ বর্তমানে ইউরোপিয়ান অষ্টম স্তরের রোবটদের সাথে ধুলোয় মিশে গিয়েছে। ওহু লিখে রাখি; আমি আমার আবিষ্কৃত নবম স্তরের রোবটদের হাতে বন্দি হয়ে আছি।

কেন? কারণ, আমি গত দশ বছর ধরে টাইম ফ্রেকোয়েন্সি কনভারশন ডায়ালেশন চিপ-সেডেট লোকো-মোডেড যেই যন্ত্রটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি, তা মানুষের চেয়ে আবেগ প্রণিত এই নবম স্তরের রোবটরা কেড়ে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, আমাকে বন্দি করে ফেলেছে। যদিও আমার কাছে একটি ছোট চিপ আছে; তবে এটা দিয়ে কী করা যায় বুঝতে পারছি না। ইশ যদি লুশান থাকত! সে একমাত্র ব্যক্তি যে আমাকে বাঁচাতে পারে। ওকে খবর দেওয়ার কোনো মাধ্যম নেই, ও নাকি আমার যন্ত্র টেস্ট করতে একবিংশ শতাব্দীতে চলে গেছে। ইউরেকা! আমি... আমা... আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এসেছে। এই ডায়েরিটি বর্তমানে যে পড়েছেন তিনি খুব সম্ভবত দক্ষিণ-এশীয় কোনো ব্যক্তি। আমি ডায়েরিটা একবিংশ শতাব্দীর শুরু দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পাঠক, আমার পরিচয় আপনি নিশ্চয় পেয়েছেন এবং আমার সমস্যা সম্পর্কেও আপনি অবগত। যদি আপনার জানামতে লুশান নামক কোনো যুবক থেকে থাকে, তাকে এই ডায়েরিটা দিবেন। সেই তার ওভার-ডায়াল যন্ত্রের মাধ্যমে রোবটদের বিকল করে দিতে পারবে। ওর মাথার খুব বুদ্ধি, কেননা ও আমাদের পৃথিবীর একমাত্র ১০ম স্তরের রোবট।

বিনীত

ড.রিকিয়াম জারিফ

০২. কীরে তিথি? তোর সাজগোজ এখনো হয়নি? তোর অকর্মা বোনগুলো কী করছে? কীরে রুমা, বন্যা শুনছিস আমার কথা? বরষাত্রী এসে গেছে। কড়া গলায় তিথির মা বলল।

‘আসছি, একটু ধৈর্য ধরো, খালামণি’ বলল বন্যা।

তিথির সাজানো শেষ হয়ে গেলে তার বোনরা তাকে তাড়া দিয়ে চলে গেল। তিথি অবাধ হয়ে লক্ষ করে, তার বিছানায় একটি ডায়েরি। সে ডায়েরিটা খুলে পড়তে থাকে।

ধীরে ধীরে ওর চোখ ঝাপসা হয়ে উঠে। সে ভাবতে থাকে, এটা কীভাবে সম্ভব, কীভাবে? সেই যুবককে প্রথম দেখায় ভালো লেগেছিল। যার হাস্যরস জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলো, যার ছোট ছোট কথা শোনার জন্য কান অধীর হয়ে উঠত, যাকে দেখলেই তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠত; যার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে, সেই যুবক... কীভাবে? এমন সময় মায়ের কথা শোনা গেলো। ‘তিথি, বের হ। লুশান এসে পড়েছে।’

তিথি তার চোখ মুছল সে বের হলে। তার হাতে একটি দায়িত্ব আছে সে ডায়েরিটা নিয়ে লুশানের উদ্দেশ্য উঠে দাঁড়াল।



সাজেকের উদ্দেশ্যে

এস. এম তৌশিফ উদ্দিন চৌধুরী

কলেজ নম্বর : ১৫১০৩৪৪

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : খ (দিবা)

আমার ঘড়িতে তখন বাজে রাত ৯:৪৫ মিনিট। আমার কাঁধে ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর কিছু গরম কাপড়। কেননা, তখন শীতকাল। আমি পরেও আছি সেই রকমই একটা কাপড়। তাও কেন জানিনা শীত লাগছে। আমি তখন কল্যাণপুর বাস টার্মিনালের শ্যামলী বাসের কাউন্টারে বসা। আসল কথা বলা হয়নি। আমরা যাবো ‘সাজেকে’। গায়ক ইমরান খানের একটি গান ‘বলতে বলতে চলতে চলতে’ গানটির রেকর্ড সেখানে হয়েছে। গানটির ভিডিও দেখে জায়গাটি অনেক সুন্দর লেগেছে। আর ডিসেম্বর মানে কোথাও না গেলে হয়! তাই ঠিক করা হয়েছিল যে সাজেক যাওয়া হবে। আমার সাথে আমার মা-বাবা, ভাই, দু’জন খালাতো বোন, খালাতো বোনের এক বন্ধু এবং আমার এক খালাতো ভাইসহ মোট আট জন। বলা যায় পুরো একটা গ্যাং। হঠাৎ রাত ১১.৪৫ মিনিটে একটি বাস এসে দাঁড়ায়। একজন দৌড়ে এসে হকচকিয়ে বলে, ‘খাগড়াছড়ির যাত্রীরা চাইল্যা আসেন। বাস আইসা পড়ছে।’ আমরা সবাই নিজ নিজ ব্যাগ নিয়ে বাসে উঠার জন্য চলে যাই। বাসে উঠে আরেক ঝামেলা। নতুন কোথাও যাচ্ছি, জানালার ধার কী কেউ ছাড়ে? সবাই জানালার পাশে বসতে চায়। কিন্তু আমরা যে টিকেট করেছি তা অনুযায়ী শুধু ৪ জন জানালার পাশে বসতে পারবে। আমি ভাবলাম শীতের সময় জানালা এমনিও খোলা যাবেনা। তাই আমি বললাম, ‘আমাকে একটা সিট দিয়ে দাও। আমার ঘুম ধরেছে।’ আমার কথা শুনে সবাই একটু শান্ত হয় এবং যে যার মতো বসে যায়। আমার পাশে আমার খালাতো বোন বসেছিল। তার নাকি আবার বমি হয়। তাই সে জানালা একটু খুলে দিল যাতে একটু হাওয়া আসে। কিন্তু রাতে বাস যে কত বেগে যাবে আল্লাহই জানে। আস্তে আস্তে বাসের লাইটগুলোও নিশ্চয় হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু আমার আর চোখে ঘুম নেই আনন্দে। আমার সিট থেকে বাসের একদম সামনে পর্যন্ত দেখা যায়। তাই আমি সামনে তাকিয়ে রইলাম। আস্তে আস্তে করে বাস কখন যে মেঘনা নদী, দাউদকান্দি, কুমিল্লা বাইপাস পার হয়ে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। কারণ, আমি যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা নিজেই জানি না। হঠাৎ করে চোখ মেলি। মিষ্টি মিষ্টি রোদ জানালার কাঁচ ভেদ করে আমার চোখে এসে পড়ে। আমি ভয় পেয়ে যাই, আশে পাশে দেখি চা-বাগান। ভাবলাম সিলেটে ভুল করে চলে আসলাম নাতো? তখনই আমার মনে পড়ে, বইয়ে পড়েছি যে, ‘সিলেট ও চট্টগ্রাম চা-বাগানের জন্য বিখ্যাত।’ পরে বুঝতে পারলাম, এখন তাহলে চট্টগ্রাম এ চলে এসেছি। বাস তখন খুব আস্তে আস্তে চলছিল। কারণ, রাস্তা খুবই আঁকা-বাঁকা, উচু-নিচু এবং বিপজ্জনক। কিছু পথ যেতেই বাস থেমে গেল। বাস চালক বললেন, ‘সামনে ব্রিজ ভাঙা। ছাড়তে সময় লাগবে।’ এ কথা বলে বাস আবার চলা শুরু করল। এক যাত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সামনে ব্রিজ ভাঙা, তো যাবেন কীভাবে?’ তখন বাস চালক বলল, ‘ব্রিজ গতকাল

ভাঙা ছিল। আজ নেই।’ মনটা খুব স্বস্তি পেল। কারণ, এমতাবস্থা হলে দু-তিন ঘণ্টা দেরি হতো। ঘড়ির দিকে তাকাই। দেখি সকাল ৭:৩৯ মিনিট। বাস ধীরে ধীরে খাগড়াছড়ি শহরে ঢুকছে। খাগড়াছড়ি বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। সামনে বড় করে ইট প্রাচীর দিয়ে তৈরি একটা দেয়ালে লেখা : ‘স্বাগতম, খাগড়াছড়ি জেলা, পার্বত্য অঞ্চল বিভাগ।’ যেতে যেতে খাগড়াছড়ি বাস টার্মিনালে গিয়েও পৌঁছাই। সবাই তখন বাস থেকে নেমে পড়ে। বাস থেকে নেমে বাবা বললেন, ‘এখন, একটা মোটোলে বসে সকালের নাস্তাটা করে ফেলা যাক।’ তাই আমরা করলাম।

নাস্তা করে এবার আমরা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হবো সাজেকের উদ্দেশ্যে। এখন তো মাত্র খাগড়াছড়ি জেলার শহরে। এখান থেকে আরও ১২২ কি.মি. দূরে সাজেক। পুরো এরকম ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের দূরত্ব। সাজেক যেতে হলে আবার লাগে এক ধরনের গাড়ি। স্থানীয়রা সে গাড়িকে ‘চান্দের গাড়ি’ বলে। নামটা ভীষণ আজব। এ গাড়িতে কমপক্ষে ১২-১৬ জন বসা যায়। আমরা ছিলাম ৮ জন। তাই আমাদের সাথে যুক্ত হলো আমাদের মতোই আরেকটি দল। বড়রা গাড়ি ঠিক করতে গেল। গাড়ির ভাড়া জিজ্ঞাসা করার পর আমাদেরকে ডাক দিলে আমরা সবাই গাড়িতে গিয়ে উঠি। তখন প্রায় বাজে ১০ টা। গাড়িওয়ালা বললেন যে ৩ ঘণ্টার মতো লাগবে। এমনিতেই সারা রাত এতো লম্বা একটা সফরের পর আবার আরেকটা সফর। আমি তখন বিরক্ত অনুভব করলাম। আবার যাত্রা শুরু হলো। যাত্রার মাঝে বিরতি দেওয়া হয়েছিল। কারণ গাড়ির ইঞ্জিন বেশি গরম হয়ে গেলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গাড়ি যখন বিরতি দিয়েছিল তখন জায়গা ছিল একটা বাজারের মধ্যে। সেখানে অনেক অনেক পাকা পাকা ফল বিক্রি করছিলেন সেখানকার স্থানীয়রা। আমার মা একজন কলা বিক্রেতার কাছে গিয়ে বললেন, ‘কলা কত করে?’ উত্তরে কলা বিক্রেতা বললেন, ‘হালি ৮ টাকা, ডজন ২০ টাকা।’ দাম শুনে আমি হতবাক। ঢাকায় যেখানে হালি ২০ টাকা করে কলা কিনে নেওয়া হতো। গাড়িতে খাওয়া যাবে। ড্রাইভার ডাক দিল, বলল, ‘গাড়ি ছাড়বে। জলদি আসেন, গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।’

প্রায় দুপুর বাজে ১টা। আমি ড্রাইভার আক্কেলকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আরও কত দূর?’ ‘বেশি দূর না, এই তো চলে এসেছি’- তিনি বললেন। সামনে তাকাতেই দেখি একটা উঁচু স্তম্ভের রাস্তা। কিছুক্ষণ পর দেখি গাড়ি সেই পথ দিয়ে এগুচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন ফ্যান্টাসী কিংডমের রোলার কোস্টার। কিন্তু ইঞ্জিন যদি একবার বন্ধ হয়ে যায় তবে গাড়ি যে নিচে কোথায় গিয়ে পড়বে তা নিজেও জানি না। অবশ্য উপরে উঠতে বেশ মজাই লাগছিলো। কারণ, এই রাস্তাটি ছিল সবচেয়ে উঁচু। আর এই রাস্তা পেরলেই সাজেক উপত্যকা। প্রায় দেড়টার দিকে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। আমরা একটা মোটেলও ভাড়া করে রেখেছিলাম। মোটেলের নাম ‘মেঘ-মাচাং।’ সেখানের প্রায় সব মোটেলই টিনের চাল দিয়ে রাস্তার দু-পাশে পাহাড়ের উপর বাঁশ গেড়ে তোলা হয়েছে। কোনো কোনোটি আবার দোতলাও করা হয়েছে। মোটেলের কক্ষে যাবার পর প্রথমেই আমার নজর পেল একটা জানালার দিকে। আমি জানালাটার কাছে গিয়ে জানালাটার ছিটকিনি খুলে জানালাটা আস্তে করে বাইরের দিকে ধাক্কা দিলাম। যেমনি জানালা খুলল, অমনি আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে পুরো মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বাইরে পাহাড়গুলো এতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। হঠাৎ নিচে তাকাই। যেন শুধু কালো দেখাচ্ছে। আমি ভাবলাম, ‘তাহলে আমরা কতটা উঁচুতে আছি, যেখান থেকে নিচে কালো দেখায়?’ আজকে এতো লম্বা সফর করে আমি খুব ক্লান্ত। তাই ভাবলাম, আজ আর কোথাও যাব না। আমি সাথে সাথে বাবাকে গিয়ে এ কথাটি জানালাম। সে উত্তরে বলল, ‘ঠিক আছে।’ আমি তারপর আমার রুমে গিয়ে ছিনায় শুয়ে পড়লাম।

কয়েক ঘণ্টা পরে। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। দেখতে গেলাম বাকিরা কী করছে। দেখলাম সবাই রাগ করে বসে আছে। আমি তাদের কাছে গিয়ে বললাম, ‘কী হয়েছে তোমাদের মন খারাপ কেন?’ উত্তরে একজন

বলল, 'নেট শ্লো।' আরেকজন বলল, 'ফোনে চার্জ নাই।' আরেকজন বলল, 'সেলফি তুলব। কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড পাচ্ছি না।' আমি মনে মনে এদের কথা শুনে হাসছিলাম। আমি পরে বললাম, 'আচ্ছা, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। এই সব কাজ তো বাসায় করতে পারো। এখানে তো ঘুরতে এসেছি। চল, সবাই ঘুরতে যাই। এখন হয়তো গোখুলি বেলা। কিন্তু, আমরা এ জায়গাটি ঘুরে দেখতে পারি। এখানকার মানুষদের সাথে কথা বলতে পারি।' এই সময় আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু আমার বড় ভাই আমাকে বলে, "আর জ্ঞান দিতে হবে না!"

আমরা সবাই মিলে বাইরে গেলাম। জায়গাটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম জায়গাটির মানুষগুলোর সাথেও কথা বললাম। তারা উপজাতি হলেও বাংলা ভাষা বোঝে এবং বলতে পারে। সেখানকার তাদের স্থানীয় জিনিসপত্রগুলো অনেক সুন্দর। কেউ কেউ সেই সব জিনিস কিনেও ফেলল। তারপর একটা খোলা জায়গায় বসে সবাই সেখানকার ঝালমুড়ি খেয়ে দেখলাম। তারপর মোটোলে ফিরে এলাম। সেখানে এসে দেখি রাতের খাবার আগে থেকেই প্রস্তুত। এতো তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খাইনি।

রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। পরের দিন ছিল আসল মজা। ভোর বেলা উঠে যেমনি দরজা খুলে বারান্দায় যাই তেমনি দেখি শুধু সাদা সাদা কুয়াশা। কিন্তু আমি জানতে পারি যে, সেগুলো কুয়াশা নয় বরং মেঘ। আমি সত্যিই কল্পনা করতে পারছিলাম না, এগুলো মেঘ, তাও আবার আমার এতো কাছে। পরে আমরা সকাল হতেই চলে যাই গানটির শুটিং পয়েন্টে। গানে আমি দেখছিলাম একটি হেলিপ্যাড, একটি লাল টিন সমৃদ্ধ বাড়ি এবং মাঝখান দিয়ে একটি রাস্তা। সেখানে যাওয়ার পর দেখি তাই। এগুলো ঐ রকমই যেমন আমি গানে দেখেছি। হেলিপ্যাডের ঘাসের উপর বড় করে একটি 'ঐ' লেখা। আর বাড়িটির কাছে গিয়ে দেখি সেই বাড়িটির নামও 'ফনময়' আমরা পরে সেখান থেকে চলে গেলাম 'আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্রে।' সেখানে সবাই হাতে মশাল জ্বালিয়ে সারি বেঁধে হাঁটা শুরু করে সেখানে পায়ের নিচে পানি মাখার উপর পাথর। অনেকটা ভুতুরে মনে হচ্ছিল। এরই পাশে আছে একটি বৌদ্ধমন্দির। আমরা সেটিও পরিদর্শন করলাম। পাশাপাশি একটি ঝর্ণাও দেখেছিলাম। সেখানে গিয়ে পা ডুবিয়েছিলাম। সেই পানিতে অনেক ছোট ছোট মাছ। সেগুলো পায়ের সঙ্গে স্টিক দিয়ে শুধু চাটছিল। কিন্তু আমি সেটাকে সাপ ভেবে ভয়ে পানি থেকেই উঠে এসেছিলাম। আমাদের এর পাশাপাশি 'রাঙামাটি বুলন্ত ব্রীজ' পরিদর্শন করার কথা ছিল। কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য সেখানে যাওয়া হয়নি। ফিরে আসার দিন একদম বুঝি বৃষ্টি। এর কারণ হয়তো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। তাই আসার দিনটি আমার জন্য খুবই খারাপ ছিল। মনে হচ্ছিলো, কী যেন ফেলে আসছি। এই এতো সুন্দর প্রকৃতিকে ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে করছিলো না। কিন্তু যেতেই হবে। আর এর সাথে আবার ফিরে এলাম আমার শহর 'ঢাকাতে।' আবার সেই পড়াশোনা শুরু হবে। কিন্তু আমার মনে একটুও খারাপ লাগছিলো না। কারণ, আমি এতো সুন্দর ভ্রমণ জীবনে আর কখনো করিনি। আর এটাই আমাকে আমার পড়াশোনায় সাহায্য করবে। তাই আমি মনে করি, সাজেকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ভালোই হয়েছিল।



ভালো থেকে বন্ধু

মাহামুদ জিলানী

কলেজ নম্বর : ১৫৩০১৬৭

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক (প্রভাতি)

রাফাতের মনটা খুব খারাপ। কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারছে না। খেলতেও ইচ্ছে করে না। কার্টুন দেখতেও ভালো লাগছে না। রিমোট হাতে নিয়ে শুধুই চ্যানেল বদলাচ্ছে। কখনো কখনো টিভি বন্ধ করে ড্রইং খাতা, রং পেনসিল নিয়ে বসছে। কোনো ছবি আঁকা হচ্ছে না। কী করবে, আবিরের বিষয়টি কারও সাথে শেয়ার করতে পারলে হয়তো বা ভালো লাগতো। মাকে বলবে নাকি বলবে না বুঝতে পারছে না। স্কুলের গতকালের ঘটনাটি ঘুরে ফিরে মাথার পুরোটাই জায়গা দখল করে আছে। এমন সময় মা ডাকলেন—

মা : রাফাত, এই রাফাত টেলিফোনের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? আমি রান্নাঘর থেকে শব্দ পাচ্ছি আর তুমি ফোনের কাছে থেকেও শব্দ পাচ্ছ না কেন?

রাফাত : (ফোন রিসিভ করে) হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কে? নিলয়, কেমন আছিস?

নিলয় : না রে ভালো লাগছে না কিছুই। কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না। তাই ভাবলাম তোকে ফোন করি।

রাফাত : ভালো করেছিস, আমার মনটাও খুব খারাপ লাগছিল, কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না।

নিলয় : আমারও একই অবস্থা।

রাফাত : আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

নিলয় : কী বুদ্ধি বলতো।

রাফাত : আমার ধারণা তুই আমি দু'জনে যদি কাজটি শুরু করি, আমাদের দেখে অন্যরাও এগিয়ে আসবে।

নিলয় : আচ্ছা আগে বলতো কী বুদ্ধি।

রাফাত : আমরা কাল থেকে দু'জনেই বেশি করে টিফিন নিব। আবিরের সাথে আমাদের খাবার শেয়ার করব। কাল থেকে আমাদের ক্লাসের বসার জায়গা চেইঞ্জ করে আবিরের কাছে বসবো।

নিলয় : ওয়াও! বন্ধু, কী সুন্দর মিলে গেলো তোর চিন্তার সাথে আমার ভাবনা। আমি ঠিক এমনটিই ভাবছিলাম। আর তোকে এই কথাগুলি বলবো বলেই এখন ফোন দিয়েছি।

রাফাত : ফাইন, ইস! বন্ধু তোর সাথে কথাগুলো শেয়ার করে মাথাটা হালকা লাগছে। একটা বিষয় ভাব, আমরা কাজটা করব ভেবেই এতটা ভালো লাগছে। যখন কাজটি করব তখন কতটা ভালো লাগবে।

নিলয় : হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে আমারও। এক কাজ করবি, তুই যদি আগে স্কুলে যাস, আবিরের বেঞ্চে বসবি। আর আমার জন্যও জায়গা রাখবি।

রাফাত : ওকে বন্ধু, এখন তাহলে রাখি। কাল স্কুলে দেখা হচ্ছে।

রাফাত, নিলয়, আবিব ওরা তিনজনই পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র, রাফাত ও নিলয়ের ঘনিষ্ঠতা একটু বেশি। কারণ ওরা দু'জনেই শিশুশ্রেণি থেকে একসঙ্গে পড়ছে। তাছাড়া রাফাত নিলয়ের মা'ও একই সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। ওদের দু'জনের পারিবারিক সম্পর্কটা পুরনো। রাফাত বেশ ক'দিন থেকেই লক্ষ করে আসছিল, আবিব খুব কম কথা বলে, কারও সঙ্গে খেলতে যায় না।

টিফিনের সময় তাড়াহুড়া করে পাঁচ মিনিটে টিফিন শেষ করে সবাই প্লে গ্রাইন্ডে চলে যায়। আবিব সেই সময়টায় ক্লাসে বসে থাকে। বিষয়টি রাফাত

খেয়াল করেছে বেশ ক’দিন। মনে হয়েছে হয়তো ওর খেতে দেরি হয়, যে কারণে খেলতে যেতে পারে না।

গতকাল খেলার মাঝখানে পানির বোতল নেয়ার জন্য ক্লাসে এসে রাফাত দেখতে পেল আবিরের সামনের টিফিন বক্স খোলা। প্রতিদিনের মত জেলি লাগানো দুই পিছ পাউরুটি। টিফিন বক্সটিতে তখনও হাত দেয়নি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রাফাতকে দেখে দ্রুত চোখের পানি মুছে ফেলার চেষ্টা করে। আবিরের কাছে এসে বসে পিঠে হাত রাখে রাফাত।

রাফাত : কি হয়েছে রে তোর? কাঁদছিস কেন তুই? টিফিন খাসনি কেন?

আবির : (মাথা নেড়ে বলে) কিছুই হয়নি।

রাফাত : অবশ্যই কিছু হয়েছে। আমি বেশ ক’দিন থেকে লক্ষ করেছে ইদানিং তুই ক্লাসের অন্য সবার মত নাই। মাঠে খেলতে যাস না। আমরা যখন খাই তখন তুই টিফিন বের করিস না। আজ আমাকে বল তোর কি হয়েছে। আমি তোর বন্ধু।

আবির উত্তর দেওয়ার আগেই নিলয় দৌড়ে ক্লাসে আসে। রাফাতের কেন দেরি হচ্ছে জানার জন্য ক্লাসে ঢুকে আবিরের চোখে পানি দেখে নিলয় তার পাশে বসে। আবির বলে এসব কথা ওদের সাথে শেয়ার করলে পরবর্তী সময় ওরা ঠাট্টা করবে। নিলয় ও রাফাত দু’জনই আবিরকে আশ্বস্ত করে, কথাগুলো তাদের তিনজনের মধ্যেই থাকবে। ওর ছোট বোনকে জন্ম দিতে গিয়ে ওর মা মারা যান। বাবা সকাল সাতটায় অফিসে চলে যায়। অফিসে যাওয়ার সময় প্রতিদিন বাবা দু’পিস পাউরুটি জেলি দিয়ে ওর ব্যাগে ভরে দেয়। লজ্জা করে বন্ধুদের সামনে টিফিন বক্স বের করে না। সবাই যখন মজার মজার ফাস্টফুড খায় তার গন্ধে ওর খুব খেতে ইচ্ছে হয়। ওই সময় ওর মায়ের কথা খুব মনে পড়ে। এ কারণে ও সবার সামনে টিফিন খায়না। সবাই যখন পরিষ্কার ও ইঞ্জি করা কাপড় পরে আসে ওর খুব মন খারাপ হয় কারণ তার একটা ই ড্রেস এবং সে সেইটা ছয় দিন পড়ে। এ কারণে আবির খেলতে যায় না।

আবির এই পুরো বিষয়টি শেয়ার করল।

রাফাত : আন্সু, কাল থেকে আমাকে এমনভাবে টিফিন দেবে যেন দু’জন করতে পারি।

মা : কেন বলতো?

রাফাত সব কথা মাকে বলে।

মা : অবশ্যই দেব। তুমি সবসময় আবিরের সঙ্গে টিফিন শেয়ার করে থাকবে।

পরদিন স্কুলে আবিরকে জোর করে ওদের সাথে টিফিন খাওয়ায় এবং খেলতে নিয়ে যায়। তারপর থেকে ওরা একসঙ্গে বসে এবং একসঙ্গে টিফিন খায়। এখন ওর অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। গত তিন-চারদিন নিলয় খুব চুপচাপ ক্লাসে বসে থাকছে, কথা বলছে না। অথচ বেশি কথা বলার জন্য প্রতি ক্লাসে স্যারদের কাছে বকা শুনে। ছুটির পর নিলয়ের বাবা মাকে দেখে আবির ও রাফাত ছুটে যায়। জিজ্ঞেস করে— খালামনি নিলয়ের কি কিছু হয়েছে? ও ক্লাসে খুব চুপচাপ থাকে? প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়—

নিলয়ের মা : কেন আবির? ও তোদের কিছু বলেনি?

রাফাত ও আবির : (একসঙ্গে বলে) নাতো!

নিলয়ের মা : তোমাদের আংকলের বদলি হয়েছে। আমরা চিটাগাং যাচ্ছি। আজ নিলয়ের টি.সি নিতে এসেছি।

রাফাত ও আবির দু’জনে কেউ কারো দিকে তাকাতে পারে না। ওদের চোখের কোল বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে নিলয়, ওদের কাছে আসছে না, কারণ ও তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রাফাত-আবির মনে মনে বলছে যেখানে থাকিস ভালো থাকিস বন্ধু, ভালো থাকিস।



মেঘের কাছাকাছি

মোঃ তালহা তানবীর

কলেজ নম্বর : ১৫৩০০৪৭

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক (প্রভাতি)

ক্লাস ফাইভে পড়তাম তখন। সময়টা ২০১৭ সাল। পি এস সি পরীক্ষার পর লম্বা ছুটি। এই লম্বা ছুটিতে কি ঘরে বসে থাকলে চলে? তাই ভাবলাম সময়টা কাজে লাগানো দরকার। তাই বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি যাওয়ার প্লান করা হলো। খুব মজা হবে সেটাই হলো শেষ পর্যন্ত। ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখ রাত ১০ টার দিকে বাসে উঠলাম আমরা। আমার পরিবার ও আমার কিছু বন্ধুরা যাচ্ছি। লম্বা পথ। মজাই হয়েছিলো। সকাল পেরিয়ে যখন দুপুর হলো তখন আমরা বান্দরবান পৌঁছলাম। সবাই খুব ক্লান্ত। আমরা ‘হোটেল হিল কুইন’ নামের একটি হোটেলে উঠলাম। আমরা বিশ্রাম নিয়ে নিলাম। তারপর আবার সবাই রেডি হলো। একটা রেস্টোরাইর গেলাম। নাম ‘স্টার হোটেল তাজিংডং’। যেই চেয়ারে পেয়েছে সেই তাড়াতাড়ি সেই চেয়ার বসে গিয়েছে। তারপর খাবারের অর্ডার দেয়া হলো। চিকেন, বিফ, সবজি, ডাল, কত না কিছু। কিন্তু সবাই কমন খাবার খেল যা আমরা ঢাকায় খেয়ে থাকি, কিন্তু সেই কমন খাবারের মধ্যেই অন্যরকম স্বাদ ছিলো। তারপর সবাই আমরা খাওয়া শেষ করে হোটেল তাজিংডং থেকে বের হয়ে গেলাম। তারপর কয়েকটা চান্দ্রের গাড়ি ভাড়া করা হলো। ঐ এলাকার একটি বিশেষ গাড়ি নাম হলো ‘চান্দ্রের গাড়ি’। সবাই গাড়িতে উঠলাম। বাহু কি ছুটছে গাড়ি, পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে, দারুণ লাগছে। গাড়ির গন্তব্য কিছুক্ষণের জন্য স্বর্ণ মন্দির। গাড়ি সেদিকেই চলছে। স্বর্ণ মন্দির এসে হাজির হলাম আমরা। তখন বিকেল ৩.৩০ বাজে। মন্দিরটা বৌদ্ধের ঐতিহ্য, অনেক সুন্দর। অনেক ছবি তুললাম আমরা সেখানে। জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মন্দিরের বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধদের বিভিন্ন মূর্তি ও প্রতীক দেখা যাচ্ছে। সেই মন্দির থেকে আমরা চললাম নীলাচলের পথে। এটা একটা জায়গার নাম। জায়গাটা খুব সুন্দর। তবে বেশ উঁচু। মাটি থেকে প্রায় কয়েকশ ফুট উঁচু। সেখানকার দৃশ্যটা সুন্দর ও মনোরম। প্রথম প্রথম এত উঁচু জায়গায় একটু ভয়ই লাগে। তবে মজাই বেশি লাগে। আস্তে আস্তে কখন সন্ধ্যা থেকে রাত হয়ে গেলো কেও তা খেয়াল করে নাই। রাত্রের দৃশ্যটা দেখতে আরও ভালো লাগে। জ্যোৎস্নামাখা চাঁদ, বাহু কি সুন্দর দৃশ্য! একটা ক্যাফেতে বসে চা, কফি, ফাস্টফুড খেলা। অনেকক্ষণ ধরে আনন্দের সাথে সময় কাটানো গেল। তারপর পাহাড়ি উঁচু নিচু বন্ধুর রাস্তা দিয়ে আমরা সবাই চললাম আমাদের হোটেলের পথে। রাতের বেলা আরো মজা হলো, কেননা আমরা ছোটরা খেলছি নিজেদের মতো, বড়রা তাদের মত আড্ডা দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আমরা কলাপাতা রেস্টোরাইর খাবার খেতে গেলাম, খাবারটা মজার ছিলো। দ্বিতীয় দিনে আমরা গেলাম মেঘলা, চিমুক পাহাড়ে ও আরো কিছু জায়গায়। চিমুক পাহাড়ে আগে গিয়েছিলাম। দুপুর বেলা চরম রোদ, তারপর বিকেলে একটু ঠাণ্ডা পরিবেশে আমরা গেলাম মেঘালয়। এটা একটা অন্যরকম সুন্দর জায়গা। জায়গাটা একটা বিশাল পার্কের মতো। সুন্দর সুন্দর গাছ, বাগান, ঘোরাফেরা ও বসার স্থান নিয়ে সুন্দর দৃশ্য বর্তমান। আরো আছে ঝুলন্ত ব্রিজ ও চিড়িয়াখানা ও বিভিন্ন খাবারের স্টল ও দোকান। পাশাপাশি বিভিন্ন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। সেখানে আমরা প্রায় সব জায়গাতেই গেলাম। সেখানকার ব্রিজগুলো দড়ির সাহায্যে ঝুলছে। সেখানকার চিড়িয়া খানায় আছে বিভিন্ন প্রাণী। যেমন : ভালুক, বন বিড়াল, খরগোশ, বিভিন্ন পাখি ও প্রাণী। পরদিন আমরা রাঙামাটির উদ্দেশ্যে রওনা হবো। আজ আমাদের ইচ্ছেমতো এই বান্দরবানকে উপভোগ করে নিতে হবে।

পরদিন কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে আমরা বাসে উঠলাম। রওনা হলো রাঙামাটির উদ্দেশ্যে। বাস রওনা হলো। আমরা দুপুরে পৌঁছলাম। একটা হোটেল রুম ভাড়া করা হলো। প্রথমে সবাই তাদের মত বিশ্রাম নেবে। তারপর বিকেলে বিভিন্ন রিসোর্টে যাব আমরা। বড় গাঙ্গ, বৌদ্ধ মন্দির ও পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াই। দিনটি ভালোই মজার ছিলো। রাতের বেলা পরের দিনের কথা চিন্তা করতে করতেই চলে গেল। কেননা কাল আমরা নদী পথে প্রায় ১০টি জায়গা ঘুরতে যাব। সত্যিই তাই। যে জায়গাগুলোতে গেলাম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সুবল বার্ণা, মারমেইড রিসোর্ট পেদাটিং টিং দ্বীপের ও আরো কিছু জায়গায়। মারমেইড রিসোর্ট হলো একটি রেস্টুরেন্ট। যারা নদীপথে এখানে ঘুরতে আসে, তারা এখানে খেতে আসে। রিসোর্টটা একটা দ্বীপের মত। চারপাশে পানি আমরা এখানে খেতে এসছিলাম। সবাই মজা করে খেয়েছিলো। তবে আরেকটা কথা, বেমু চিকেন হলো এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত খাবার। খুব মজাদার একটি খাবার। তারপর এই রিসোর্ট থেকে আমরা সুবলং বরণায় গেলাম। এটা কোন রিসোর্ট না। তবে এটা প্রাকৃতিক বার্ণা এখানে অনেকেই এর চমৎকার সৌন্দর্য দেখার জন্য আসে। আমরা গিয়েছিলাম বার্ণাটা দেখতে খুব সুন্দর। উপর থেকে পানি পড়ছে, আমার বাবা কীভাবে যেন একটা পথ খুঁজে পেলেন। সেই পথ দিয়ে বার্ণার পাশে যাওয়া যায়। আমি বাবার পিছু নিয়ে সেই দিয়ে বার্ণার চূড়ায় উঠলাম। উপর থেকে নিচের লোকজনকে দেখতে খুব ছোট লাগছে। আর একটু সামনে গেলেই আমরা বার্ণার উপর থেকে পড়ে যাব। নিচে সবারই মনে হচ্ছে বার্ণার পানিটা খুব পরিষ্কার কিন্তু পানিটা আসলে উপরে কোথাও কোনো নোংরা জায়গা থেকে আসছে। আমি আর বাবা নিচে নামলাম উপরে থাকাকালীন কেউ আমাদের ছবিও তুলছিল, কিন্তু ছবিটা ক্লিয়ার হয়নি। কিছুক্ষণ এখান থেকে আমরা আরও একটি বার্ণায় গেলাম। তারপর গেলাম পেদাটিং টিং রিসোর্টে ও রাঙামাটির বিখ্যাত ঝুলন্ত ব্রিজ। আসলে পুরো দিনটাই বিশাল অ্যাডভেঞ্চারে ভরা তবে সবচেয়ে বড় অ্যাডভেঞ্চার তো আগামীকাল। সেদিন রাতে ডিনার করার সময় আমরা জানলাম কাল আমরা বান্দরবনের নীলগিরি যাচ্ছি। জায়গাটা নাকি এত উচু যে জায়গাটা মেঘেরও উপরে। সেখানকার কথা শুনেই সেখানে যেতে ইচ্ছে করছে। পরদিন আমরা সেখানে গেলাম চরম উত্তেজনার সাথে। এক সেকেন্ডও দেরি না করে সকালে আমরা খিচুড়ি ও গরুর মাংস দিয়ে নাস্তা করলাম তাও আবার রাস্তাতেই। অনেকক্ষণ লাগল সেখানে যেতে। জায়গাটা দেখতে অনেক সুন্দর। সেখান থেকে পাহাড়ের কিনারে গিয়ে দেখছি মেঘ আর সাদা মেঘ। জায়গাটা অনেক উচু পাহাড়ের মতো। কিন্তু পাহাড় না, একটা রিসোর্ট। সেখানে ১০-১৫ জন মানুষ একসাথে আলাদাভাবে একা একা অনেক ছবি তুললাম। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অনেক মজা করলাম, প্রায় ৩০ মিনিট- ১ ঘণ্টা সেখানে ছিলাম। তারপর ২৫ তারিখ রাতে ঢাকায় চলে আসলাম কিন্তু চলে আসার চেয়ে বড় কথা হলো খুবই আনন্দময় ও মজার সফর ছিলো এটা। এই ভ্রমণ থেকে আমরা পেয়েছি আনন্দ ও পাশাপাশি পেয়েছি অনেক শিক্ষাও। ভ্রমণ যে মানব জীবনের কত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তা জানতে পারলাম। যখন মেঘের এত কাছাকাছি গিয়েছি তখন মনে হলো, জীবনটা খুবই সুন্দর। আহ! বেঁচে থাকাটা খুবই আনন্দের!



মেয়েটি নভোচারী হতে চেয়েছিল

তামজিম তাহজান একুশ

কলেজ নম্বর : ৮২১৮

শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ঘ (দিবা)

আজকে আবারও মনটা খারাপ হয়ে গেলো ইরা মিত্রের। আর নিতে পারছে না সে। প্রতিদিনের এই একই বাটকাটা একঘেয়েমি লাগছে প্রচণ্ড। ভার্সুয়াল কাপে চা খেতে খেতে মন খারাপের কারণ নিয়ে ভাবার চেষ্টা করল ইরা। সেই আদিম যুগের চা নিয়ে এখনো পড়ে আছে মেয়েটা। আর তার এই মন খারাপের কারণ হলো দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নকে নিয়ে প্রতিদিন নিজের মাথাটা কেটে ফেলতে ইচ্ছে করে তার ইলেক্ট্রোকাটার দিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ে যায় এই দুঃস্বপ্নের পেছনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নজালের কথা। আর এই ইলেক্ট্রোকাটারের মতো ভয়াবহ জিনিস ছেড়ে সে ধরতে চায় মহাকাশের পথ। পাড়ি দিতে চায় অসংখ্য নড়ি-নক্ষত্র। আর তাই তো ---- আচ্ছা থাক বরং আগে ইরার স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত হবার বিষয়টি একটু ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার।

বিষয়টা বুঝে নিতে চাইলে যেতে হবে আরও প্রায় দু'শো বছর পূর্বে। তখন ২০২০ সাল। এখনকার হিসেবে প্রায় আদিমযুগ। এসময় এ জায়গাটা বাংলাদেশ নামক একটি জায়গা ছিলো। পরে তো বিভিন্ন দেশের নেতা-নেত্রীগণ মিলে চুক্তি করার মাধ্যমে পৃথিবী একত্রীকরণ করেন। আর তখন মহাকাশের পথে পাড়ি জমাতে বিশাল সব সাফল্যের খবর প্রায়ই শোনা মতো। প্রথম প্রথম মানুষ অবাধ হলেও পরে একে স্বাভাবিকই ধরে নিয়ে ছিলো তারা। তবে তখন সহিংসতাও কম পরিমাণে হতো না। ছুরি-চাপাতি নামক কিছু জিনিস ছিলো তখন। মাঝখানে নিরাপত্তাবাহিনীর অসীম সাহসিকতার দরুণ সহিংসতার পরিমাণ অনেকখানি কমে যায়। মানুষ তখন থেকেই ধীরে ধীরে যন্ত্রে পরিণত হতে শুরু করে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহাকাশ স্টেশনের উপর ভয়ঙ্কর ও অকল্পনীয়ভাবে আছড়ে পড়ল ভারী কোনো অ্যাস্টারয়েডয়েস। মানুষের আজও বুঝতে হলে থমকে যেতে হচ্ছে কী ছিলো যেসব অ্যাস্টারয়েডয়েসের উৎস। খুবই বিবেচিতভাবে মহাকাশ স্টেশন গুলো আর কোনো ভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আজঅবধি কাজ চলছে এসব অ্যাস্ট্রোন বিকাল ইউনিটগুলোর উপর। তো তারপর থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মহাকাশের সাথে মানবকুলের সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা। আর ইরা এসব ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছে বই পড়ে। গাধাটা এখনো মলট উলটানো ই-বুকে বইয়ের সংস্করণ পড়ে বেড়ায়। অথচ এখন তো ডিআর-এ বই পড়াই পুরোনো মডেলের হয়ে গেছে তখন তো মাথায় মগজের বদলে জেনিয়াল গেটআপ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে অবশ্য যারা এটা করে তাদের গ্রেডের মান একটু উঁচু হয়। মূলত সেভেনস্ গ্রেডের আগে ক্রেনিয়াল গেটআপ করা যায় না। যাই হোক, ইরার এভাবেই ইচ্ছা জাগে মহাকাশের পথে পাড়ি জমানোর। মনে সেই বুড়ো বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের কথাটাকে যদি সত্য করতে পারতো সে, তবেও জীবনটা সার্থক হতো। অবশ্য জীবনটাই বা কয়েকদিনের। যতদিন আছি সেটাই বা কী কিছু হলো? মাথার ভেতর কী একটা জিনিস লাগিয়ে বসে থাকা। কাজ নেই কিছু নেই শুধু যন্ত্র হয়ে থাকা আয়ু বাড়ানোর সিমটোর খেয়ে ইরার যে বুড়ো দাদাটা ২৪৫ বছর বেঁচে ছিলেন, তার মুখে এসব শুনেছে ইরা। এখন তো ধর্মের কোনো পরিচিতিই নেই পৃথিবীতে। যেখানে আগে মানুষের জীবন-মৃত্যুর হিসাব ছিলো প্রভুর হাতে সেই হিসাব যেনো কেড়ে নিয়েছে যন্ত্রগুলো। মানুষ যেন আগের চাইতেও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। কোনো ছোটখাটো অপরাধ করলেই ক্রেনিয়াল বসিয়ে স্নায়ুগুলো রিফ্রেশ

করে দেয়। পুরনো স্মৃতি আর কিছুই মনে থাকে না। ইরার বন্ধু কারসর এর এই অবস্থা হবার পর তার মা সারাক্ষণ তার নাম নিয়ে আহাজারি করতেন। কিন্তু কারসর এর মুখে কোনো বিদ্বেষের চিহ্ন পড়তো না। আগে গাছ বলে কিছু প্রজাতি ছিলো এই মাটিতে। তার ১০০ বছর পরেই তো গাছ, মাটি সব অস্তিত্ববিহীন হয়ে গেছে। স্প্রেডার এখন সুনবির মতো সারা বিশ্বে অক্সিজেন সরবরাহ করছে। মাটি তো আজ মার্বেল বা গ্রাফাইটে তৈরি শক্ত এক প্রলেপ। এগুলো শুধু মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যন্ত্রা দিত আলাদা বর্ণনা। তাদের জগৎ আরেক ধরনের, অনেকটা অমানবীয় ব্যাপার যাকে জীবন বলা যায় না। এখন আর চিকিৎসা হয় না পৃথিবীতে। রোগ বলে কিছু নেই আর মানুষের মস্তিষ্ক, দেহে। এখন শ্বেত রক্তকণিকার চেয়ে শক্তিশালী কিছু ভর করে বসেছে। এরকম এন্টিবডিগুলো আমাদের শরীরকে রোগ থেকে মুক্ত রাখছে সর্বদা। ঘরবাড়ি গুলো নেই আগের মতো। তবু ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিশেষ সম্মতি চেয়ে অ্যাস্ট্রনটের আদলে বাড়ি তৈরি করেছে ইরা। আর এই বাড়িতে বসেই ইরা চিন্তা করে কবে সে ওপার মহাকাশ ছুঁতে পারবে। কবে রকেটের টুকরো টুকরো ছুঁয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তুপগুলো আবার ফিরে পাবে নতুন প্রাণ।

শেষকথা

এসব চিন্তা করতে করতেই আচমকা শব্দ শুনে চমকে উঠে ইরা। এইমাত্র চাঁটা খাওয়া শেষ করলো সে। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি রাত হয়ে যাবে এটা ভাবতেও পারেনি সে। এসব কিছু বুঝে উঠার আগেই আন্তে আন্তে মস্তিষ্কের সিউরণগুলো মুছে যেতে শুরু করলো। তার মানে মেইনরাম থেকে বিদ্যুতের সকেট বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু এরকমটাতো হয় শুধুমাত্র যন্ত্রের ক্ষেত্রে। সে তো এখনো মানুষ হিসেবে বেঁচে আছে। তাহলে তার সাথে কেন এমন হচ্ছে?

হায় রে জীবন!!! কখন যে এতোসব যন্ত্রের ভিড়ে থেকে থেকে নিজেই যন্ত্রের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে নিজে জানে না। যাই হোক, হঠাৎ নিত্যদিনের স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ে যায় ইরার। যদি স্বামী-সন্তান বিসর্জন দিয়ে ভুলেও একবার আকাশে উড়ে যেতে পারতো। তবে হয়তো এই জেলে পুরে থাকা জীবনটা সার্থক, মুক্ত। হয়তো তা হবে না কখনো হয়তো এটা স্বপ্নেই রয়ে যাবে।

কিংবা দুঃস্বপ্ন হয়ে প্রতিরাতে দেখাও দিতে পারে.....।



আমি রেসিডেনসিয়ালের নবজাগরণের কথা বলছি

কাজী সাচী শিপন

কলেজ নম্বর : ৮১৫১

শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ঘ (দিবা)

মানুষ! জীবন! এ শব্দ দুটির গভীরতা আর বিশালতা দুটোই অনেক। কারণ অসংখ্য মানুষ, তাদের ভিন্ন চিন্তা আর তার ভিন্ন ফলাফল। আর সেই ভিন্ন ফলাফলের ভিন্ন প্রভাব। আর এ সবকিছুর মাধ্যমে উৎসারিত হয় জ্ঞান। মানুষ চিন্তা করতে পারে এটা তার শক্তি। আর এই শক্তির মাধ্যমেই সমাজ জাগ্রত হয়। এই শক্তিকে তুলনা করা যেতে পারে দাবানলের সাথে আবার তুলনা করা যেতে পারে দিয়াশলাইয়ের আগুনের সাথে। সমাজের নবজাগরণ হলো দাবানল যার উৎপত্তি দিয়াশলাইয়ের আগুনের মতো ব্যক্তির চিন্তা দিয়ে। নবজাগরণের প্রয়োজন সমাজের জন্য। আগামীর মানুষের জন্য,

নবজাগরণ হলো একত্রে সজীব হয়ে উঠা। একটা দেশে বা সমাজে তখন নবজাগরণ ঘটে যখন সমাজের সকল ব্যক্তি তার আগুনের বিষয়ে অসম্ভব মেধা দিয়ে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। এমন হয়েছিল ইউরোপ, বাংলায়, বাগদাদ, মিশর গ্রীসের এবং আরো অনেক খানেই, তাদের আলোকময় ইতিহাস আমাদের প্রায় সবারই জানা। ইউরোপের দান্তে, লিওনার্দো, শেক্সপিয়ার, বেকন আরো অনেকে বাংলার রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বাগদাদের ইমাম গাজ্জালী, ফারাবী, খালদুন, খোয়ারেজমি। মিশরের গ্রীসের আরো অনেকে, কিন্তু এত ইতিহাস ঘটার পর আমি স্বপ্ন দেখি আমার বিদ্যালয়ের নবজাগরণ নিয়ে, একদিন রেসিডেনসিয়ালের প্রতিটি ছাত্র করবে এক একটি দিগন্তের সূচনা, যে লিখতে চায় সে লিখে ফেলবে বনফুল বা অক্ষর ওয়াইল্ডের মতো গল্প। আবার যে ক্রিকেটার হতে চায় সে হয়তো বা ক্রিকেট খেলার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করবে। আমাদের এই ছোট স্কুলে নবজাগরণের উদ্ভাবন করতে হলে দরকার ছাত্রের ইচ্ছা আর শিক্ষকের অংশগ্রহণ। আমাদের স্কুলের সব ছাত্রের মধ্যে আছে উদ্দীপনা যা ভিত্তি জাগরণের। আমাদেরকে বিচার করতে হবে প্রতিটি ছাত্রের স্বতন্ত্রতা। সবারই অবশ্যই কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা চিন্তা রয়েছে। আমাদের সেই স্বতন্ত্রতার মধ্যে ঢেলে দিতে হবে জ্ঞান। আরো উজ্জ্বল করতে হবে ইচ্ছাকে। প্রতিটি ছাত্র মনের জায়গায় অবাধ স্বাধীনতা পেলে তাদের কাজ মানুষের মধ্যে বিস্ময় জাগাবে। যদি আমরা তাদেরকে সুযোগ দেই গ্রন্থাগারের অবাধ স্বাধীনতা, বই আর মাঠ ব্যবহারের স্বাধীনতা, তাহলে এখান থেকে আসতে সাহিত্যিক কিংবা ফুটবলার, ছাত্রদের শিক্ষক যত বিস্ময়, মূল্যবোধের কথা বলবে তত তারা আগ্রহ বা আনন্দের খোঁজ পাবে। ছাত্রদের বিস্ময়বোধকে গুরুত্ব দিতে হবে, স্বীকার করতে হবে তাদের কিছু বিশৃঙ্খলা। আমাদের কলেজে প্রতিযোগিতা অনেক হয়। সেখানে অংশগ্রহণ করে তারা যারা সে বিষয়ে চূড়ান্ত পারদর্শী, আর কিছু মানুষ এগুলোকে গুরুত্ব দেয় না। আবার কেউ চাইলেও যেতে পারেনা। আবার কারো ইচ্ছা থাকলেও দক্ষতা নেই। তাই আমাদের উচিত ছাত্রের জন্য বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, গান ইত্যাদির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এখানে প্রতিযোগিতায় আবার ঠিক করে দেওয়া হয় প্রতিযোগির সংখ্যা, কখনো অনুষ্ঠানে আসনসংকট অথবা বিশৃঙ্খল পরিবেশের জন্য যাতায়াত নিষিদ্ধ হয়। সমাজ বা শিল্পকলার বিষয়ের অনুষ্ঠানের না আছে তেমন অংশগ্রহণ আবার তেমন কোনো দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা। সহশিক্ষা কার্যক্রম বিজ্ঞান বিষয়ে থাকলেও সমাজ বা শিল্পকলা বিষয়ে নেই। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে বৃহৎ স্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশের সুন্দর নিদর্শন এখানকার আলো, বাতাস, গাছ, পানি সকলই প্রকৃতি আর ছাত্রের মিলনমেলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রকৃতির শিক্ষার কথা বলেছেন, তা এখানে বাস্তবায়ন সম্ভব, এখানকার ছাত্রের মনের উদারতা চিন্তার বিশালতার কারণ এর নৈসর্গিক পরিবেশ। তাই আমি স্বপ্ন দেখি, রেসিডেনসিয়ালের নবজাগরণের, যেখানে এর প্রতিটি ছাত্র হবে অনেক বিষয়ের বুদ্ধিজীবী, প্রতিটি ছাত্র হবে তার ভালো লাগা আর আগ্রহের প্রবক্তা।





ভূত

সাদমান সুবা

কলেজ নম্বর : ১৫৩৮৪

শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : খ (প্রভাতি)



মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ভ্রমণ

আল নাহিয়ান ফাহিম

কলেজ নম্বর : ১৪৫৮২

শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

প্রাইভেট থেকে বাড়ি ফিরছে রায়হান ও রিশাদ। রায়হান তার ব্যাগ থেকে এক টুকরা কাগজ বের করল।

তা দেখে রিশাদ বলল, “এইটা আবার কী?”

“একটা নম্বর। এটাতেই ফোন করলে নাকি.....”

“ফোন করলে আবার কি হবে?”

“ভূত আসবে” গভীর মুখে বলল রায়হান।

“বাহ! আর মজা করার জায়গা পাইস না?”

“কী আমি মিথ্যা বলছি? তুই কল করে দেখ যদি না আসে আমার নাম রায়হান না।”

“আচ্ছা যদি না আসে তা হলে তোর নাম কালা রায়হান।”

“আচ্ছা রাখিস।”

হাসতে হাসতে কাগজটি হাতে নিল রিশাদ। কাগজটি নিয়ে হোস্টেলে ঢুকল রিশাদ। হোস্টেল ২ তলা, লালচে ইট দিয়ে তৈরি। দেখতে কেমন জানি ভূতুড়ে বাড়ির মতো। যাই হোক বিকাল থেকে গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তার রুমটি দোতলার শেষ প্রান্তে। পড়া শেষ করতে ১১.৩০ বেজে গেল। তখন গভীর রাত। সবাই ঘুমাচ্ছিল আর সে তার মোবাইল ফোনে ভূত এফ এম শুনছিল। তারপর সে কখন ঘুমিয়ে গেল সে নিজেও বুঝতে পারল না। সে ঠিক রাত ২ টায় ঘুম থেকে জেগে উঠল। সে দেখল তার পেটের ওপর এক টুকরা কাগজ। কাগজটি খুলে সে একটি নম্বর আবিষ্কার করল। তাই নম্বরটি ফোনে তুলে কল করল সে। প্রথমে কেটে গেল। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হলো। হাসতে হাসতে বলল, “ভূত বুঝি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। হা হা হা” এভাবে তৃতীয়বার চেষ্টায় সে “৯৯৯৯৯৯৯৯” আওয়াজ শুনতে পেল। সাথে সাথে ফোনটিও অফ হয়ে গেল। রিশাদ চমকে গেল। প্রচণ্ড ভয়ে সে বিছানায় কন্ড দিয়ে মাথা ঢেকে শুয়ে পড়ল। তারপর সে জোরে জোরে বাতাসের শব্দ শুনতে পেল। সাথে শুনতে পেল কুকুরের যেউ যেউ শব্দ। যেন শব্দটি তার রুমের ঠিক পেছন থেকে আসছে। তারপরেই ‘৯৯৯৯৯৯’ শব্দ আসতে লাগল। তারপর তার দরজা ঠক ঠক শব্দ করতে লাগল। রিশাদ বলল, ‘কে, কে ওখানে?’ হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল সে দেখল কালো রঙের একটি ছায়ামূর্তি ও তার পেছনে একটি কুকুর যেউ যেউ করছে। আস্তে আস্তে ৯৯৯৯৯৯ শব্দটি বেড়ে গেল। ছায়ামূর্তিটি তার সামনে চলে এলো। রিশাদ ভয়ে তার চোখ বন্ধ করে ফেলল। কিছু বোঝার আগে কুকুরটি কামড় বসালো তার পায়ে। সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল। সে আবিষ্কার করল তার কামড়ানো পা থেকে পুরো শরীর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পরদিন স্কুলে যাওয়ার সময় রায়হান রিশাদের রুমে ঢুকে দেখল সে রুমে নেই। তবে তার জামা কাপড় বিছানার ওপর পড়ে আছে, রুমের মেঝেতে কুকুরের পায়ের ছাপ। দেয়ালের ওপর রক্ত দিয়ে বড় বড় করে কী যেন লেখা দেখতে পেল সে। কাছে গিয়ে দেখল সেখানে রক্ত দিয়ে লেখা ভূতু ও নিচে একটি কুকুরের পায়ের ছাপ। তাই দেরি না করে বিছানায় থাকা নম্বরটি পুড়িয়ে দিল সে।

তখন আমি ক্লাস খ্রি-তে পড়ি। স্কুল থেকে ১৫ দিনের ছুটি নিলাম। তখনই আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ হয়েছিল। আমার আব্বু টাইগার এয়ারলাইন্সের টিকিট কেটে নিল। আমরা ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুর হয়ে মালয়েশিয়া যাই। সিঙ্গাপুরে গিয়ে ৫ ঘণ্টা থাকতে হবে। এখানে ৫ ঘণ্টা থাকার পর আবার প্লেনে উঠলাম। এরপর ১ ঘণ্টায় মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর পৌঁছলাম। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সিতে করে হোটেলে যাই। এরপর আবার বের হলাম এবং মেট্রোরেল চড়লাম। রেলওয়ে স্টেশনে মেশিনের মতো যন্ত্র থেকে টিকিট কিনে নিলাম। তখন একটা কাণ্ড ঘটে গেল! গেট দিয়ে একবারই যাওয়া যায়। মহাবামেলায় পড়লাম। আব্বু, আম্মু ও আপু সব গেটের ওপারে চলে গেল। আব্বু পুলিশ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আবার টিকিট কাটতে বললেন। তখন এক ভদ্রমহিলা এসেছে, তাঁর সাথে করে তাড়াতাড়ি গেট পার হলাম। এরপর ট্রেনে বা মেট্রোরেল করে গেলাম। সেখানে একশর উপরের তলায় উঠে দেখি, সব ছোট ছোট লাগছে এবং পুরো শহরটা দেখা যাচ্ছে। এরপর ঘোরাঘুরি করে পরের দিন মালয়েশিয়ার জাতীয় মসজিদে গেলাম। সেখানে পানির বড় বড় ফোয়ারা দেখলাম। সেখান থেকে রিস্কিত দিয়ে শাশলিক কিনলাম। তবে তা আমাদের বাংলাদেশের মতো মজার নয়। সেখানকার মুদ্রার নাম রিস্কিত। বাসে করে- গ্যানটিং হাইল্যান্ডস-এ গেলাম। এরপর Cable Car-এ করে বড় বড় পাহাড়ে উঠলাম। আমরা দেখি যে, মেঘের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। মেঘ কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। তখনই প্রথম আমি মেঘকে এতো কাছ থেকে নিজ চোখে দেখলাম! আবার সেখানে দেখি পাহাড় কেটে বিস্তৃত তৈরি করা হচ্ছে। মেট্রোরেল করে বাস স্টেশনে গিয়ে টিকিট কিনে নেই। সেখানে আরও একটা জিনিস দেখলাম যে, মেট্রোরেল মাটির নিচে কখনো রাস্তার উপরের ব্রিজে। মজার ব্যাপার সেখানে কোনো ড্রাইভার নেই। অনেক ঘোরাঘুরির পর ফেরার পালা। সেখান থেকে রওনা দিয়ে আমরা বাসে উঠে যাই। বাসের সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখি যে এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর কথা না, সেখানে পৌঁছে গেছি। এরপর দ্রুত টেক্সি ভাড়া করে নির্দিষ্ট এয়ারপোর্টে যাই। তখন ফ্লাইটের আর মাত্র ৩০ মিনিট বাকি! আব্বু ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলে ড্রাইভার বলে যে ট্রাফিক জ্যাম না থাকলে ২৫ মিনিট লাগবে। ভাগ্যিস রাস্তা ফাঁকা ছিল। সময়মত ফ্লাইটও পাই। এরপর সেখান থেকে সিঙ্গাপুর যাই। সিঙ্গাপুর সিটিতে পৌঁছে Mustata Market এর সামনের একটা হোটেলে থাকি। ওখানে আবার মালয়েশিয়ার থেকে বেশি বাঙালি দেখি। আমরা প্রথমেই সিঙ্গাপুর Flyer-এ উঠলাম। সেখানে উঠে পুরো শহরটা দেখলাম। এরপর আমরা Sentosa দেখতে গেলাম। সেটি দেখতে এমন যে এর মাথা সিংহের মতো এবং বাকি নিচের অংশ মাছের মতো। এরপর ঠিক এমনি দেখতে আরেকটি জিনিস দেখলাম। সেটির নাম Merilion। এর মুখ থেকে পানি বের হয়। এটিও Sentosa এর মতো। খালি এর সাইজ ছোট। এখানে চারিদিকে মহাসাগরের পানি আছে। কারণ সিঙ্গাপুর হচ্ছে একটি দ্বীপ। সেখানের অনেক জায়গায় জলীয় বাষ্পের মাধ্যমে শো দেখানো হচ্ছে সেটি দেখে মনে হয় যে মুন্ডির পর্দার বদলে জলীয়-বাষ্প ব্যবহার করা হয়েছে। এই ১৫ দিনের ভ্রমণের পর অবশেষে বাংলাদেশে ফিরে আসি।



অজানা রহস্য

মুমিনুল হক আবেশ

কলেজ নম্বর ৮৬৯৭

শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : গ (দিবা)

সাইফ এখন মহাবিরক্ত। আর কতক্ষণ তাকে ধৈর্য ধরতে হবে তা সে জানে না। অবশ্য এখন সে অনেকটাই এ ব্যাপারটিকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছে। সাইফ একজন নাইটগার্ড ও কেয়ারটেকার এবং সে এক সরকারি মর্গের কাজে নিযুক্ত। প্রতিদিনের মতো সেদিনও সে তার নির্ধারিত কাজ শেষ করে যখন চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় নাজমুস, তার মর্গের সুপারভাইজার তাকে বলে,

- আরো কিছুক্ষণ থাকোন লাগবো।
- ভাই ক্যামনে সম্ভব? রাত এখন ১২টা বাজে।
- কী করব? ডোম তো এখনও আসে নাই।
- ভাই, আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মাফ করেন।
- আজকের মতো থাইকা যাও।

অবশেষে একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, আরো কিছুক্ষণ তাকে থাকতে হবে। সরকারি ডোমের কোন ঠিক ঠিকানা নেই, যে কোন সময়ই আসতে পারে, তা রাত ৮টাও হতে পারে আবার ৩টা-৪টাও হতে পারে। তাই এখন সে অপেক্ষায় আছে। রাত তখন ১১টা বাজে। এমন সময় বিদ্যুৎও চলে যায়। চারিদিকে নিস্তব্ধ নীরবতা। এমন সময় সে দেখে যে, দূর থেকে একটি ভ্যান আসছে। কাছে আসতেই সে দেখে যে, এতে দুটি বস্তা আছে। এক বলক দেখেই সে বুঝে ফেলে এতে দুটো লাশ আছে। ভ্যানচালক একটি বালক। নাম তার রিজভী। রিজভী বলে, 'ভাই দুইডা লাশ আনছি। তাড়াতাড়ি এগুলো ভিতরে ঢুকিয়ে রাখেন।' সাইফ তাই করল। তখন রিজভী বলল, 'ভাই এখন তো অনেক রাত। আমরা একটু আগায়ে দিবার পারলে ভালো হইত।'।

সাইফ ভাবলো এ অন্ধকারে থাকার চেয়ে তার সাথে যাওয়াই ভালো। অগত্যা সে তাই করল। তো যেতে যেতে সে সিগারেট ধরায় এবং রিজভীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল, কারণ রিজভী তার পরিচিত এবং গ্রামেরই ছেলে। তবে রিজভী নিশ্চুপ। সব প্রশ্নেরই উত্তর হুঁ, না, হ্যাঁ তেই সীমাবদ্ধ। তবে পুরো কথোপকথনে সে শুধু এটিই বলল, 'সিগারেট খায়েন না, আগুনটা ভাল্লাগতাকে না'। সে কিছুটা অবাকই হলো এ কথা শুনে। এমন সময় সে দেখে যে, রিজভীর বাড়ি হতে আর দু মিনিটের পথে হাঁটা দূরত্ব বাকি তাই সে বলল, 'আচ্ছা তুই চইলা যা, আমি রওনা দিলাম, আল্লাহ হাফেজ।'।

কথাটির স্বর ছিল যেন গভীরতা ও করুণভাবে মাঝামাঝিতে এবং এটি খানিক খটকা দেয় তাকে এবং পিছনে ফিরতেই সে দেখে রিজভী তার বাড়ির সামনে এবং সে অবাক হয় যে, ২ মিনিটের পথ এত দ্রুত সে কীভাবে গেল! প্রশ্ন প্রশ্নই রয়ে গেল। এবার ফেরার পথে সে এক মাঝবয়সী মহিলাকে রাস্তায় কাঁদতে দেখে। সে ভাবে এই গভীর রাতে ইনি এখানে কী করেন? কাছে যেতেই মহিলাটি যেন আরো বিমর্ষ হয়ে গেল। কারণ জিজ্ঞাসার্থে তিনি বলেন, "আজকে সকালে আমার ছোট বোইনটা হারিয়ে গেছে, তারে আর খুঁজি পাইতাইনা।" রিজভী যখন লাশ দুটি আনে তখন সে বলেছিল, এর মধ্যে একটি লাশ এক তরুণী বা মেয়ের। তাই সাইফ বলে, 'আল্লাহ মাফ করুক, মর্গে দুটো লাশ আসছে। আপনি কি একটু যাবেন আমার সাথে, যদি সেখানে কিছু দেখতে পান? এ শুনে যেন মহিলার কান্নার তীব্রতা বেড়ে যায়।

তবুও তাকে বুঝিয়ে নিয়ে যায় সাইফ। তবে ঘূটঘূটে অন্ধকার এর চাদরে চারিদিক ঢেকে গেছে এবং এজন্য সে মহিলাটিকে লাশ দেখাতে পারেনি। তাই মহিলা যখন না দেখে চলে যাচ্ছিল তখন সে বলে গেল যে, "লাশটা যদি কারো স্বপ্নরবাড়ি থেকে নিতে আসে তবে দয়া করে দিয়োন না, এটা আমার অনুরোধ রইল।"

এটি বলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মহিলা হাঁটা ধরলেন। এমন সময় বিদ্যুৎ এলো। সাইফ তাই পিছনে ডাক দিতে গিয়ে দেখে যে, মহিলা যেন নিমেষেই উধাও হয়ে গেল। এ সোজা রাস্তায় চাঁদের আলোতে মহিলা যতদূরই থাকনা কেন দেখতে পারার কথা। এমন সময় রাত ২টায় ডোম এলো। কিছুটা মাতাল অবস্থায়। ফ্রিজার থেকে লাশ বের করতে বলল। সে ফ্রিজার থেকে লাশ দুটোর বস্তার চাটাই এনে টেবিলে রাখল এবং প্রথম বস্তাটি খুলার সাথে সাথে যেন তার কলিজা পানি হয়ে গেল এবং রক্ত শুকিয়ে গেল। সে আত্ননাদ করে বলল, 'ওরে আল্লাহ, রে...।' বাকি কথাটুকু সে বলতে পারেনি কারণ এ লাশটি আর কারো নয় বরং রিজভীর! মাঝ বরাবর দুখতে বিভক্ত। বিস্ফোরিত চোখে সে ২য় চাটাই খুলেও অর্ধমৃতের মতো হয়ে গেলো প্রায়। এ লাশটিও সে মহিলার। তার ১২ বছরের কর্মজীবনে এমন বীভৎস লাশ কখনো সে দেখেনি। সে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে গেল। পরদিন ময়নাতদন্তের পর লাশ দুটিকে সে নিজ হাতে দাফনের ব্যবস্থা করে দেয়। তবে এ ঘটনার যেন কোন ব্যাখ্যা নেই এবং এটি তার জীবনে এক অজানা, অপ্রাত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত রহস্য হিসেবেই রয়ে গেল, যার উত্তর সে আজও খুঁজে বেড়ায়।



অ্যান্টনি লিউয়েন হুক

রুবাইয়াত বিন হায়দার

কলেজ নম্বর : ৭৪০৮

শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : গ (দিবা)

লিউয়েন হুক অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আমাদের চারপাশে লুকিয়ে থাকা জীবানু তার চোখেই প্রথম ধরা পড়ে। ১৬৩২ সালে হল্যান্ডের ডেলফট শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সন্ত্রাস্ত অথচ গরিব পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাতে লিউয়েন হুক কথা বলতে পারতেন না। ছেলেবেলায় লিউয়েন হুক চশমার দোকানে কাজ করতেন। সে সময় দেখেছিলেন কী করে কাঁচ ঘষে ঘষে পাওয়ারওয়াল কাঁচ বানাতে হয়। টাকার জন্য তিনি একসময় ঝাড়ুদারের চাকরি নেন। সারাদিন কাজ করার পর লিউয়েন হুক অবসর সময়ে পাওয়ারওয়াল কাঁচ বানিয়ে ফেলেন। এভাবে কাঁচ বানাতে বানাতে এক বিস্ময়কর কাণ্ড করে ফেলেছিলেন। একটি লম্বা সিলিন্ডারের দুই প্রান্তে কাঁচ লাগিয়ে দেখতে পান সবকিছু দারুন বড় দেখাচ্ছে। আসলে এটিই ছিল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রথম ধাপ। চোখে দেখা যায় না এমন অনেক কিছুই সেখানে দেখা যাচ্ছে। এ ঘটনার পর লিউয়েন হুক দেখতে পান মাছির পা, ব্যাঙাচির লেজ, মাথার উকুন। এসব দেখে তিনি অবাক হয়ে বলেন, "অপূর্ব! আমাদের চারপাশে কত কিছু লুকিয়ে আছে।

প্রতিবেশীরা তাঁর এ কাণ্ড দেখে মুখ টিপে হাসে। কিন্তু তাঁর মেয়ের উৎসাহে তিনি তাঁর অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে থাকেন ক্ষুদ্রে প্রাণীদের জীবনযাত্রা। একদিন বৃষ্টির পানি পরীক্ষা করে তিনি লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে দেখতে

পেয়েছিলেন। তাঁর মেয়ে এই খবর জেনে বাবাকে রয়েল সোসাইটিতে চিঠি লিখতে বলল। রয়েল সোসাইটি এমন একটা প্রতিষ্ঠান, যেখানে বিজ্ঞানীদের তাঁদের আবিষ্কারের জন্য স্বীকৃতি দেয়া হত। কিন্তু হুক তো ইংরেজি ভাষা জানতেন না। তাই এক ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে রয়েল সোসাইটিতে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানালেন। সেজন্য তাঁরাও বিস্তারিত জানতে চেয়ে হকের কাছে চিঠি পাঠালেন। লিউয়েন হুক এবার পুরোদমে গবেষণায় লেগে যান। আবর্জনা, মলমূত্র সব বিষয়ের উপর তিনি গবেষণা করেন। তারপর তিনি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখে ফেলেন। শুধু তাই নয়, ২৬টি অনুবীক্ষণ যন্ত্র আর কয়েকটি আতশ কাঁচ পাঠিয়ে দেন।

রয়েল সোসাইটির বিজ্ঞানীরা হকের অনুবীক্ষণ যন্ত্র পরীক্ষা করে অভিভূত হয়ে যান। অবশেষে ১৬৭৭ সালে ১৫ নভেম্বর রুপোর বাস্তুর ভেতর মানপত্র পাঠিয়ে বিজ্ঞানী আন্টনি লিউয়েন হুককে সম্মান জানানো হয়। ১৬৮০ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করেন। লিউয়েন হুক কখনো দেশের বাইরে যাননি। কিন্তু একটানা ৫০ বছর তিনি রয়েল সোসাইটির সঙ্গে ছিলেন। চিরস্মরণীয় এ বিজ্ঞানী ১৭১৩ সালের ৩০ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। অ্যান্টনি লিউয়েন হুক দেখিয়েছেন প্রকৃতিতে কীভাবে অনুজীব ঘোরাফেরা করে। দারিদ্র্য, কষ্ট, অর্থাভাব কিছুই তাঁকে জীবনে সাফল্যের পথে পিছনে ফেলতে পারেনি।



মমি তৈরির প্রক্রিয়া

রুবাইয়াত বিন হায়দার

কলেজ নম্বর ৭৪০৮

শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : গ (দিবা)

প্রাচীন মিসরীয়রা বিশ্বাস করতেন যে, দেহ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে মৃত ব্যক্তির আত্মাও নষ্ট হয়ে যায়। তাই তাদের ধারণা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির দেহকে পাঁচনমুক্ত রাখতে কোনো এক বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন পড়ে। এই চিন্তা থেকে প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে প্রাচীন মিসরীয়রা মমি তৈরির প্রণালি আবিষ্কার করে। মিসরীয়রা বিশ্বাস করত যে মৃত ব্যক্তিকে মমিফিকেশন করে রাখলে সে আবার জন্ম নেবে।

মমি তৈরির জন্য মৃতদেহের ভেতরের সবকিছু বের করে ফেলা হত। অদ্ভুত কায়দায় শরীর থেকে পাকস্থলি, কিডনী, মস্তিষ্ক বের করে ফেলা হত। একটি বিশেষ হুকারের সাহায্যে নাক দিয়ে মস্তিষ্কে বের করে ফেলা হত। এরপর সেই ফাঁপা দেহকে ৪০দিন পর্যন্ত ন্যাট্রনে রেখে দিত। ন্যাট্রিন হচ্ছে সোডিয়াম ও কার্বনের মিশ্রণ। এজন্য দেহের অবশিষ্ট সকল পানি বের হয়ে যেত। মিসরীয়রা এভাবেই একটি মৃতদেহকে শুকিয়ে ফেলে বিশেষ বিশেষ গাছপালা ও রজনে ভেজানো তুলো দিয়ে ফাঁপা দেহটিকে পূর্ণ করত। এখন ব্যাল্ডেজ দিয়ে দেহটিকে পেচানো হলো। একটি বিশেষ ধরনের কাপড়কে মোমে চুবিয়ে সেই ব্যাল্ডেজ তৈরি করা হয়। তারপর মমি বিশেষজ্ঞগণ দেহটিকে সেই ব্যাল্ডেজে মুড়ে ফেলে মমি তৈরি করতেন। মমি তৈরি করা হয়ে গেলে তা পবিত্র কফিনের মধ্যে রাখা হয়। পবিত্র কফিনকে ‘ম্যাক্রোফ্যাগাস’ বলা হতো।



মা

তানজীন বিন আইয়ুব

কলেজ নম্বর : ৮৭৪৮

শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

৩০ এপ্রিল ২০১৮। কমলাপুর রেলস্টেশনে বসে বসে ট্রেনের অপেক্ষা করছি। সাথে বাবা আছেন। ভর দুপুর। দিনের অন্যসময় রেলস্টেশনে যে ভিড় থাকে দুপুরের সময় এত থাকে না। তাই চারপাশটা তুলনামূলক নিরিবিলা। কাজ নেই তাই বসে বসে গল্পের বই পড়ছি। বাবা বললেন, তার নাকি মাথা ধরেছে, তাই তিনি কফি খেতে উঠে গেলেন। একা বসে আছি, এমন সময় কোথা থেকে একটি ছেলে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার দিকে দৌড়ে এসে একটি ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিল। কাগজটি নেয়ার আগে সে আমার উদ্দেশ্যে বলল, “আমার আন্মু আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। অনেক দিন আন্মুর সাথে দেখা হয় না। তোমার সাথে যদি আমার আন্মুর দেখা হয়, তাহলে তাকে চিঠিটা দিয়ে দিও। তার কথাগুলো শুনে ও তার কাছ থেকে কাগজটি পেয়ে আমি হতভম্ব হলাম। আরো অবাক হলাম যখন সে আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে এক দৌড়ে রেললাইন পার হয়ে অন্য প্লাটফর্মে চলে গেল।

কিছুক্ষণের জন্য ছেলেটিকে আমার মানসিক ভারসাম্যহীন মনে হলেও তার কথা বলার ধরণ দেখে চিন্তাটি আমার মাথা থেকে বের হয়ে গেল। যেই চিঠিটি খুলে পড়তে যাব, তখন বাবা এসে বললেন, আমাদের ট্রেন নাকি প্লাটফর্মে এসে গেছে তাই তাড়াতাড়ি যেতে হবে। সেজন্য তাড়াহুড়ো করে চিঠিটি ভাঁজ করে আমার পকেটে রাখলাম। তারপর ব্যাগ নিয়ে দ্রুত ট্রেনে উঠলাম।

ট্রেন ছেড়েছে অনেকক্ষণ। সূর্য অনেকটা পশ্চিমদিকে হলে পড়েছে। চিঠির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় পকেট থেকে চিঠিটা বের করে ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করলাম।

চিঠি

প্রিয় মা,

কেমন আছ তুমি? মা তোমার সাথে দেখা হয় না অনেকদিন। তোমার চেহারাটা প্রায় ভুলেই যাচ্ছি। সেই যে তুমি গেলে আর তো আসলে না। বাবাকে যখন জিজ্ঞাসা করি তুমি কোথায়, বাবা আকাশের একটি তারা দেখিয়ে বলে তুমিই সেই তারাটা। আমি যখন মন খারাপ করতাম তখন বাবা বলত তুমি একদিন না একদিন সেখান থেকে ফিরে আসবে। কিন্তু এখনো কেন ফিরে এলে এলে না মা?

মা জানো, তুমি যাওয়ার কয়েকদিন পর আমার নতুন মা এসেছে। উনি তোমার থেকে অনেক আলাদা। এই দেখো, তোমাকে তুমি করে বলছি কিন্তু নতুন মাকে আপনি করে বলতে হয়। বাবা একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে, তুমি ভালো, না নতুন মা ভালো? আমি বাবাকে উল্টো প্রশ্ন করলাম “কে ভালো, যে সত্য বলে, না যে মিথ্যা বলে?” বাবা উত্তরে বললেন, “অবশ্যই সত্যবাদী ভালো।” সাথে সাথে আমি উত্তরে বললাম, “আমার নতুন মা-ই ভালো।” বাবা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? উত্তরে আমি বললাম, “আমার আগের মা মিথ্যা কথা বলতেন। তিনি যদি আমাকে খেতে না দেওয়ার কথা বলতেন কিছুক্ষণ পর দেখা যেত তিনি নিজেই আমাকে খাইয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু নতুন মা যদি একবার বলেন খেতে দেবেন না, তাহলে কোনোভাবেই খেতে দেন না।”

জানো মা, আমি এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছি। এখন আমি নিজের কাপড় নিজে ধুই। তাইতো মা আমার প্রমোশন হয়েছে, এখন আমার পুরো বাড়ির কাপড় ধুতে হয়। সারাদিন কাজ করতে হয়, কোনো ফুরসত পাই না। সারাদিন কাজ করে শরীরটা অনেক ক্লান্ত লাগে তবুও রাতে ঘুমাইনা। জানো মা কেন? কারণ রাতে তোমার মতো কেউ আর আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় না। তখন আমি ছাদে বসে বসে তোমার তারাটা দেখি।

মা আমি আর পারছি না, এখন আমার ছুটির প্রয়োজন। তুমি এসে আমাকে ছুটিতে নিয়ে যাও মা। তাড়াতাড়ি এসো মা।

ইতি

তোমার আদরের রিদম

চিঠিটি পড়তে পড়তে আমার চোখ থেকে পানি বেরিয়ে এলো। আমি নিরবে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। আমি নিজেকে সেই ছেলেটির জায়গায় বসিয়ে জীবনটাকে উপলব্ধি করলাম। নাহ্ আমার জীবনটা অনেক ভালো। সৃষ্টিকর্তার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ আমি।

চিঠিটা এখনো আমার কাছে আছে। যখনই আমার নিজের জীবনের প্রতি অভিমানে হয় তখনই চিঠিটা দেখি আর ভাবি আমার চেয়েও আরো কষ্ট আছে ছেলেটি।



রহস্যময় কাহিনি : পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর গুহা

বি. এন. তারনীন সাদনান

কলেজ নম্বর : ৬৮৮৪

শ্রেণি : নবম, শাখা : চ (দিবা)

পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর গুহা জর্জিয়ার ড্রুবেরা। মাটির নিচে সবচেয়ে গভীর প্রান্তে পৌঁছানোর স্বপ্ন পূরণের আশায় সাহসী অভিযাত্রীদের বেশিরভাগই তাই মাটির সবচেয়ে নিচের বিন্দুতে নামার আশায় পৌঁছে যান জর্জিয়ার আনখাজিয়ায়। এখানকার অ্যারাবিকা নামক পাহাড়ের দুর্গম অংশেই রয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে গভীর গুহা যার নাম ড্রুবেরা।

অন্য অনেক জায়গার তুলনায় ড্রুবেরা গুহায় অভিযাত্রীদের আনাগোনা খানিকটা কমই। এর একটা কারণ হচ্ছে বছরে মাত্র চার মাস এখানে যাওয়া যায়, বাকি সময় একেবারেই নাগালের বাইরে থাকে। তা সত্ত্বেও নিজের বিশালতা আর সৌন্দর্য দিয়ে তাক লাগানো ড্রুবেরা কেভ বরাবরই দুঃসাহসী অভিযাত্রী আর গুহা নিয়ে কাজ করা বিজ্ঞানীদের আকর্ষণ করে আসছে। প্রথমবার গুহায় অভিযানের সাহস দেখান জর্জিয়ার একদল বিজ্ঞানী ১৯৬০ সালে। দুর্গমতা আর সাজ সরঞ্জামের অভাবের কারণে ৯৫ মিটার গভীর পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায় তাঁদের অভিযান। ১৯৬৮ সালে এ গুহা নিয়ে নতুন করে গবেষণার জন্য আরো একদল অভিযাত্রী পাঠানো হয় যারা খুব বেশি গভীরে পৌঁছাতে পারেননি।

ড্রুবেরা পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর গুহার খেতাব পায় ২০০১ সালে। তখন ইউক্রেনের একদল অভিযাত্রী গুহার ভেতরে ১৭১০ মিটার পর্যন্ত নামতে পারেন। শেষ সীমানা পর্যন্ত যেতে ইউক্রেনের পুরো দলের লেগেছে বেশ কয়েক বছর। ডুব সাতারু জেনাডি সামোখি গুহার ভেতর পার করেন ২১৯১ মিটার। ২০১২ সালে তিনি তার রেকর্ড ভেঙে অতিক্রম করে যান ২১৯৭ মিটার পর্যন্ত। এখন পর্যন্ত ড্রুবেরাই বিশ্বের একমাত্র গুহা যার গভীরতা ২০০০ মিটারেরও বেশি।

১৬ হাজার মিটারেরও বেশি লম্বা এই গুহাটির আরেক নাম ভোরানিয়া কেভ। রাশিয়ান ভাষায় যার মানে কাকের গুহা। ১৯৮০ সালের দিকে কিয়োভ অভিযাত্রীরা গুহা মুখে অসংখ্য কাকের বসতি দেখে এ নামটা রাখেন। গুহা মুখটা এর গভীরতার তুলনায় বেশ খানিকটা ছোটই। ভেতরে রয়েছে খাড়া কুয়োর মতো দেয়াল, কোথাও খুব সরু আবার কোথাও টানেলের মতো প্রশস্ত। ২০০ মিটার ভেতরে আবার দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ১৩০০ মিটার গভীরে রয়েছে এমনি আর দুটি বাঁক। ১৫০০ মিটার গভীরে এ গুহার ভেতর রয়েছে হিমশীতল পানির এক বরণ।

প্রথম দিকে যখন অভিযাত্রীরা গুহার ভেতরে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এর ভেতরের পানি ভর্তি সুড়ঙ্গগুলো। এসব সুড়ঙ্গ পার হওয়ার জন্য অভিযাত্রীদের ডুব সাঁতারের সব রকম সরঞ্জাম পরেই ঢুকতে হতো। একটু গাফিলতি হলে আর রক্ষে ছিল না। পানি ভর্তি সবচেয়ে গভীর সুড়ঙ্গটির গভীরতা ৬২ মিটারের কাছাকাছি। পৃথিবীতে চমকে দেওয়ার মতো এমন অসংখ্য জায়গা রয়েছে।



রাঙা সকাল

মোঃ জিহাদুল ইসলাম

কলেজ নম্বর : ১০৪৯৭

শ্রেণি : নবম, শাখা : গ (দিবা)

আকাশের এখন আর কষ্ট নেই। কারণ তার প্রত্যাশিত দিন আর বেশি দূরে নয়। সবার মুখে হাসি, সবার মুখে সেই খুশি। সবার আকাজক্ষিত সকাল আর দূরে নেই। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত। আকাশ মনে করতে লাগলো আগের সেই দিনগুলো, মায়ের বকুনি, নীরার ভালোবাসা, কলেজের লেকচার। ক্যাম্পের সবার মুখেই হাসি হাসি ভাব। সব অল্পবয়স্ক ছেলেরা বিজয়ের গান ধরেছে। নয় মাস পরে তারা তাদের এই প্রত্যাশিত দিনটি দেখতে পাচ্ছে। আকাশের বয়স কুড়ির মতো হবে। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেদিন ২৫ শে মার্চ ভাগ্যের জোরে সে বেঁচে গেছে। তবে সবাই জানে সে মারা গেছে। কারণ, সেদিনের পর থেকে সে আর বাড়ি ফেরেনি। আকাশের কাছে হঠাৎ নামহীন একটি চিঠি এলো। এরকম নাম পরিচয়হীন চিঠি আকাশের কাছে নতুন কিছু নয়। কেননা নীরা মাঝে মাঝেই আকাশকে চমকে দেওয়ার জন্য এমন নামহীন চিঠি পাঠাত। আকাশ চিঠির কথামতো তার ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে কাশবনে গেল। আকাশ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী, তার এই সাহসের তুলনা নেই। সে একাই অনেক অপারেশনের দায়িত্ব নিয়েছে এবং সফলও হয়েছে। আকাশ কাশবনে পৌঁছে গিয়েছে। চারদিকে হাওয়া বইছে। আকাশ কিছু বুঝে উঠার আগেই হঠাৎ তার মাথায় কে যেন জোরে আঘাত করল। সে আঘাতে আকাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আকাশের দেহটিকে বুলেটে বাঁধার করে দেওয়া হলো। আকাশের রক্তে পুরো কাশবন লাল হয়ে গেছে। আকাশের এই রক্তে বাংলার মাটি রাঙা হয়েছে। আকাশের ভাগ্য এতটাই খারাপ যে, তার প্রত্যাশিত রাঙা সকাল এতদিন যুদ্ধ করেছে, নয় মাস লড়াই করেছে সেই দিনটি সে আর দেখতে পারেনি। তার রাঙা সকাল আর দেখা হলো না।



কাউন্ট ড্রাকুলা

মির্জা মাহমুদুর রহমান

কলেজ নম্বর : ১০৪৩৯

শ্রেণি : নবম, শাখা : ঘ (দিবা)

কার্ল ল্যাঙ্কার্স শহরে আজকাল ছড়িয়ে পড়ছে আতঙ্ক। শহরের অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। লোকজন শুকিয়ে যাচ্ছে, ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে তাদের মুখ। শরীরের সব সজীবতা যেন হারিয়ে গেছে। এসব বিষয় ক'দিন ধরে ভাবাচ্ছে ড. জেনাসকে। ড. জেনাস এই শহরের নামকরা একজন ডাক্তার। তিনি অনেক মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সবারই রক্তস্বল্পতা বাদে কিছুই ধরা পড়ছে না। কিন্তু হঠাৎ তাদের সবার একসাথে রক্তস্বল্পতা কীভাবে হলো? এসব ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছেন ড. জেনাস। গাড়িতে বসে তার আরও একটা কথা মাথায় আসছিল। সেটা হচ্ছে অসুস্থদের মধ্যে প্রায় সবারই ঘাড়ের ঠিক পেছনটায় হালকা কামড়ের দাগ। কারও দাগ গাঢ় আবার কারও দাগ হালকা। তিনি গাড়িতে বসে এর চেয়ে বেশি আর কিছুই ভাবার সুযোগ পেলেন না, তার আগেই তার ড্রাইভার তাকে নিয়ে বাড়ি এসেছে বলে জানান। তারপর তিনি গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকলেন। বাড়িতে ঢুকে তিনি সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি প্রথমে ফ্রেশ হয়ে নিলেন, তারপর খাবার টেবিলে খেতে বসলেন। তার বাড়িতে তিনি ও তার দশ বছরের একমাত্র ছেলে শার্ল জেনাস থাকেন। তার স্ত্রী ছয় বছর আগে মারা গিয়েছিল। তারপর আর তিনি বিয়ে করেননি। এত বড় বাড়িতে তিনি তার ছোট ছেলেকে নিয়েই থাকেন। অবশ্য তিনি থাকেনইবা কতক্ষণ, কাজের জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাসপাতালেই তাকে থাকতে হয়। বাড়িতে একজন মেইড রয়েছে, তবে তিনি তার মতোই সারাদিন থাকেন।

রাতের খাবারের সময় জেনাস তার ছেলে শার্লকে ভালো করে লক্ষ্য করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তার ছেলে শুকিয়ে যাচ্ছে। নাদুসনুদস ছেলেটা এত তাড়তাড়ি কেন শুকিয়ে যেত লাগল, ভাবতে লাগলেন তিনি। অবশেষে কিছু বুঝতে না পেরে তিনি শার্লকে প্রশ্ন করলেন, 'খাওয়া দাওয়া কি ঠিকমতো করিস না?' উত্তরে শার্ল বলল, 'বাবা, আমার আর কোন কিছু ভালো লাগেনা। সব সময় কেমন যেন অস্থির লাগে। মনেহয় আমি এ জগতের কেউ না।' ড.জেনাস খানিকটা চিন্তিত হয়ে বললেন, 'তাহলে তুই আমাকে এতদিন কিছু জানাসনি কেন?' শার্ল বলল, 'বাবা আমার আর এখন কারও সাথে কথা বলতে ভালো লাগে না। একা একা থাকতে ইচ্ছা করে।' কিছুক্ষণ থেমে শার্ল আবার বলল, 'বাবা আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি খাও, আমি ঘুমাতে যাচ্ছি। আমার খুব ঘুম পেয়েছে।' শার্লের কথাবার্তা জেনাসের কাছে ভালো ঠেকল না। জেনাসের চিন্তা হতে লাগল।

খাওয়া শেষে রাত সাড়ে দশটায় ড. জেনাস তার বিছানায় শুয়ে শার্লের কথা ভাবছিলেন। ঠিক এমন সময় তিনি শার্লের ঘর থেকে অদ্ভুত এক আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না আওয়াজটা কীসের। তাই তিনি শার্লের ঘরে চলে গেলেন। ঘরে বাতি জ্বালাতেই দেখলেন জানালা দিয়ে বাইরে কালা কিছু দৌড়ে চলে গেল। জেনাস জানালার কাছে ছুটে গেলেন। কিন্তু বাইরে অন্ধকার বাদে আর কিছুই তার চোখে পড়ছিল না। তারপর তিনি শার্লের কাছে যেতেই বুঝতে পারলেন শার্ল মারা গেছে। শার্লের শরীর



ঠাঞ্জা হতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন শার্লের গলায় বেশ গাঢ় করে দুই দাঁতের কামড়ের দাগ। জায়গাটি একদম স্পষ্ট হয়ে আছে। ড. জেনাস সারারাত কান্না করলেন। সকাল বেলা পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে তিনি শার্লের কবর দিয়ে আসলেন। শার্লের মৃত্যু সংবাদ প্রতিটি শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। আর ছড়িয়ে পড়বারই কথা, এত বড় ডাক্তারের একমাত্র পুত্র মারা গিয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা জেনাস বাড়িতে আপন মনে বসে কাঁদছিলেন। ঠিক তখনই তার কান্নায় ছেদ পড়ল কলিং বেলের শব্দে। দরজা খুলতেই তিনি দেখলেন লম্বামতো ফর্সা ওভার কোট, মাথায় এক কালো ওয়েস্টার্ন হ্যাট। লোকটি জেনাসকে জানাল সে পাশের শহরে যাবে। রাত হচ্ছে বলে জেনাসের বাড়িতে রাতটা থাকতে চান। জেনাস লোকটাকে ভালো মনে করে থাকতে দিতে রাজি হলেন। কিন্তু লোকটার নাম জেনাসের কাছে বেশ অদ্ভুত লাগল। তার নাম কাউন্ট ড্রাকুলা। জেনাসের মনের অবস্থা ভালো নেই বলে তিনি বিষয়টা অত মাথায় নিলেন না। রাতের খাবারের সময় কাউন্ট কিছু খাচ্ছে না দেখে জেনাস কিছু বলতে যাবে ঠিক এমন সময় কাউন্ট এক অপ্রস্তুত এবং অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলো। তিনি বেশ ভারি গলায় বললেন, 'আপনার ছেলে কেমন আছে?' একথা শুনে জেনাস বেশ অবাক হলেন। তিনি বললেন, 'আপনি কীভাবে জানলেন আমার ছেলে আছে? অবশ্য আছেই বা কোথায়?' কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, 'গতকাল রাতে পিশাচ এসে মেরে ফেলেছে আমার ছেলেটাকে।' কাউন্ট চুপ করে থাকল, তারপর আবার জেনাস বললেন, 'দেখতে পারিনি, তবে ওটার দাঁত অনেক বড়। মানুষের মত মোটেও নয়। শহরের মানুষও ওটার জন্য অসুস্থ হচ্ছে।' ঠিক তখনই কাউন্ট জেনাসকে থামিয়ে দিয়ে মুচকি হাসি দিলে তার হাসির সাথে তার মুখে থাকা বড় বড় দুটো দাঁত ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল। এ দেখে জেনাস প্রচণ্ড শিউরে উঠলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কে তুমি?' উত্তরে খালি কাউন্ট মুচকি হাসি দিল। আর তার সাথে তাল মেলাতে বাইরের সব কুকুরেরা একসাথে চিৎকার করতে লাগল।



নিশাচর

আবরার জাওয়াদ

কলেজ নম্বর ১৩১১৩

শ্রেণি : নবম, শাখা : ঙ (দিবা)

তখন পৌষের শেষ বিকেল। পথে খড়ের বোঝা মাথায় দু-একটা লোক চোখে পড়ছিল। ঘর-বাড়ি ও দূরে দূরে। পুরো অঞ্চলটাকে কেমন পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছিল। দেখে মনে হলো বহুদিন আগে হয়তো এখানে লোকজনের আনাগোনা ছিল, বসতি ছিল, হয়তো কোনো কারণে জায়গা এখন বিরান হয়ে গেছে।

আমি এবং আমার বন্ধু অনিক যাচ্ছিলাম শ্যামনগরে। পথের বেহাল অবস্থা দেখে, সঙ্গে জিপ থাকায় মনে মনে খুশি হলাম। দুই বন্ধু মিলে গল্প করতে করতে বেশ খোশমেজাজেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু তখনই ঘটল বিপত্তি। আমাদের জিপটা ঘৎ ঘৎ ঘোয়াং শব্দ করে থেমে গেল। গাড়ি থেকে নেমে পরীক্ষা করে দেখলাম ইঞ্জিনটা নষ্ট হয়ে গেছে আর আশেপাশে কোনো ওয়ার্কশপ বা তেলের পাম্পও দেখলাম না। এদিকে সূর্যও যেন আমাদের অবস্থা দেখে দ্রুত অস্ত যেতে শুরু করেছে। অনিক বলল, 'এখন কি করবো?' আমি বললাম, 'আপাতত জিপটা এখানে থাকুক। চারপাশে একটু সাহায্যের খোঁজ করে আসি।' তখন অগত্যা দুজনে মিলে কিছুদূর হাঁটাচালা করেও মানুষের কোনো চিহ্ন খুঁজে পেলাম না।' হঠাৎ অনিক বলে উঠল, 'এ এলাকার নাকি বদনাম আছে। রাতে নাকি এখানে থাকা যায়না।' আমি বললাম, 'কেন? কাছাকাছি সুন্দরবন থাকায়?' সে বলল, 'তা তো আছেই। কিন্তু আরো একটি জিনিসের ভয় আছে।' আমি বললাম, 'কী?' সে উত্তর দিতে গেল। তখনই দূরের এক টিলার উপর কাউকে বসে থাকতে দেখলাম আমরা। দুজনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তার কাছে দৌড়ে গেলাম। দেখলাম এক ভদ্র মহিলা বসে আছে। তার মাথায় কালো কাপড় দিয়ে ঘোমটা দেয়া আমি বললাম, 'এই যে শুনুন, দয়া করে আমাদের একটু সাহায্য করবেন? আমাদের জিপটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর আমরা এই জঙ্গলে আটকা পড়েছি। দয়া করে আমাদের একটু সাহায্য করবেন?' ভদ্রমহিলা গমগমে কণ্ঠ বলে উঠলেন, 'না।' যেন কথাটা বলার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। এরপর আমি আর অনিক মিলে অনেক অনুরোধ করলে শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হলেন। বললেন, 'তবে বাড়িতে আমি একা থাকি।' এই কথা বলে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফেরালেন। দেখলাম তার মুখের অর্ধেকটা বিশ্রীভাবে ঝলসে গিয়েছে আর তার ডান চোখটাও খুবলানো। অনিক বলে উঠল, 'কোনো সমস্যা নেই। আমরা একা থাকত পারবো। আমাদের সঙ্গে খাবারও আছে। তা জিপ থেকে আনতে হবে।' তিনি বললেন, 'যাও।' আমি গিয়ে জিপ থেকে খাবারের বস্তাটা নিলাম। আর কী মনে করে যেন ফ্লু ড্রাইভারটাও পকেটে গুঁজে নিলাম। তখনো জানতাম না কী ভয়ঙ্কর এক রাত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

খাবার নিয়ে আমরা দুই বন্ধু মিলে ভদ্রমহিলার সাথে উনার বাড়িতে গেলাম। দেখলাম বাড়িটা পুরানো আমলের রাজপ্রাসাদের মতো। কিছু কিছু জায়গায় পোড়া জায়গা রয়েছে। তিনি আমাদের নিয়ে বাড়ি প্রবেশ করলেন। বাথরুম এবং দুজনের জন্য দুটো রুম দেখিয়ে বললেন, "রুম থেকে প্রয়োজন



ব্যতীত বের হবে না।" কথাটা কেমন সাবধান করার মতো শোনাল। এছাড়া বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে জানালায় একটি আবছা দেহের অবয়ব আমি দেখতে পেয়েছিলাম। দৃষ্টিবিভ্রম মনে করে মনের দুশ্চিন্তাগুলো আমি উড়িয়ে দিই। মহিলার কথামতো আমরা বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে নিজ নিজ রুমে গিয়ে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। বিছানাটার কিছু অংশে পোড়া দাগ দেখা যাচ্ছিল। তবুও আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝরাতে ঘুম ভাঙল পাশের ঘরের আর্তনাদ ও ধস্তাধস্তির শব্দে। মনে হলো কোনো মানুষ মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে। বন্ধুর কথা মনে পড়তেই আমি বিছানা থেকে নেমে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে পাশের ঘরের সামনে গিয়ে দরজার নব ঘুরিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে এক বীভৎস দৃশ্য দেখলাম। কালো রঙের আলখেল্লা পরা এক লোক আমার বন্ধুর নিখর দেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার শব্দ শুনে আমার দিকে ফিরে তাকাল। দেখলাম তার গাল বেয়ে রক্তের ফোটা গড়িয়ে পড়ছে। সে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তার চোখে এক ধরনের ভয়ানক তৃষ্ণা আমি দেখতে পেলাম। ভয়ে আমার পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। দৌড়াতে পারলেও আমার মস্তিষ্ক তাতে সাড়া দিল না। সে যখন আমার সামনে এসে আমার গলা টিপে ধরল তখন আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। হঠাৎ কোথা থেকে যেন ঐ ভদ্রমহিলা চলে এলেন এবং আমাকে ঐ পিশাচের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চাইলেন। কিন্তু পিশাচটি তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। তখনই আমার মাথায় বুদ্ধিটা এলো আর আমি আমার পকেট হতে ফ্লু ড্রাইভারটি তার চোখে গুঁজে দিলাম। সাথে সাথে যন্ত্রনায় কাতর হয়ে পিশাচটি জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল আর আমি পরক্ষণেই এক বাদুড়কে উড়ে যেতে দেখলাম। এরপর আমি কিছুটা শান্ত হয়ে বন্ধুর কাছে গেলাম। কিছুক্ষণ পর বন্ধুর শরীরটা কেঁপে উঠল আর সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। আমি তাকে বললাম, 'বড় বাঁচা বেঁচেছি।' সে রহস্যময় গমগমে কণ্ঠ বলে উঠল, 'না, এখনো না।' বলেই সে আমার দিকে বীভৎস আকৃতির দাঁত বের করে ফিরে তাকাল। আমি তার চোখে একই রকম তৃষ্ণা দেখতে পেলাম। পরক্ষণেই সে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ল আর আমি আমার গলায় ধারালো কিছু র স্পর্শ অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক যন্ত্রনায় আমার শরীর কেঁপে উঠল। এরপর আমি দেখলাম শুধুই অন্ধকার.....।



এটাই হয়ত 'মনুষ্যত্ব'

মোঃ নাফিজ ইকবাল

কলেজ নম্বর : ১১১২১

শ্রেণি : নবম, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

গাଁটা ছিল আমাদেরই এক বন্ধুর। অনেক হাসি আর আড্ডাতেই কাটছিল দিনগুলো। কিন্তু সবার সব দিন তো আর একরকম যায় না। কোনো না কোনোদিন সুখের দিন হয়ে যায় বেদনার। আমাদের সাথেও ঠিক এরকম ঘটল। হঠাৎ করে আমরা একদিন জানতে পারলাম যে আমাদের বন্ধু শোভন আমাদের ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। আমরা শুনলাম যে, শোভন ঢাকার কোথাও থেকে লেখাপড়া করবে। কথাটি আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সবাইকে মেনে নিতে হলো। শোভন ছিল ওর বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। শোভনের বাবার চাকরির কারণে ওর বাবা ও মা ঢাকা যেতে পারবে না। শোভন ঢাকায় একাই থাকবে। হয়তো বা কোনো মেসে। অনেক কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমরা শোভনকে এই ভেবে বিদায় দিলাম যে, “ওর সাথে তো আমাদের মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ হবে আর বিভিন্ন ছুটিতে দেখাও হবে।” এ ভাবেই সে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল একা একা। শোভন চলে যাওয়ার পর মোবাইলে ওর সাথে প্রতিনিয়তই কথা হতো। এভাবেই কাটছিল আমাদের দিনগুলো। দিন যেতে যেতে হঠাৎ করে চলে এল ঈদুল-আযহা। আমরা তো ঈদের জন্য খুশি, তার চেয়েও বেশি খুশি এই ভেবে যে, শোভন বাড়ি আসবে। একদিন আমরা সবাই মিলে গেলাম স্টেশনে শোভনকে নিয়ে আসতে। স্টেশনে অপেক্ষা করতে করতে চলে এল শোভনের ট্রেন। আমরা সবাই অনেক আত্মহের সাথে চেয়ে রইলাম ট্রেনের দরজার দিকে। হঠাৎ দেখলাম যে শোভন নামছে কিন্তু একা নয়, ওর সাথে আরো একটা ছেলে আছে। আমরা ছেলেটিকে দেখে একটু বিস্মিত হলাম। তাই শোভনকে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করেই বললাম যে ছেলেটি কে? উত্তরে শোভন যা বলল, তা পুরোটাই অবিশ্বাসের। শোভন বলল যে, ছেলেটা ওর ভাই। কথাটি শুনে আমরা খুব অবাক হলাম এবং নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আমরা শোভনকে বললাম, ‘তোর তো কোনো ভাই নেই! তাহলে এটা কে?’ শোভন আবারও একই উত্তর দিল। তখন আমরা শোভনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ‘এটা কীভাবে সম্ভব?’ শোভন আমাদেরকে ঘটনাটি বলল:

দিনটি ছিল শুক্রবার। যদিও শহরটি ঢাকা তবুও রাস্তায় ছিল না মানুষ। শোভন অনেক খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটি মেসে ফাঁকা একটি ঘর পেল। ঐ ঘরটিতে শোভনই প্রথম উঠেছিল। পরে জিসান ও বিজয় নামের আরও দুটি ছেলে ওঠে ঐ ঘরে। কিছুদিনের মধ্যেই শোভন ও বিজয়ের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। কিন্তু জিসানের সাথে তেমন সম্পর্ক হলো না। কারণ জিসান ছিল খুব চুপচাপ, লেখাপড়া প্রিয় আর শান্ত। তাই শোভন ও বিজয় মিলে জিসানকে খুব বিরক্ত করত। বিশেষ করে শোভন ওকে বেশি বিরক্ত করত। জিসান যখন পড়তে বসত, ওরা জিসানকে পড়তে দিত না। যখন ওরা সবাই খেতে বসত তখন জিসানের প্লেট থেকে কেউ মাছ নিত, আবার কেউ তরকারি নিয়ে নিত। শোভন ও বিজয় সবসময় জিসানকে দিয়ে রুম পরিষ্কার করাত। কিন্তু এত সবকিছুর পরেও জিসান ওদেরকে কিছু না বলে বলে চুপচাপ সব সহ্য করে নিত। আর এভাবেই কাটছিল তাদের

দিনগুলো। দিন যেতে যেতে চলে এল ঈদ। সবাই ঈদে বাড়ি যাবে ভেবে খুব খুশি। খুশি ছিলনা সেদিন মাত্র এক জন। আর সে হলো জিসান। সবাই তাদের নিজ নিজ বাড়ি যাওয়ার জন্য টিকিট বুক করেছিল। কিন্তু জিসান কোন টিকিট বুক করল না। তাই শোভন জিসানকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে জিসান বলল যে, বাড়ি গেলে হয়ত ওর পড়ার ক্ষতি হবে। শোভনও এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দিল না। দিন যেতে যেতে চলেই এলো সবার বাড়ি যাওয়ার দিন। সবাই একে একে বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছে। তখন মেসে আছে শুধু চারজন - শোভন, বিজয়, জিসান, আর তার মেসের দারোয়ান। বিজয়ও চলে গেল। বাকি রইল আর তিনজন। শোভন ও ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে পড়ল। বের হয়ে তার দেখা হলো দারোয়ানের সাথে। ও দারোয়ানকে বিদায় দিল এবং তার কাছে জানতে চাইল যে, উনি কবে যাবেন। উত্তরে দারোয়ান বলল যে, সে বাড়ি যাবে না। আর তার কারণ হলো মেসে এখনও জিসান আছে। জিসান না গেলে সেও যেতে পারবে না। কথাগুলো শুনে জিসানের উপর শোভন সব দোষ দিল। ঠিক তখনই দারোয়ান শোভনকে যা বলল, তা আসলে অকল্পনীয়। দারোয়ান শোভনকে বলল, ‘শোন বাবা, তোমার ধারণা ভুল। তুমি জিসানের ব্যাপারে কিছুই জানো না। কিন্তু আমি জানি। জিসান একটা এতিম ছেলে। এই পৃথিবীতে তার আপন বলে কেউই নেই। এমনকি থাকার মতো কোন জায়গাও নেই যেখানে গিয়ে সে ঈদ করবে। আর তাই সে ঈদের দিনও মেসে থাকবে।’ কথাগুলো শোনার পর শোভন যেন বোবা হয়ে গেল। আর মনে মনে ভাবল একটা এতিম ছেলের উপর তারা কতই না অত্যাচার করেছে। এসব ভাবতে ভাবতে শোভন দারোয়ানকে কিছুই না বলে সেখান থেকে চলে গেল। ভাবতে ভাবতে শোভন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। শোভন তার মাকে সব ঘটনা বলল এবং ঘটনা শুনে শোভনের মা জিসানের সাথে কথা বলতে চাইল। তাই শোভন আবার মেসে গেল আর তার মোবাইলটি জিসানকে দিয়ে বলল, ‘কথা বল।’ জিসান শোভনের কাছ থেকে ফোনটি নিল এবং কথা বলল। ফোনে শোভনের মা জিসানকে বললেন, ‘শোন বাবা জিসান, এতদিন যা হয়েছে তুমি সব ভুলে যাও। আজ থেকে তোমার নতুন জীবন শুরু হবে। আজ থেকে আমি তোমার মা, আর শোভন তোমার বড় ভাই। তাই আর দেরি না করে তুমি আজই শোভনের সাথে তোমার নতুন বাড়িতে চলে এসো।’ কথাগুলো শুনে জিসান শোভনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল এবং দুজনে এক সাথে বাড়ি এল। আর এভাবেই একটা এতিম ছেলে পেল নতুন একটা পরিবার। ঘটনাটি শোনার পর আমরা দেখলাম যে আমাদের চোখেও পানি। পরে আমরা সবাই চোখের পানি মুছে জিসান ও শোভনকে নিয়ে ওদের বাড়িতে গেলাম।





অপূর্ণতা

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

কলেজ নম্বর : ১৬৩৩২

শ্রেণি : নবম, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

আকাশের মাঝে ভোরের সূর্যটা লুকোচুরি খেলছে। সবুজ ঘাসগুলোর মাঝে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে শুয়ে আছে শীতের সকালের শিশিরগুলো। সেই শিশিরের বিন্দুগুলো একটু একটু করে ঘাসের গা বেয়ে নিচে পড়ছে। ঝরা পাতার সেই মাধবীলতা গাছটার ডালে বসে কাঁপছে চড়ুই পাখি দুটো। এরই ফাঁকে শীতের সকালের লেপমুড়ি দেওয়ার মায়া ত্যাগ করে উঠে পড়েছে রহমানের মা। রহমানের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করার জন্য তাকে যে প্রতিনিয়ত কাজে যেতেই হবে। এই ভোরের শীতকে ভয় করলে যে তার চলবে না। গ্রামের ঐ নদীটার তীরে, তালপাতার ছাউনি দিয়ে ঘেরা এক ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে বাস করে রহমান এবং তার মা রহিমা। তিন বছর বয়সে বাবাকে হারায় রহমান। তখন থেকেই সে তার মায়ের কাছেই বড় হয়েছে। তার মা-ই হলো তার বাবা। আজ রহমান উচ্চ মাধ্যমিকের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এতটা বছর রহিমা নিজে খেয়ে না খেয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করে রহমানের পড়ার খরচ জুগিয়েছে। কখনো সকালে খেয়েছে তো সারাদিন না খেয়ে থেকেছে। কখনো আবার সকালের খাবারটাও জোটেনি। কোনো কোনো দিন আবার তার মনিব খাবার না দিলে, রহিমা তার ছেলের খাবারটাও তার সামনে তুলে দিতে পারতো না। কিন্তু এতকিছুর পরেও রহিমা একটা কাজ করতে কখনো ভুলে যেত না। সেটা হলো রহমানকে পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া। রহমানও ছিল খুবই মা-দরদি একটা ছেলে। তার মাকে সে খুবই ভালোবাসত। সারাদিন না খেয়ে কাটিয়ে দেওয়ার পরেও রাতে যদি তার পাতে তুলে দেওয়ার জন্য রহিমার কোনো খাবার জুটত না, তবুও সে কষ্ট পেত না। বরং সেই রাতে মায়ের মমতাময় কোলে মাথা রেখে ঘুমুতে পারলে তার যেন সকল ক্ষুধা মিটে যেত। এতেই সে অনেক সুখ পেত। রহমানের বড় ইচ্ছে ছিল সে লেখাপড়া শেষ করে একটা চাকরি করবে এবং চাকরির প্রথম বেতনটা তার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে মাকে বলবে, মা তোমাকে আর এত কষ্ট করে কাজ করতে হবে না। তাই তার এই ইচ্ছাটা পূরণ করার জন্য রহমান ভালোভাবে লেখাপড়া শেষ করল। এখন সে একটা চাকরির খোঁজ করছে। কিন্তু টাকার ঘোর পাকানো মোহময় দুনিয়াতে টাকা ছাড়া কে কাকে চাকরি দেবে? রহমান চাকরির খোঁজে গ্রাম থেকে দূর শহরে গেল। পথে পথে ঘুরেও সে যখন কোনো চাকরি পাচ্ছিল না, তখন তার জীবনকাহিনিটা শুনে এক মহান ব্যক্তি তার প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করে তাকে একটা চাকরি দিল। অবশেষে রহমান চাকরি পেল। তার মায়ের ইচ্ছাটা পূরণ হলো। এখন তার মনের ইচ্ছাটা পূরণ করার পালা। গ্রামের সেই ভাঙা কুঁড়েঘরটিতে খুব একটা ভালো দিন কাটাচ্ছে না রহিমা। তবুও রহমানের লেখা তার চাকরির খবরের চিঠিটা পেয়ে রহিমা আজ একটু হলেও আনন্দিত। কাঠের ভেতরটা যেমন ঘুণে একটু একটু করে খেয়ে ফেলে, তেমনি রহিমার ভেতরটা একটু একটু করে খেয়ে ফেলেছিল মরণ ব্যধিতে। আজ রহমানের সবচেয়ে খুশির দিন। দীর্ঘ ত্রিশ দিন পর আজ রহমান তার চাকরির প্রথম বেতনটা পেল। সে তার মনের ইচ্ছাটা পূরণ করতে যাচ্ছে আজ। মাকে গ্রামে আগমনের চিঠিটা পাঠিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে রহমান। ঐদিকে রহমানের জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে রহিমা।

শত দূরত্ব, পথ পেরিয়ে রহমান তার গ্রামের মাটিতে পা রাখল। নদীর তীরে তার চোখে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে তাদের সেই ছোট্ট কুঁড়েঘরটা। কুঁড়ে ঘরটার দিকে একটু একটু করে আসতে থাকল রহমান। মা মা বলে ডাকতে ডাকতে ঘরের ভিতরে ঢুকল রহমান। রহমানের দিকে আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার মায়ের শীতল দেহখানা।



DRMC কে নিয়ে

আমার অনুভূতি

শান্ত দাস

কলেজ নম্বর : ১৬৩৫২

শ্রেণি : নবম, শাখা : ক (প্রভাতি)

আমার জন্ম ঢাকায়, ছোট থেকে আমি এখানে বড় হয়ে উঠি ও পড়াশোনা করি। দেখতে দেখতে অষ্টম শ্রেণিতে জে এস সি পরীক্ষা দেই। জে এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়, ফলাফল সন্তোষজনক বলে বাসায় কিছু বলেছি। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছে ছিল নবম শ্রেণিতে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ভর্তি হই। আমার বাবা এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে আগেই জানত, আমার বড় ভাই আমার জন্য ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের নবম শ্রেণিতে ভর্তি করার জন্য অনলাইনে আবেদন করে, তখন থেকে আমার মনে ভয় সৃষ্টি হয় যে আমি কি আমার পরিবারের সদস্যদের (মা, বাবা, ভাই) ইচ্ছে পূরণ করতে পারব? ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ সালে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের নবম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়। হ্যাঁ, আমি পেরেছি, আমিও আমার পরিবারের ইচ্ছে পূরণ করতে পারব যার ফলে আমি ও আমার পরিবার খুশি। এখানে আমাকে ভর্তি করে আমার বাবা নিশ্চিত।

আমি যেমন এখানে ভর্তি হয়ে খুশি হয়েছি, তেমনি আমার খারাপ লেগেছে কারণ আমাকে পরিবার ছেড়ে হাউসে থাকতে হবে বলে। নতুন পরিবেশ, অচেনা মুখ, জায়গার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে সময় লেগেছে কষ্টও হয়েছে। ২৪ শে ফেব্রুয়ারি থেকে আমার DRMC-কে নিয়ে নতুন পথ চলা শুরু হয়, অর্থাৎ নবম শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়। প্রথম দিন এখানকার নিয়ম, শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা ও সুবিশাল ক্যাম্পাস দেখে আমি মুগ্ধ। DRMC-তে ছাত্রদের নিজের নাম ছাড়া আরেকটি নামে চেনে সবাই, রেমিয়ান। DRMC-এর শিক্ষক-শিক্ষিকার মতো ভালো আন্তরিক শিক্ষক শিক্ষিকা কোথাও দেখিনি। এখানে না আসলে হয়ত বুঝতাম না যে শিক্ষা অর্জনের পদ্ধতিটা কতটা সুন্দর হতে পারে। আমার এখানে সাত মাসের মধ্যে বিজ্ঞান মেলা, ভাষা অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে অনুষ্ঠিত সকল অনুষ্ঠানে আমি অনেক জ্ঞান, অনুভূতি অর্জন করতে পেরেছি, বর্তমানে নিজেকে অনেক বেশি ভাগ্যবান বলে মনে হয় এবং নিজেকে রেমিয়ান বা DRMC-এর একজন সদস্য হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি।



আলোর পথে চলার নির্দেশনা দেয়

আল কোরআন

বি. এন. তারনীন সাদনান

কলেজ নম্বর : ৬৮৮৪

শ্রেণি : নবম, শাখা : চ (দিবা)

আল কোরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত মানবজাতির জন্য এক মহা পাঠ্য যা ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করে এবং মানুষকে সত্যের পথ প্রদর্শন করে। এ পবিত্র গ্রন্থই হলো মানব জাতির দিক নির্দেশনার একমাত্র সম্বল। অন্ধকার থেকে আলোর পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে আল কোরআন। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। মানুষ যাতে তার নির্দেশিত পথে সঠিকভাবে চলতে পারে তা নিশ্চিত করতে কোরআন নাজিল করা হয়েছে। অন্য নাম কোরআন। আল্লাহ মানুষের জন্য কোরআন নাজিল করেছেন সত্য ও সুন্দর পথে চলার জন্য। মানুষের কর্তব্য এ গ্রন্থের নির্দেশনা সঠিকভাবে অনুসরণ করা। কোরআন যে সত্যপথের সন্ধান দিয়েছে তাকে আন্তরিক ভাবে আঁকড়ে ধরা। কোরআন আল্লাহর প্রদত্ত কিতাব। এর প্রতিটি শব্দ আল্লাহ প্রদত্ত। কোরআন পড়ার সময় এবং এর প্রতিটি বক্তব্য অনুধাবন করার সময় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা লালন করতে হবে। আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির একমাত্র উপায় যে কোরআন নির্দেশিত পথে চলা এটি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। কোরআন মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক জ্ঞানের আধার। তাই কোরআন পাঠ ও অনুধাবন বান্দার একান্ত কর্তব্য।

কোরআন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকিত পথে চলার নির্দেশনা দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন 'এ কিতাব, এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পারো অন্ধকার থেকে আলোকে।' সূরা ইব্রাহিম, আয়াত : ১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেছেন 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে নিজে কোরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়।' বুখারী।

কোরআন পড়তে হবে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশায় ও একাগ্রচিত্তে। কেউ কোরআন পড়লে তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে হবে। কোরআন পাঠের সময় অন্যদের উচিত এই মহাগ্রন্থের মর্যাদা রক্ষায় যথা সম্ভব নীরব থাকা। আল্লাহ বলেছেন, 'মুমিন তো কেবল তারাই যাদের সামনে আল্লাহর কথা আলোচিত হলে তাদের হৃদয়ে কাঁপন শুরু হয়। আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর কোন আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ইমান বৃদ্ধি পায়।' সূরা আনফিল আয়াত : ২। আল্লাহ আমাদের সবাইকে একাগ্রচিত্তে কোরআন তিলাওয়াতের তাওফিক দান করুন।



নাবিক রানা

মোঃ সোহেল রানা

কলেজ নম্বর : ১৬২৮৫

শ্রেণি : নবম, শাখা : ক (প্রভাতি)

নাবিক হওয়ার ইচ্ছে অনেকেরই হয়। ছোটবেলায় আমারও খুব ইচ্ছে ছিল নাবিক হওয়ার। মূলত এ আগ্রহটা জন্মেছিল পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার দীর্ঘ সমুদ্র ভ্রমণের কথা শুনে। তো একদিন আমারও খুব ইচ্ছে হলো ভাস্কো-দা-গামার মতো বেড়িয়ে পড়ি। যেই বলা, সেই কাজ। পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম মনের কৌতূহলটাকে বাস্তবে রূপদান করব বলে। তবে মজার বিষয় হচ্ছে ভাস্কো-দা-গামা বের হয়েছিলেন জাহাজ নিয়ে, কিন্তু আমি যাত্রা করেছিলাম নৌকা নিয়ে। আমার চাচার কালো রঙের মাঝারি সাইজের নৌকা এবং আমি একা। একটু ভয় ভয় হচ্ছিল। কারণ কাউকে না জানিয়ে এভাবে একা একা উদ্দেশ্যহীন এক পথে বের হচ্ছি। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। বর্ষাকালের শেষের দিকে, চারিদিকে থৈ থৈ পানি তার ওপরে ভাসমান নৌকার মাঝি আমি। খুব সকাল সকাল বের হয়েছিলাম। একদিন বৈঠা বেয়ে বেয়ে চললাম। কথায় আছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। ঠিক এ রকমই একটা ঘটনা ঘটল তার কিছুক্ষণ পরেই যখন তিনমুখী বিল এসে এক দিকে মিলিত হয়ে আবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তো আমি করলাম কী, ডানে বাক নিয়ে জোরে জোরে বাতাসের অনুকূলে চললাম। কিন্তু একি! আমি কোথায় এসে পড়লাম? চারদিকে পানি আর পানি, কোথাও কোনো বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে না। তখন আমার খুব ভয় হচ্ছিল। মা-বাবার কথাও খুব মনে পড়ছিল। মনে মনে খুব রাগও হচ্ছিল ভাস্কো-দা-গামার ওপর। এদিকে ক্ষুধাও পেয়েছে কিছুটা। সৃষ্টিকর্তার নাম আওড়াতে আওড়াতে একদিকে পথ চলতে শুরু করলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর একদিকে দেখতে পেলাম আড়ু বসেছে। আরেকটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। আমি তখনো সূর্যের সাহায্যে দিক নির্ণয় করতে পারিনি। কিন্তু তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা চিহ্নিত করতে পারতাম যদি আমার কাছে একটা জিপিএস থাকত। যাই হোক, আমি মুমূর্ষু অবস্থায় মেলার মধ্যে প্রবেশ করলাম। কিন্তু এ কী! আমি তো কাউকে চিনতে পারছি না। অন্যদিকে আমার পেটের মধ্যে ক্ষুধার চর পড়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে এক বয়স্ক দোকানদার চাচাকে বলায় আমাকে একটা রুটি আর কলা খেতে দিয়েছিল। তাতেই মনে হলো আমি আবার নতুন রূপে তৈরি হয়েছি। কিন্তু মাথার মধ্যে শুধু একই চিন্তা, আমি কোথায় এসে পড়লাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সূর্য ডুবু ডুবু অবস্থা। খুব ভয় হচ্ছিল। একজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, সারারাত মেলা চলবে, যাত্রাপালাও আছে। তাই ঠাই হিসেবে ঐ মেলাতেই কাটাতেই কাটাতেই মনস্থির করলাম। আবার এদিকে হালকা বাতাসও বইতে শুরু করেছে। বৃষ্টির আশঙ্কায় নৌকাটা ভালো করে বাঁধতে গিয়ে আরেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। নদীর ঘাটে হলেও কথা ছিল। কিন্তু ছোটখাটো বিল হওয়াতে পাশাপাশি নৌকার হুলস্থূল থাকায় পা পিছলে পড়ে গেলাম। সমস্ত শরীর কাদায় জর্জরিত। মনে হলো যেন, ছোটবেলায় মায়ের মুখে শোনা কালাপাহাড়ের ভূত এসে দাঁড়িয়ে আছে আমার পরিবর্তে। কিছুটা পরিষ্কার করে রাতটা কাটলাম ওই মেলাতেই। রাতে বেশ বৃষ্টিও হয়েছিল। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙল মানুষের টেচামেচিতে। যেই আমি চোখ খুললাম, আমার চোখতো কপালে। কারণ এক বয়স্ক লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করল

যে, “তোমার নাম রানা না?” আমি ভয়ে থ হয়ে গেলাম কথা শুনে। তিনি বললেন, “তোমাকে তো বাড়িতে আসামির ন্যায় খুঁজছে।” আমি বললাম যে, “না না আমি বাড়ি যাব না।” তিনি আশ্বস্ত করে জানালেন, উনি নিয়ে যাবেন আমাকে এবং আমাকে কেউ কিছু বলবে না। ভয়ে ভয়ে বাড়িতে পৌঁছে বিস্মিত হলাম। প্রায়শ খানেক লোক ভিড় জমিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চাহনি দেখে মনে হলো বন থেকে কোনো জন্তু এনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে বিস্মিত হলাম যখন আমার ফুফাতো ভাই বলে উঠল যে, “নাবিক রানা বাঁচামারা আবিষ্কার করে এলেন?” বুঝতে পারলাম আরিফাই কথাটা পাঁচকান করেছে। ‘বাঁচামারা’ হচ্ছে আমার বাবার মামা বাড়ি। মা কাঁদো কাঁদো অবস্থায় আমাকে বাঁ হাত দিয়ে লবণ খাওয়ালেন এবং তারপর গরম পানি দিয়ে গোসল করালেন। তখন আমার খুব লজ্জা হচ্ছিল, যখন আমি শনতে পেলাম গতকাল আমাকে খুঁজে না পেয়ে মসজিদে মাইকিং করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছিল, “রানা, তুমি যেখানেই থাকো না কেনো, বাড়িতে চলে আসো। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।” এ ঘটনার পর গ্রামে আমি একমাস বের হইনি এই মাইকিং এর জন্য। এরপর থেকেই অনেকেই আমাকে ‘নাবিক রানা’ বলে ডাকে।



লেট (Late) করাও

একটা আর্ট (Art)

শিহাব খন্দকার

কলেজ নম্বর : ৯৬৭০

শ্রেণি : দশম, শাখা : ও (দিবা)

বিশেষ দৃষ্টব্য: এই লেখায় সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণ থাকতে পারে। শুধু গুরুচণ্ডালীই না, আঞ্চলিকতা, বাংলা ভাষার নিদর্শনও থাকতে পারে। আপডেটেড জেনারেশনকে এখন যদি প্রশ্ন করা হয়— “গুরুচণ্ডালী কী, জানিস?” কেউ কেউ হয়ত বলবে— “আই ডোন্ট কেয়ার! বাই দ্য ওয়ে, এটা খায় না মাথায় দেয়?” কাজেই এই জেনারেশনের কাছে সাধু-চলিত, বাংলা-ইংরেজি ভাষার মিশ্রণ কোনো ব্যাপারই না। আর হ্যাঁ, এই লেখা পড়ে হাসি পেলে মুখ বন্ধ রেখে হাসবেন। কারণ দাঁত দেখালেই জরিমানার কবলে পড়বে।

আমাদের ডিআরএমসি’তে স্কুল কামাইয়ের জন্য জরিমানা করা হয়। ক্লাসে লেট করে গেলে জরিমানার বিধান নাই। যাক, আল্লাহ বাঁচাইছে। লেট করার জন্য জরিমানা হলে আমার যে কী পরিমাণ জরিমানা হইত তার একটা নমুনা নিচে পাওয়া যাবে। পড়তে থাকেন...।

ওহ, জরিমানা নিয়ে একটা মজার গল্প বলি। আমাদের হাউসের হাউস মাস্টার তখন MKR স্যার। স্যার যখন লক্ষ করলেন দুই-তিনদিন থেকে পোলাপান নামাজে যাইতেছে না (মানে সংখ্যায় অনেক কম), তখন জারি করলেন ১৪৪ ধারা। স্যার ঘোষণা করিয়া দিলেন— “যারা নামাজে যাইবা না, কাল জরিমানা দিবা।” হাউসে ফোন ধরা খাইলে জরিমানা করা হয়। জরিমানার ৫০০ টাকা হাতে পাওয়ার পর স্যারের মুখে গাঢ় হাসির ছাপ দেখা যাইতো। যাই হোক, নামাজে না যাওয়ার জন্য জরিমানার কথা শুনিয়া কতিপয় পোলাপান হেসেই উড়িয়ে দিলো। ১৪৪ ধারায় কাজ হইল না। পরের দিনও দেখা গেল সংগ্রামী হাউস বয়দের অনেকে নামাজে যায় নাই। স্যার জরিমানার কথা সম্ভবত ভুলেই গেছিলেন।

আমি নামাজে যাইতে প্রায়ই লেট করতাম। শুধু এই একটা কারণেই MKR স্যার আমাকে ৪০২ নম্বর রুম থেকে ২০৪ নম্বর রুমে নামিয়ে দিলেন। স্যারকে অনেক অনুরোধ করে বললাম— ‘স্যার, রুম চেঞ্জ করা অনেক ঝামেলা। এবারের মতো মাফ করেন। স্যার, আর লেট করব না, স্যার।’ আমার অনুরোধে কোনো কাজই হইল না। স্যার আমাকে এক বছরের ৪০২ এর বাসিন্দা থেকে ২০৪ এ নামিয়ে দিলেন। মনটা খুবই খারাপ হইল। স্যার হয়ত ভাবছিলেন যে, দোতলায় নামিয়ে দিলেই আমি আর লেট করব না। কিন্তু স্যারের ধারণা পুরাপুরি ভুল প্রমাণ করে আমি আবার লেট করা শুরু করলাম। ২০৪ নম্বর রুমে যাওয়ার পরের দিনই আমি লেট করে ক্লাসে গেলাম। এখনো বিভিন্ন কাজে লেট করি। প্রায়ই লেট করি। আমি যে ইচ্ছা করে লেট করি তা কিন্তু না। কাকতালীয়ভাবে লেট করার পেছনে কোনো না কোনো কারণ যুক্ত হয়ে যায়। এই যেমন— গোসলে গেছি কিন্তু সিরিয়াল পাই নাই, কিংবা দেখা গেলো পানি শেষ বা খুবই আন্তে পানি আসতেছে। অথবা দেখা গেলো ভাত খাইতে দেরি হইছে। ক্লাসে যাওয়ার সময় আইডি কার্ড নিতে ভুলে গেছি, আইডি কার্ডের জন্যে আবার ফিরে যাইতে হইতেছে। এরকম ছোটখাটো নানান কারণ। একবার ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখছিলাম। পরে ক্লাসে লেট করে গিয়ে দেখি ঘড়ি থেমে আছে। আরেকদিন ক্লাসে যাওয়ার আগে দেখি টাইটা নাই। অনেক খুঁজলাম, পাওয়া গেল না। সম্ভবত চুরি হইছিল! পরে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে টাই নিয়ে ক্লাসে গেলাম (ঐ সিনিয়র ভাইয়ের দুইটা টাই আছিল)। গিয়ে দেখি তিন মিনিট লেট করছি। আমি লেট করলেও যে অনেক বেশি সময় লেট করতাম তা কিন্তু না। লেট করতাম যৎসামান্য।

আমার মনে আছে, সেদিন বৃহস্পতিবার আছিলো। লেট করে ক্লাসে যাওয়ার জন্য ক্লাস টিচার MKR স্যার আমাকে বললেন— “যা, V.P. স্যারের রুমের সামনে দাঁড়াই থাক। যা! অনুরোধে কাজ হইলো না। যখন বুঝিতে পারিলাম এই কাজটা আমাকে করিতেই হইবে তখন স্টপ ওয়াচ চালু করিয়া দিলাম। আমার ঠিক মনে নাই, সেদিন সম্ভবত দুই ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট ভাইস প্রিন্সিপাল স্যারের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এরকম শাস্তিতেও কাজ হইত না। দেখা গেলো শাস্তির এক সপ্তাহ পরে আবার লেট করেছি।

পরীক্ষা শুরুর দিনে সবাই একটু বেশি আগেই পরীক্ষা দিতে যায়। আমার মনে আছে, ক্লাস নাইনের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার প্রথম দিনে অনেক তাড়াহুড়া করার পরেও হলে গিয়ে দেখি আট মিনিট লেট করে ফেলছি। অবশ্য আগে যদি সিট ম্যানেজমেন্ট এর বোর্ডটা দেখতাম, তাইলে এই লেট হইত না। ঐ যে বললাম লেট হওয়ার পেছনে— একটা না একটা কারণ যুক্ত হবেই।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রি. এই দিনটা জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। এই দিনটা একই সঙ্গে আমার ডিআরএমসি এবং ডিআরএমসি’র হোস্টেল লাইফের প্রথম দিন। মজার ব্যাপার কী জানেন? এই দিনেও আমি লেট করেছিলাম!!! কেমনে লেট করছিলাম সেটা আরেক দিন বলা যাবে।

অনেক কিছুই এখন মনে নাই, আমার যতদূর মনে পড়ে, দুই বছরের ডিআরএমসি লাইফে আমি মাত্র একদিন ক্লাস মিস করেছি। এমন রেমিয়ানও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে যে, একদিনও ক্লাস মিস করে নাই। তবে আমার বিশ্বাস, অবশ্যই সে হাউসের একজন আবাসিক ছাত্র হবে। ওহ! হ্যাঁ, আমার লেট করার পেছনের সবচেয়ে বড় প্রাস পয়েন্ট হলো আমি হাউসে ছিলাম। এর জন্য ক্যাম্পাসের ভিতরেই থাকতে হইত আর মেইন গেট দিয়েও ঢুকতে হইত না। নইলে তো গেটম্যান আঙ্কলের কাছেই ধরা খাওয়া লাগত।

দুই বছরে ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ মাত্র দুইবার পাওয়া গেলেও প্রথমবার কয়েকজন ব্যর্থ হইছিলাম পোলার্ড স্যারের কারণে (স্যারের চেহারা কাইরন পোলার্ডের মতো, এজন্য সবাই পোলার্ড স্যার ডাকে)। দ্বিতীয়বার একই মিশন সফল করতে সহায়ক হইছিল ‘সায়েল ফেস্টিভ্যাল’।

ডিআরএমসি'র লাইফে আমি ক্লাসে যাইতে, নামাজে যাইতে, নাইট ক্লাসে যাইতে, খাইতে যাইতে, গোসলে যাইতে, খেলতে যাইতে, অনুষ্ঠানে যাইতে, আবেদনপত্রে সুপারিশ নিতে যাইতে ইত্যাদি ইত্যাদি নানা জায়গায় যাইতে লেট করেছি। একরকম রেকর্ড বলা যাইতে পারে, আমার চেয়ে বেশিবার লেট করেছে, এমন কেউ যদি থাকে তবে অবশ্যই সে লিজেড! আমার চাইতে বড় LEGEND কেউ থাকলে সে যেন আমাকে ফেইসবুকে নক দেয়।

অনেক বছর পর হয়ত ডিআরএমসি'র কলেজ ম্যাগাজিনে এরকম লেখা পাওয়া যাবে- “Once upon a time in Dhaka Residential Model College. There was a remian in Dr. Muhammad Shahidullah House, called ‘Late boy’!”



রয়ে যাওয়া

বায়োজীদ আল মাহী

কলেজ নম্বর : ১৬২৮৮

শ্রেণি : দশম, শাখা : ক (প্রভাতি)

শীতকাল... গভীর রাত। ডি.আর.এম.সি এর ভেতরের ঢালাই করা রাস্তা ধরে হেঁটে চলছি। চারিদিকে নিশ্চুপ নীরবতা। বাইরে থেকে কয়েকটা গাড়ির হর্নের ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে। দূরের ল্যাম্পপোস্টের নিচে দুইটা কুকুর শুয়ে আছে। গাছের ডালে থাকা কাকের বাসা থেকে ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি আমার মতোই ধীর পায়ে এগিয়ে চলছি। হাউসগুলোতে গুনশান নীরবতা চলছে। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আজও মনে পড়ে সেই ছাত্রজীবনের দিনগুলি। সকালের মর্নিং পিটি, ব্রেকফাস্ট, লাইন করে স্কুলে যাওয়া, টিফিনের অল্প সময়েই খেলতে মাঠে যাওয়া, বিকেলের গেমস, সন্ধ্যার নাস্তা, আর বিদঘুটে সেই নাইটক্লাস। ল্যাম্পপোস্টের নিচে চলে এসেছি, হাঁটতে হাঁটতে কুকুরগুলো আমার অবস্থান টের পেয়ে খেউ খেউ করছে। আগের মতো এখন আর আমি এসবে ভয় পাই না। এক সময় এ কুকুরগুলো দেখলেই ঝেড়ে দৌড় দিতাম। মনে পড়লেই কেমন জানি লাগে, এসব ভেবে কেমন হাসি পাচ্ছে। এক সময় আমিও এ কলেজের ছাত্র ছিলাম। এসব অতীত ভাবতে ভাবতে এসে থমকে দাঁড়ালাম কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সেই চিরচেনা পুকুরের সামনে। এক সময় সব বন্ধু মিলে এ পুকুরে গোসল করতাম। কতই না দুষ্টিমি করতাম। পানির নিচে লুকোচুরি, শ্বাস ধরে রাখা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি খেলাও খেলতাম আমরা। ভাবতে খুব খারাপ লাগে যে, আজ আমার কারণেই এ পুকুরে কাঁটা তারের বেড়া। আজও মনে পড়ে সেই দিনটির কথা, ১৩ আগস্ট। সেদিনও সব বন্ধু মিলে পুকুরে নেমে দুষ্টিমি করছিলাম, কিন্তু কোনো কারণে ডুবে যাই আমি। পরে অবশ্য উঠে আসি আমি, কিন্তু আমার সঙ্গে উঠে আসতে পারেনি আমার দেহটি। বন্ধুরা যতক্ষণে আমার নিখর দেহ টেনে তোলে, ততক্ষণে আমি মৃত। তা বুঝতে অবশ্য সময় লেগেছে অনেক। নিজের চোখের সামনে মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, বড়ভাই সবাইকে কাঁদতে দেখি আমার নিখর দেহটা নিয়ে। এখন কেউ আর আমাকে দেখতে পাচ্ছে না বা অনুভব করতে পারছে না। বড় ভালোবাসতাম এ প্রতিষ্ঠানকে, তাই আজও ছেড়ে যেতে পারিনি, রয়ে গেছি অদৃশ্য অশরীরী হয়ে।



বাংলাদেশ- ৩০০১ খ্রিস্টাব্দ

তামিম বিন রফিক

কলেজ নম্বর : ১০৬৩৬

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (দিবা)

বৈশ্বিক উষ্ণতা, পরিবেশ দূষণ, জলবায়ুর পরিবর্তন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় নিম্নভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চল স্থায়ীভাবে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে সেই কবে। দেশের আয়তন একবিংশ শতাব্দীর তুলনায় অর্ধেক এসে দাঁড়িয়েছে। একসময় দেশটা নাকি নদীমাতৃক, সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা ও কৃষি প্রধান ছিল ইতিহাসে পাওয়া যায়।

ষড়ঋতু ছিল- গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। অগ্রহায়ণে সোনালি ফসলে ভরে যেত কৃষকের উঠোন। কৃষাণ-কৃষাণীরা ব্যস্ত সময় কাটাতো ফসল তোলায়, কণ্ঠে থাকতো গান আর মুখে লেগে থাকত তৃপ্তির হাসি। পৌষ পার্বণে ‘নবান্ন’ উৎসব পালন করা হতো। কণ্ঠে থাকত সুললিত গান, “ও ধান ভানিরে টেকিতে পাড় দিয়া, টেকি নাচে আমি নাচি হেলিয়া দুলিয়া...।

শীতে হাড় কাঁপানো শীত আর ঘন কুয়াশা পড়তো। বসন্তকে সে সময় ঋতুরাজ বলা হতো। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ আর কোকিলের কণ্ঠে থাকত কুহুতান। গ্রীষ্ম ঋতু অনেকটা এ যুগের মতো। তবে তখন প্রাকৃতিকভাবেই গাছে আম, কাঁঠাল ধরত। সে সময়ে জাম নামক একটি রসালো ফলে ছেলে মেয়েরা মুখ রঙিন করত বলে শোনা যায়।

বর্ষায় অব্যাহার বৃষ্টি হতো। চারিদিকে তখন পানি থৈ থৈ করত। শরতের আকাশে মেঘ ভেসে বেড়াতো। দেখতে খুবই নির্মল ও অপরাপ ছিল। ওসব এখন অতীত ইতিহাস। এখন ঋতু বলতে কিছু নেই। প্রচণ্ড গরম! কৃষিভূমি এখন মানববসতি আর শিল্পায়নে বিলীন। যাও একটু আধটু ফাঁকা আছে, অতি তাপমাত্রায়, স্বাভাবিক পরিবেশে সেখানে ফসল ফলে না। কৃত্রিম উপায়ে তাপ নিয়ন্ত্রণ করে (গ্রীন হাউজ) ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। তবে এখনো কিছু ফসলি জমি আছে, প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে। সেগুলো আবার সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়, সপ্তাহের ছুটির দিনগুলোতে টিকিটের মাধ্যমে প্রদর্শন করানো হয়।

খটখটে রোদ, আকাশে মেঘ জমে না, আকাশটা ঈষৎ লালচে বর্ণের। মাটি আয়রণ সমৃদ্ধ ঈষৎ তামাটে বর্ণের। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ১১.০৯% এ নেমে এসেছে। যেখানে একবিংশ শতাব্দীতে ছিল ২০.৯৫%। মাঝে মাঝে জরুরি প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়। পানি বিভাজন (H₂O dividation) এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভাবে O₂ উৎপাদন করা হচ্ছে।

শিল্পের উপর মানুষের জীবিকার চাহিদা প্রায় শতভাগ। খাবার তৈরি হয় পুষ্টি বিভাজন এর মাধ্যমে অনেকটা একবিংশ শতাব্দীর ঔষধের মতো করে Nutrition Dividation Formula তে। দেশের জনসংখ্যা এমন পর্যায়ে যে, একটি নতুন মুখ যুক্ত হলে দেশের খাদ্য, আবাসন, স্বাস্থ্য ভারসাম্য নষ্ট হবে। সরকার সন্তান গ্রহণের বিষয়টিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ

করছে। কোথাও কেউ মারা গেলে সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে, আবেদনের সিনিয়রিটি, জুনিয়রিটি, ধর্ম এবং অঞ্চলভিত্তিক কোটা বিবেচনায় অনুমোদন মিলে। তাও আবার রয়েছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা।

তো এ যুগের জেসিকা ও সাদমান বিয়ে করেছে প্রায় এক যুগ হতে চলল। শুরুর দিকেতো বয়সের জুনিয়রিটির কারণে, সন্তান গ্রহণের অনুমোদন আশাই করা যায়নি। তবে এখন দম্পতির বয়স এমন পর্যায়ে এসেছে যে, আর দেরি হলে হয়ত তারা সন্তান গ্রহণের ক্ষমতাই হারাবে। তাই এখন যথাযথ গুরুত্ব নিয়েই নিয়মিত সিটি কর্পোরেশনে খোঁজ নিচ্ছেন। প্রতিবেশী চেনা জানা স্বজনদের মধ্যেও লক্ষ রাখছেন; কোথাও কেউ মারা যাচ্ছে কিনা। কী যুগ এলো; মানুষ দীর্ঘায়ু কামনা না করে বরং মৃত্যু কামনা করছে। সত্যিই মানুষ এখন বড়ই স্বার্থপর হয়ে গেছে। এক সন্তান নীতির ফলে মামা, চাচা, ফুফু, খালা বলতে কেউ নেই। তাই এখন আধুনিকতার উৎকর্ষে আবেগ কেবলই বেগে পরিণত হয়েছে।

জেসিকা আজকাল অস্বাভাবিক আচরণ করছে। সাইকোলজিক্যাল সমস্যা। নারী ফলবতী বৃক্ষ। সাদমান তাকে সাব্বুনা দেয়। এভাবেই আরো কিছুদিন চলে গেল। অনেক চেষ্টা, তদবির আর আরাধনার পর কর্পোরেশন থেকে সন্তান গ্রহণের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পেল সাদমান।

সে বেশ রোমাঞ্চিত। খোদা তায়লা অবশেষে তার ইচ্ছা পূরণ করলেন। জেসিকা আনন্দে আত্মহারা। সে শুনবে ‘মা’ ডাক। মুহূর্তেই দু’ফোটা আনন্দের অশ্রু জমা হলো তার চোখের কোণায়।

দিন গড়াতে লাগলো, জেসিকার গর্ভে সাদমানের সন্তান। দুজনেই খুশিতে আত্মহারা। অনেক সাধনার মুখটা কবে আলো দেখবে? মাঝে মাঝে সন্তানের নাম নিয়ে খুনসুটিও হয়। সব কিছু ঠিকঠাকই চলছিল। হঠাৎ ভিন্ন কিছু দেখা গেলো আন্ট্রাসনো রিপোর্টে। গর্ভে একটি নয়, দুটি সন্তান। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। এক অজানা শংকায় দুজন ভীত সন্ত্রস্ত। যদিও এ ঘটনা নতুন নয়, সুস্পষ্ট আর্টিকেল আছে যে, বাবা-মার ইচ্ছানুযায়ী একটি জুগকে রেখে অন্যটিকে বিনষ্ট করে দেওয়া হবে।

জুগ অবস্থায় ব্যবস্থা নিলে হয়ত দুইটিই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত, জন্মের পরই ইচ্ছানুযায়ী একজনকে রেখে অন্যজনকে ইনসিনিরেটরে ঢুকিয়ে সুইচ দেওয়া হবে। সাদমান কিছুটা ব্যর্থ চেষ্টা করেন, কিন্তু আবেগ বলতে কিছুই নেই। জেসিকা মা হিসেবে কোনোটিকেই ছাড়তে চায় না, কিন্তু মেয়ে সন্তানের প্রতি একটু বেশিই আত্মহী। নারীর প্রতি নারীর এক অদৃশ্য নাড়ির টান।

মুদ্রার ওপিঠে সাদমান প্রিফার করছে ছেলে সন্তানকে, এভাবেই তারা সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত না জানলে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো একটিকে নষ্ট করে দিবে। তারা অসহায়ের মতো জানতে চায় বিকল্প সম্পর্কে। কোনো প্রত্যুত্তর আসেনি। সাদমান কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল “আচ্ছা, সন্তান জন্মের কতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সময় পাবো?”—“মায়ের জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত।” দুজনেই বিষণ্ণ মনে বেরিয়ে আসলো।

জেসিকার ডেলিভারি ডেট আজ; ওটিতে নেওয়া হচ্ছে। সাদমান ও জেসিকার সাক্ষর Eye contact হলো। উদ্ভিগ্ন সাদমান ওটির সামনে পায়চারি করছে। নার্স এলো, সাদমান দৌড়ে গেল Baby cot এ। কী সুন্দর ফুটফুটে বেবি। না! জেসিকার এখনো জ্ঞান ফিরেনি। বেচারির মা হবার কত শখ ছিল! সন্তানের জন্য বাবার চেয়ে মায়ের অবদান বেশি। সে আর কিছু ভাবল না, দৌড়ে গেলেন Consultant এর কাছে। একটি খাম

দিয়ে সববেগে চলে গেলেন। কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হলো না। তার চলে যাওয়ার মানে কী? কর্মকর্তা নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

জেসিকার জ্ঞান ফিরে আসলো। সন্তান দুটিকে বুকে আগলে রেখে বললো : “না, আমি কাউকেই ছাড়ব না।” মায়ের তীব্র ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। “না, তার আর দরকার হবে না।” হঠাৎ ঘোর ছেড়ে উঠলো জেসিকা। কেনো, কীভাবে? সাদমান কোথায়? কর্তৃপক্ষ বলল “সাদমান সাহেবই ব্যবস্থা করে গেছেন,” সন্তান ছেড়ে স্ট্যাচুর মতো স্থির জেসিকা। মানস-পটে ভেসে এলো সাদমানের মুখচ্ছবি। সন্তানের জন্য এতো বড় আত্মত্যাগ! এটা বাবার পক্ষেই সম্ভব। সে কেবল ভাবছে, “আহ! আমাদের পূর্ব পুরুষরা যদি আমাদের ব্যাপারে সচেতন হতো, পরিবেশটাকে ভালোবাসতো, তবে আমাদের আজ এ অবস্থা হতো না!”

এটি একটি কল্পচিত্র। সৌভাগ্য বশত আমরা একবিংশ শতাব্দীতে আছি। শিল্পায়নের ছোঁয়ায় আমরা যেভাবে বন উজাড় করছি, পরিবেশ দূষণ করছি, পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করছি তাতে উল্লিখিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া সময়ের দাবি।

না, আমরা তা হতে দিব না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের দুরবস্থার জন্য আমাদের অভিসম্পাত দিবে।

আসুন, পরিবেশ সংরক্ষণ করি, নিরাপদ পৃথিবী গড়ি।

“এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার...”



একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা

মোঃ আল-আমিন খান

কলেজ নম্বর : ১১১০৭

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ক (দিবা)

মাহিন, রাকিব আর শুভ তিন বন্ধু। ওরা তিনজনই এবছর একই কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার পর তারা চিন্তা করল বেড়াতে যাবে। মাহিনের বাড়ি রংপুর। রাকিব আর শুভ কখনো উত্তরাঞ্চলে বেড়াতে যায়নি, তাই তারা ঠিক করল রংপুর যাবে। মাহিনের গ্রাম একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে, আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে দূরেই বলা যায়। মাহিনের বাড়ি পৌছানোর পর তার পরিবারের সবাই রাকিব আর শুভকে সাদরে গ্রহণ করে। কয়েকদিন তারা ঘোরাঘুরি করে ভালোই সময় পার করল। একদিন গল্পে গল্পে মাহিন বলল, তাদের এলাকায় নাকি একটা পুরোনো জমিদার বাড়ি আছে যা এখন জঙ্গল বাড়ি নামে পরিচিত। বাড়িটা বেশ পুরোনো। শোনা যায় ওখানে নাকি অতৃপ্ত আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। অনেকদিন কেউ থাকে না বলে বাড়িটা জঙ্গলে ভরে পরিত্যক্ত বাড়িতে পরিণত হয়েছে। জঙ্গলবাড়ির কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাকিব আর শুভ সে বাড়িতে যাবার জন্য স্থির করল। মাহিন প্রথমে তাদের বারণ করলেও রাকিব আর শুভর জোড়াজুড়িতে তাকে যেতে রাজি হতে হলো। পরের দিন রাতে তারা সে বাড়িতে যাবার জন্য রওনা দিলো। সেদিন রাতে হালকা জোৎস্না ছিল। চারপাশ নিস্তব্ধতা, নীরবতার চাদরে ঢাকা। জঙ্গলে সে নীরবতা আরো ভয়ংকর। বাড়ির কাছে এসে মাহিন তার ঘড়ির অ্যালার্ম শব্দে বলল, রাত বারোটা বাজে। বাড়িটার দরজার কাছে এসে দরজা ধাক্কা দিতেই ক্যাচ ক্যাচ

শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। শুভ বলল, এ পুরোনো বাড়িগুলোতে দরজায় এরকম শব্দ হয় কেনো কে জানে। ঘরের ভেতর ঢুকে পুরোনো দিনের বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখে খুশিই হলো। শুভ বলে উঠল, এ বাড়টাকে তো জাদুঘর বানানো উচিত। যখন তারা নিচে ঘুরে ঘুরে দেখছিল তখন মাহিন বলল, তোরা এখানে থাক, আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে আসি। এ বলে সে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এল। প্রথমে আসার সময় মাহিনকে ভীত ভীত লাগলেও এখন আর তাকে সে রকম মনে হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর তারা উপর থেকে একটা আওয়াজ শুনে উপরে গিয়ে দেখে মেঝেতে একটা পিতলের বাটি ঘুরছে। জানালা দিয়ে একটি কালো বিড়াল চলে গেল। এমন সময় তারা লক্ষ করল দেয়ালের ঘড়িটা ঢং ঢং করে বেজে উঠেছে। শুভ আতঙ্কিত হয়ে বলল, এত পুরোনো ঘড়ি এখনো ঠিক আছে কীভাবে? তারপর কিছুক্ষণ সবাই একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তারা শুনতে পেল পাশের রুম থেকে ঘুড়রের আওয়াজ আসছে। সবাই সে দিকে দৌড়ে গেল। গিয়ে একটা রুমে তারা দেখল একটা পুরোনো পেইন্টিং। কেউ নাচছে এ অবস্থায় পেইন্টিংটা বানানো। দেখে মনে হয় এটা সত্যি সত্যিই জীবন্ত। হঠাৎ তারা লক্ষ করল রুমের ভেতর কেমন যেন ওলট-পালট হচ্ছে। সবকিছু নড়ছে। পেইন্টিংয়ের ভেতর থেকে ঘুড়রের আওয়াজ আসছে। এটা দেখে তাদের গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। হঠাৎ শুভ লক্ষ করল দরজার ওপাশে কে যেন ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ানো, মনে হয় ওদেরকে দেখে হাসছে। দরজার দিকে দৌড় দিতেই দরজাটা বিকট শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। ওরা এখন কী করবে বুঝতে পারছিল না। অনেক কষ্টে একটা জানালা খুঁজে সেটাকে ভাঙল। রুমে তখনও অস্বাভাবিক অবস্থা। আর রুমের অবস্থার কথা না ভেবেই রা কিব আর শুভ দিলো লাফ। রা কিব বাইরে পাতার স্তূপের ওপর পরার কারণে কোনো ব্যথা না পেলেও শুভ কীসের ওপর যেন পড়ে পায়ে একটু ব্যথা পেল। হালকা আলোয় তাকিয়ে দেখল মাহিনের দেহটা মাটিতে পরে আছে। মাহিনের চোখে মুখে তখনো ভয়ের ছাপ।



রক্তকন্যা

মোঃ মারুফ হোসেন (রবিন)

কলেজ নম্বর : ১১০৬৫

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ক (দিবা)

টাকার শান্তিবাগের নয় বছরের ছোট একটি মেয়ে, নাম কেয়া। রিস্রাচালক বাবা আলমগির রিস্রা চালিয়ে যা রোজগার করতেন তা দিয়ে ভালোই দিন চলছিল তাদের। মা নাহরিন আক্তার অসুস্থ থাকায় সংসারের টুকটাক কাজ কেয়া নিজেই করত। এবার কেয়া তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় হয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে উঠেছে। সুতরাং মেয়ের মেধাও আছে বলা যায়।

মেয়েটির মায়ের অসুস্থতা দিন দিন বেড়েই চলছিল। আর্থিক সমস্যার কারণে ভালো চিকিৎসাও করাতে পারছিল না তারা। একেই বলে ‘গরিবের রোগ’।

হঠাৎ একদিন কেয়া ঘুম থেকে উঠে শুনে তার মা আর নেই! কেয়া কান্নায় ভেঙে পরে, মায়ের দাফন কাজ শেষ করার পর বাড়ির থমথমে পরিবেশ ঠিক হতে বেশ ক’দিন সময় লাগে। মা মারা যাওয়ার পর সংসারের সকল কাজই

এখন কেয়াকেই করতে হয়। বাবা সারাদিন রিস্রা চালিয়ে যা উপার্জন করেন তাই দিয়ে কোন রকমে দিন চলছে তাদের। এটুকু সুখও যেন মেয়েটির কপালে জুটলো না। হঠাৎ একদিন মালিবাগ মোড়ে বাসের সাথে এক্সিডেন্ট হয় কেয়ার বাবার। স্থানীয় লোকজন হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তিনিও শেষ! সুতরাং বাবা-মা সকলকে হারিয়ে এখন মেয়েটি একদম একা। অন্যদিকে কেয়ার পড়াশোনার এখানেই সমাপ্তি। তার দায়িত্ব নিয়ে তাকে যে কেউ বসিয়ে খাওয়াবে এমন কোন আত্মীয় বা কাছের মানুষও তার ছিল না। সুতরাং তার নিজেই কিছু একটা করতে হবে।

মেয়েটি অভাবে থাকলেও তার মধ্যে আত্মসম্মানবোধের কোনো কমতি ছিল না। তাই রাস্তায় বেড়িয়ে পরে একটা কাজের জন্য। কিন্তু নয় বছরের একটা মেয়েকে কেইবা কাজ দিতে যায়। মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় শুধু একটা কাজের জন্য। কিন্তু তার কথা কেউ শুনেও শুনে না। সকলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। এদিকে পেটের জ্বালা আর সহ্য হয় না। পুরো তিনদিন না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোড়ার পর হঠাৎ মধ্য বয়স্ক একজন লোক মেয়েটিকে বলে যাবি আমার সাথে? কাজ দেব, খেতেও দেব। কথাটি শুনেই মেয়েটির মুখে আনন্দের একটি হাসি ফুটে উঠল, যেন সে কত কিছু পেয়ে গেছে।

লোকটি কেয়াকে নিয়ে চলে এলো তার চেনা কোনো এক জায়গায়। এখন কেয়া নিজেও জানে না সে কোথায় আছে। শুধু জানে এখানে সে খাবার পাবে। লোকটি কেয়াকে গোড়াউনের মতো একটা ঘরে রেখে গেল এবং যাওয়ার সময় বলে গেল “আমি তোমার জন্যে খাবার আনতে যাচ্ছি।” একা একটা ঘরে, চারদিকে হালকা অন্ধকার, অন্যদিকে ক্ষুধার জ্বালা সব মিলিয়ে কখন যে মেয়েটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে নিজেও জানে না। তার এই জ্ঞান পরবর্তীতে আর কখনো ফেরেনি। দুইদিন পর রামপুরার হাতিরঝিল নামক স্থানে পানির মধ্যে ছোট একটি মেয়ের লাশ ভেসে ওঠে। লোকজনের অনেক ভীর হয়। পুলিশ আসে, মেয়েটিকে পানি থেকে উঠিয়ে আনা হয়। তখন দেখা যায় মৃত মেয়েটির পেট থেকে দুটি কিডনিই বের করে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে মেয়েটির পরিচয় বা মেয়েটির পরিচিত কাউকেই পায় না। তাই বিষয়টি অন্যান্য ফাইলের নিচেই চাপা পরে যায়। এটিই আমাদের নয় বছরের সেই ছোট মেয়েটি কেয়া!



কর্মব্যস্ততা, সাফল্য ও

সফল মানুষ

আবির হাসান

কলেজ নম্বর : ১০৫৯৩

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (দিবা)

সকালের রোদ্দুরের আভা চোখের কিনারায়। মানুষের কোলাহল আর গাড়ির হর্নের শব্দ। প্রত্যেকটা সকাল এভাবেই শুরু হয়। জানালার বাইরের পানে একটু তাকালে দেখা যায় শত শত গাড়ি যাচ্ছে-আসছে, সেই সাথে মানুষগুলোও ছুটছে অবিরাম।

এত ছোট্ট ছুটি কিসের? কিসের জন্য এত ব্যস্ততা? ক্ষণস্থায়ী কিছু মুহূর্তের জন্য এত রকম ব্যস্ততা দেখে কিছুটা অদ্ভুত এবং রহস্যময় লাগে। সময় অসময় ভাবি, আমরা আসলে কিসের জন্য ছুটছি? কিছু সুখময় মুহূর্ত গড়ে তোলার জন্য, জীবনে সফল হওয়ার জন্য। তাই তো...!

আচ্ছা, সফলতা কী? জীবনে সাফল্য কী? এসব নিয়েই কিছু চিন্তাভাবনার লেখ্যরূপ উপস্থাপন করছি।

আসলে জীবনে সফলতা এবং আপনি আপনার জীবনে কতটুকু সফল? এ প্রশ্নের উত্তর যদি পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় দেই, তাহলে বলতে হয় এগুলো আসলে আপেক্ষিক। অনেকে হয়তো অনেকভাবে সফলতার মাপকাঠি নির্ধারণ করেন। কেউ কেউ মনে করেন সমাজে নিজেকে বিত্তশালী হিসেবে অধিষ্ঠিত করতে পারলেই তিনি সফল। অন্যদিকে একজন নিজের লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপদান করতে পারলে নিজেকে সফল মনে করছেন। রাগিব হাসান স্যারের একটি বইয়ে একজন গণিতজ্ঞের কথা পড়েছিলাম। তিনি আমেরিকার পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে পিএইচডি করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তাকে রেস্টুরেন্টের ডেলিভারিয়ার হিসেবে চাকরি নিতে হয়। ৪৪ বছর বয়সে তিনি একটি অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। ৫৮ বছর বয়সে তিনি মৌলিক সংখ্যার একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে পুরোবিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। ৫৮ বছর বয়সে তিনি তার দুর্ভাগ্যকে জয় করতে পেরেছেন। তাকে কী বলবেন আপনি, সফল নাকি বার্থ। আমার উত্তর- হ্যাঁ, সে সফল। তিনি সব ধরনের প্রতিকূলতাকে জয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন। অন্যদিকে, ধরুন একজন রিকশাওয়ালা ভাড়া রিকশা চালান এবং দৈনিক ২০০ টাকা উপার্জন করেন। তার স্বপ্ন তিনি নিজে রিকশা কিনবেন এবং অবশেষে দিনরাত পরিশ্রম করে কিনতে পারলেন। তিনি বলবেন “আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি, অতএব আমি সফল।” আবার একজন ব্যক্তি একটি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একটি প্রজেক্ট কিছুতেই হাতে পাচ্ছেন না, পুরো প্রজেক্টটি পেলে পুরো বাংলাদেশে তিনি পরিচিত হয়ে উঠবেন এবং এ কারণে তিনি প্রজেক্টটি পেতে মরিয়া। অতঃপর অনেক মন্ত্রী-আমলার বাঁ হাত ধরে প্রজেক্টটি হাতে পেলেন। তিনিও কিন্তু সফল মানুষদের একজন।

বলাই যেতে পারে, সাফল্য এবং সফলতা ব্যাপারটা তাহলে আপেক্ষিক। প্রথম ব্যক্তি (গণিতজ্ঞ) সফলতার মাপকাঠি ধরেছেন নিজেকে প্রকাশ করার, রিকশাওয়ালা স্বপ্ন পূরণকে এবং সর্বশেষ ব্যক্তি নিজের বিত্তশীলতাকে। আমাদেরকেও সফলতার মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে। কোন পথে গিয়ে নিজেকে সফল মানুষ হিসেবে পরিচিত করতে পারি।

সাফল্য অর্জনের জন্য দুটো জিনিসের দরকার।

– সাফল্য ভাবনা

– সাফল্য অর্জনের চেষ্টা এবং সে অনুযায়ী কর্মকাণ্ড

সফলতাকে ভাবুন... ধরতে না পারলেও ছুঁতে তো পারবেন।



বাস্তবতার অবাস্তব দর্পণ

আদনান সামি সরকার

কলেজ নম্বর : ১০৬১১

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (দিবা)

বিষয়টির শিরোনাম দেখলে হয়তো কোন কিছুই স্পষ্ট হওয়ার কথা নয়। যাই হোক চেষ্টা থাকবে বিষয়টির ভাবার্থ তুলে ধরার। সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত অনেকটা সময় পার করে আসলাম। একাদশ শ্রেণিতে উঠে গেলাম কিন্তু সত্যি কথা এই যে, আজ পর্যন্ত এই কথা বুঝতে পারলাম না যে, কেন আমি বা আমরা এই পৃথিবীতে জন্ম নিলাম! সত্যিকার কারণটাই বা কী! যাই হোক এখনকার বাস্তবতা দেখতে গেলে কেবল একটা বিষয়ই কেন্দ্রবিন্দুতে

থাকে। তা হলো প্রতিযোগিতা, কিন্তু কিসের এই প্রতিযোগিতা?

মানুষ যা করে তাই প্রতিযোগিতা। কেননা মানুষ বিনিময় ছাড়া কোনো কাজ করে না। ছেলেবেলা থেকেই বাবা-মার ইচ্ছা পূরণের জন্য সন্তান জীবনের চেয়ে পড়ালেখাকে বেশি গুরুত্ব দেয় কেবল এইজন্য যে, সে একদিন সে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সে তার জীবনের মূল্যবান ২০-২৫ বছর কেবল আনন্দহীনভাবে কাটিয়ে দেয়। কী লাভ এতে? শেষ পর্যন্ত কী কিছু হয়, বিশেষ করে এই দেশে!

এবার একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করি-

পৃথিবীটা এখন কেবল সভ্যতা নিয়ে চিন্তা করে। উন্নত থেকে উন্নততর হওয়ার চিন্তা করে। এই যে যারা ডাক্তার, তাদের জীবনে আনন্দ বলে কিছু আছে বলে মনে হয় না। এটা ঠিক যে তারা অনেক অর্থ আয় করে। তাতে কী! চোর তো চুরি করেও অর্থ কামায়। পার্থক্য কেবল সম্মান, আর এই সম্মান জিনিসটাই মানুষকে নিজের জীবনের মমার্থ বুঝতে বোঝা করে দিয়েছে।

একটু গবেষকদের কথাই চিন্তা করি, তারা তো এক জাতীয় আঠা, যার কারণে হয়তো কখনো কখনো তারা নিজেদেরও চিনতে পারে না। যেমন: পদার্থ নিয়ে যারা গবেষণা করে $E=mc^2$ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে করতেই তাদের জীবন চলে যায়। ঠিকই বিশ্লেষণ করে ফেলে কিন্তু তা নিজের জীবনের বিনিময়ে।

এবার একটু গ্রামের মানুষদের কথা চিন্তা করি। হয়তো তাদের জীবন সাধারণ। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম। কেননা প্রকৃতি যেমন তাদের টানে তেমনি তারাও প্রকৃতির যত্ন করে। ঠিক যেমন একজন গবেষক, ডাক্তার বাঁচে, একজন গ্রামীণ মানুষও বাঁচে। কিন্তু পার্থক্য একটাই বাস্তবতার অবাস্তব দর্পণকে শহরের মানুষরা ধরতে পারে না। কেবল কৃত্রিমতা দেখতে দেখতে জীবনটাই চলে যায়।

এই ছোট একটা কথা আমার মনের মধ্যে অনেক দিন জমা ছিল। কিন্তু দুঃখ, আজও তার কারণ বুঝা হল না।



বিকৃত বাঙালিয়ানা

রাহাত বিন সালাম

কলেজ নম্বর : ১০৯২৮

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (দিবা)

– আমি বাঙালি।

– আমি গর্বিত, আমি বাঙালি।

– গর্ব করার মতোই জাতি আমরা। কী নেই আমাদের?

– শত শত অপরিবর্তিত প্রকল্প, হাজারো দরিদ্র মানুষ, লক্ষ লক্ষ সমস্যা আর কোটি কোটি জনসংখ্যা। আমাদের এত সমস্যা যে সমাধান করার আগে সমস্যাগুলো হিসেব করতে করতেই সমাধানকারীরা হাঁপিয়ে পড়েছেন। সকল সমস্যার মূলে রয়েছে আমাদের তথাকথিত আধুনিক সমাজব্যবস্থা। আমাদের সমাজব্যবস্থা যতটা আধুনিক, ঠিক তার চেয়ে একটু বেশিই অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। আমাদের সমাজব্যবস্থা শিথিয়েছে কীভাবে নিজেদের সফলতা ভুলে অন্যের ব্যর্থতায় খুশি হতে হয়। কীভাবে নিজেদের ব্যর্থতা

ভুলে অন্যের সফলতায় কষ্ট পেতে হয়। অর্থাৎ অন্যের ব্যর্থতাকে নিজেদের সফলতা আর অন্যের সফলতাকে নিজেদের ব্যর্থতা হিসেবে গ্রহণ করতে শিখিয়েছে আমাদের এই আধুনিক সমাজব্যবস্থা। অন্যের কাজের উপর যে আমাদের হাসি-খুশি, দুঃখ-বেদনা কতটা নির্ভরশীল তা আমাদের শিক্ষাজীবনের উপর নজর দিলেই বুঝা যাবে। আমরা পড়ালেখা করি জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, বরং পাশের বাড়ির অমুক আর বিদ্যালয়ের তমুকের চেয়ে বেশি নম্বর পেতে। আমরা যত কম নম্বরই পাইনা কেন, পাশের বাড়ির অমুক যদি তার চেয়েও কম নম্বর পায় তবেই আমরা খুশি। আবার, আমরা যতই বেশি নম্বর পাই না কেন, বিদ্যালয়ের তমুক যদি তার চেয়েও বেশি নম্বর পায় তবে আমাদের কষ্টের সীমা থাকে না। এইসব আমরা শিখেছি আমাদের অভিভাবকের কাছ থেকেই। স্কুল কলেজে দেখা যায়, অভিভাবকরা সারা বছর উদাসীন থাকলেও ফলাফলের দিন হাজির হয়ে নিজেদের সন্তানদের ফলাফল খেয়াল করার আগে দেখেন যে, অমুকের ছেলের ফলাফল কী? আর তমুকের মেয়ের ফলাফল কী? এইসব দেখতে দেখতে যখন তারা হাঁপিয়ে পড়েন, তখন তারা নিজেদের সন্তানদের ফলাফলের উপর নজর দেন এবং অমুকের ছেলে আর তমুকের মেয়ের ফলাফলের সাথে তুলনা করেন। আমাদের অভিভাবকরাই যদি এমন হন তবে আমরা তো তাদের মতোই হবো তাই না?

আমাদের সমাজব্যবস্থা আমাদেরকে “অনুকরণ” নামক আরেকটা শিক্ষা দিচ্ছে, যে শিক্ষায় আমরা প্রতিনিয়তই স্বশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত হচ্ছি। অনুকরণ করার ভিত্তিতে যদি ‘নোবেল’ বা বড় বড় পুরস্কার এবং বড় বড় উপাধি দেওয়া হতো, তবে বাংলার ঘরে ঘরে ‘নোবেল’ বা বড় বড় পুরস্কারের কোনো অভাব হতো না এবং আমাদের নামের পিছনে উপাধি লিখতে লিখতে কলমের কালি শেষ হয়ে যেতো। আমরা অনুকরণ করতে করতে এমন হয়েছি যে, যা দেখি তা ভালো না মন্দ বিচার করার আগেই অনুকরণ শুরু করে দেই। এই অনুকরণমূলক সমাজব্যবস্থার কারণে আমরা হারাচ্ছি নিজেদের পরিচয়মূলক অনেক বৈশিষ্ট্য। অনুকরণমূলক সমাজব্যবস্থা না হলে হয়তো এই বাংলাদেশে বেড়ে উঠতো হাজারো Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Jawed Karim. তবে এই অনুকরণমূলক সমাজেও আছে কিছু সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা সম্পন্ন মানুষ। তবে এই ধরনের লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। তাই তাদের কথা উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে যারা এই সমাজব্যবস্থার পক্ষে কথা বলেন তারা যে অনুকরণ করায় নোবেল বিজয়ী তাতে আমার সন্দেহ নেই। আর জনাব “Exception can’t be example”. ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে।

পোশাক পরিধানের দিক থেকে আমরা আরও বেশি অনুকরণপ্রবণ। বিদেশি সংস্কৃতি অনুকরণ করতে আমরা এতই ব্যস্ত থাকি যে, বাঙালি সংস্কৃতি কী আমরা তা বলতে পারি না বা বাঙালি সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিতে পারি না। বাঙালি পোশাক (ধুতি, পাঞ্জাবি, শাড়ি) পরা কাউকে দেখলে আমরা দু’বার তাকাইও না। তাকে ‘খ্যাত’ বলে এড়িয়ে যাই। কিন্তু কেউ যদি বিদেশি সংস্কৃতি অনুকরণ করে বিদেশি পোশাক পড়ে, তবে তার থেকে আমরা চোখ সরাতাই পারি না। মনে মনে ভাবি যে, পৃথিবীর সব স্মার্টনেস মনে হয় তারই মধ্যে।

আমাদের অন্যতম একটি স্বভাব হলো দ্বিমত পোষণ করা। কেউ কোনো মতামত দিতে দেরি করলেও তার মতামতের ভুল ধরে দ্বিমত পোষণ করতে আমাদের দেরি হয় না। আর অন্যের ভুল ধরতে বাঙালিদের চেয়ে কেউ এগিয়ে নেই। এই বিষয়ে আমাদের তুলনাই হয় না। এ কারণেই আমরা কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারিনি, আর কখনো পারবো বলে মনে হয়

না। যদিও অনেকেই মনে করেন দেশ স্বাধীনের সময় আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম। তবে এক্ষেত্রে আমি একমত নই। কেননা সকল বাঙালি যদি ঐক্যবদ্ধ থাকতো, তবে ‘রাজাকার’ নামক চরিত্র কাদের ছিলো? ‘রাজাকার’ রা কি বাঙালি নয়? তাই আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম তা বলা হয়তো যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে অধিকাংশ বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই সময়, তা বলা যেতে পারে।

আমাদের এই বাংলাদেশ ধীরে ধীরে তার পবিত্রতা হারাচ্ছে তথাকথিত আধুনিক সমাজব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা মানুষদের জন্য। তারা বাংলাদেশকে বানিয়েছে হাজারো ধর্মকের জন্মস্থান। এইসব অসুস্থ মস্তিষ্কের মানুষদের কাজের পিছনেও আধুনিক এই সমাজব্যবস্থার প্রভাব ব্যাপক। সবকিছু মিলিয়ে আমাদেরকে অসুস্থ মস্তিষ্কের, জ্ঞানহীন তবে আধুনিক জাতি ছাড়া আর কোনো কিছু বলে সজ্ঞায়িত করা যাবে না।

তবে যাই হোক, আমরা দিন দিন আধুনিক হচ্ছি। আমরা শিখছি কীভাবে প্রকাশ্যে করা অপরাধকে লুকাতে হয়। আমরা শিখছি যে কত কম বয়সী মেয়েকে ধর্ষণ করা যায়। আমরা আবিষ্কার করেছি রডের পরিবর্তে বাঁশ দিয়েও মেডিকেল কলেজ বানানো সম্ভব। পরীক্ষার আগে প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষা দিয়ে স্বর্ণময় ধনাত্মক এ অর্জন করে গর্বের সাথে বিশ্বকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমরা সব পারি। আমাদের এতো অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকা যদি আমি বাঙালি জাতি হিসেবে গর্ববোধ না করি, তবে জাতি কি আমায় মেনে নেবে? তাই আবারো বলছি, “হ্যাঁ, আমি গর্বিত, আমি বাঙালি”।



কর্তব্য

মোঃ রাইসুল ইসলাম

কলেজ নম্বর : ১০৮৩৮

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (দিবা)

দিন শুরু হয় ফজরের নামাজ আদায় করে। তারপর সে তার নাতিকে নিয়ে সকালে একটু বেড়ায় এবং মেয়ে তার জন্য রান্না করে। সে তার নাতিকে নিয়ে খাওয়া শেষ করে। তারপর সে কাজ করার জন্য ইটভাটাতে চলে যায়। আবার সারাদিন কাজ করে বাড়িতে ফিরে আসে। তার অনেক বয়স হয়েছে আর এই বয়সে কাজ করতে তার অনেক কষ্ট হয়। এই বৃদ্ধ লোকটি হলো আনোয়ার হোসেন। কিন্তু তার এরকম অবস্থা হওয়ার কথা ছিলনা। তার একটা বিরাট পরিবার ছিল। সে তার স্ত্রী, দুটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে নিয়ে সংসার করত। তার পরিবারটি ছিল মধ্যবিত্ত পরিবার। সে তার ছেলেদেরকে অনেক কষ্ট করে পড়ালেখা করিয়েছে। তার মেয়েদেরও সে শিক্ষা দিয়েছে। তার সন্তানদেরকে মানুষ করতে গিয়ে অনেক কষ্ট করেছে টাকা উপার্জনের জন্য। তার এই একা উপার্জনের টাকা দিয়েই তার সংসার চলত। তাদের লেখাপড়ার খরচও তার টাকাতাই চলত, অনেক সময় তার কাছে টাকা পয়সা থাকত না। তার পরিবারের তখন অনেক কষ্ট হতো। তাই দোকান থেকে বাকিতে খাবার আনত। যেন তার পরিবার কষ্ট না পায়। সে তার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতো। তার ছেলেমেয়ের সমস্যা সে সমাধান করার চেষ্টা করতো। এভাবেই কাটতে থাকে বছরের পর বছর। তার মেয়ে দুটোও বড় হয়ে যায়। সে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়। তার ছোট মেয়েটি ছিল একটু আধপাগলা ধরনের। তাই তার স্বামী তাকে

ও তাদের দুই বছরের ছেলেসহ ছেড়ে দেয়। ফলে সে বাধ্য হয়ে তার বাবার বাড়ি চলে যায়। এদিকে আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী মারা গেলে সে কষ্ট পায়। এর চেয়ে বেশি কষ্ট পায় যখন তার ছেলেরা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। কারণ ছিল তার বাবা তাদের ছোট বোনকে আশ্রয় দিয়েছে। এছাড়াও আরও অনেক কারণ ছিল। প্রধান কারণ হচ্ছে তারা তাদের বাবাকে সহ্য করতে পারত না। ছেলেরা তিনজনই শিক্ষিত ছিল। একজন ব্যাংকে চাকরি করত, একজন শিক্ষক ও একজন বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করত। তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের গ্রামে তিনতলা পাকা ভবন তৈরি করেছে। কিন্তু আফসোস তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানসহ এই বাড়িতে থাকে, তাদের বৃদ্ধ বাবা ও ছোট বোনকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। আনোয়ার হোসেন এখন তার আধপাগলা মেয়ে ও নাতিসহ বাসা ভাড়া করে থাকে। সে সারাজীবন কর্তব্যের সাথে কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছে। কিন্তু ফল কী পেল? এখনও সে এই বৃদ্ধ বয়সে ইটভাটাতে কাজ করে। আর মাঝে মাঝে আফসোস করে যে, সারাজীবন সে কাদের জন্য কষ্ট করেছে। যাদেরকে সে এত কষ্ট করে মানুষ করে তুলেছে তারা আজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদের বাবাকে ভুলে গেছে। বাবার প্রতি ছেলেদের যে কর্তব্য সেই কর্তব্য তারা ভুলে গিয়েছে। এমনকি তারা তাদের বাড়িতেও তাকে স্থান দেয়নি।

এরকম প্রচুর বাস্তব ঘটনা আমরা আমাদের চারপাশে দেখে থাকি। কিন্তু এটা কি আমাদের কর্তব্য? না, তা নয়, আমাদের জীবনের সবচেয়ে আপনজন হলো আমাদের বাবা-মা। আমরা আজীবন বাবা-মায়ের কাছে ঋণী। বাবা-মা যেমন কর্তব্য দিয়ে আমাদের বড় করে তোলে আমাদেরও উচিত, বাবা-মায়ের সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করি। আমাদের কর্তব্যটা যেন আমরা কখনোই ভুলে না যাই। নানা রকম মোহে পড়ে আমরা বাবা-মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করা। আমাদের কর্তব্য ভুলে যাই। যদি আমরা শিক্ষিত হই ও সচেতন হই তাহলে বাবা-মায়ের প্রতি যে কর্তব্য তা আমরা কখনোই ভুলবনা। কারণ বাবা-মায়ের মতো ভালোবাসা কেউ এই দুনিয়াতে দিতে পারেনা।



মধ্যবিত্তের ঈদ আনন্দ

মোঃ হুসাইন আহমেদ

কলেজ নম্বর : ১১০৪০

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ক (দিবা)

গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আয়ান। বাবা-মা ও এক বোন নিয়ে তার পরিবার। তার বাবা একজন কৃষক। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে তার বোন। গ্রামের একটি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র আয়ান। পড়ালেখায় বরাবরই সে অনেক ভালো। তাই বন্ধুদের মাঝেও তার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ধনী ছেলে। তাদের সাথে তাল মিলিয়েই চলে আয়ান।

সবেমাত্র রমজান মাস শুরু। সামনে ঈদ। ঈদের কেনাকাটা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত সবাই। আয়ান বাবাকে জানায় ঈদের বাজার করার জন্য ১০,০০০ টাকার প্রয়োজন তার। রমজানের প্রথম সপ্তাহ শেষ। তার বাবা তার হাতে ৮০০০ টাকা তুলে দিয়ে বলে বাবা এবারের মতো এই টাকাটাই রাখ আমার হাতে আর টাকা নাই। আয়ানতো ৮০০০ টাকা পেয়েই ভীষণ খুশি। সে

তার বন্ধুদের সাথে চুটিয়ে আড্ডা দেয়। সে এবার অনেক কিছু কিনবে। প্যান্ট, শার্ট, ঘড়ি, জুতা আরও অনেক কিছু। তার খুশি যেন আর ধরে না।

সারাদিন আড্ডা দিয়ে রাতে সে বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে সে তার বাবা-মায়ের কথা শুনতে পায়। তার মা তার বাবাকে বলছে, তোমার হাতে তো আর মাত্র ২০০০ টাকা আছে, তুমি এই টাকা দিয়ে কী কবরা? মেয়ের জন্য কিছু কিনতে হবে না? ঈদের দিন গায়ে দেবার মতো তোমারও কোন পোশাক নেই। ঈদের বাজারই বা কী দিয়ে করবে? তার বাবা বলল, তোমার কী কিছু আছে? সে কথা না হয় বাদ দাও। নীলদ্রির (আয়ানের বোন) জন্য কিছু কিনে নিয়ে আসব। হালকা বাজার করবো তাহলেইতো হলো। তার মা বলল তুমি না ঈদের দিন গোশত খেতে ভালোবাসো? তার বাবা বলল, দেখ আয়ানের মা, ছেলেই আমাদের ভবিষ্যৎ। ও ওর বন্ধুদের সাথে যদি তাল মিলিয়ে চলতে না পারে তাহলে ওর মন খারাপ হবে। পড়ালেখায় খারাপ করবে। ওর খুশিই তো আমাদের খুশি। তার মা বলল, ঠিক আছে তুমি যা ভালো মনে করো তাই করো।

এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিলো আয়ান। তার বাবা মায়ের কথাগুলো ভাবতে থাকে সে। সে সিদ্ধান্ত নেয় সে কাজ করবে। তার পাশের গ্রামের একটি বাড়িতে, কাজ শুরু করে আয়ান। সে সকালে সেহরি খেয়ে বের হয়, সন্ধ্যায় এসে ইফতার করে। তার মা তাকে প্রশ্ন করে সারাদিন কই থাকিস। সে বলে এই তো বন্ধুদের সাথে। ১৫ দিন কাজ করে ৫০০০ টাকা পায় আয়ান। তার বাবার দেয়া ৮০০০ এবং তার কাজের ৫০০০ মোট ১৩০০০ টাকা নিয়ে বাজারে যায় আয়ান। বাজারে গিয়ে প্রথমে তার মায়ের জন্য ২০০০ টাকা দিয়ে একটি শাড়ি কেনে। তার বাবার জন্য ২০০০ টাকা দিয়ে একটি পাঞ্জাবি। তার বোন নীলদ্রির জন্য ১৫০০ টাকা দিয়ে একটি জামা। তার নিজের জন্য ৩০০০ টাকা দিয়ে শার্ট, প্যান্ট ও জুতা। আর ২০০০ টাকা দিয়ে ঈদের বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরে সে।

বাড়ি ফিরে সে তার মায়ের হাতে বাজার ও শাড়ি, বোনের হাতে জামা এবং বাবার হাতে পাঞ্জাবি তুলে দেয়। বাকী টাকাটা তার বাবার হাতে তুলে দিয়ে বলে, এটা তোমাদের ঈদের খরচ বাবা। তার বাবা তাকে বলে, এসব তুই কোথায় পেলি? আয়ান সব খুলে বলে তার বাবা-মাকে। তার বাবা-মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকে।



অজানা আর্তনাদ

আবরার মাহির

কলেজ নম্বর : ১০৮২৯

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (দিবা)

দুদিন আগেও হয়তো এই গ্রামটি কারও কাছে পরিচিত ছিল না। কেউ হয়তো জানতও না এই গ্রামের অমীমাংসিত রহস্য। কারও সামনে আসতো না, যদি না সেখানে তমাল তার বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যেত।

শীতকালীন অবকাশ শুরু হতে বাকি আর মাত্র ২দিন। বেশ একটা উত্তেজনা কাজ করছে ক্লাসের সবার মধ্যে। স্কুল শুরুর ঘণ্টা বাজল। অন্যদিনের মতোই ক্লাসে ঢুকলেন কেবলাকান্ত স্যার। বয়স অনুসারে তার ভূড়িটা

একটি বেশিই বড়। ক্লাসে ঢুকেই হুংকার দিলেন। এমনিতেও তার ক্লাসে খুব একটা আওয়াজ হয় না। বেশ রাগী মানুষ তিনি। রোল কলের সময় পল্টু ঘুমাচ্ছিল। স্যার হঠাৎ রোল ডাকলেন পল্টুর রোল নং ৩৫, দুবার ডাকলেন। তাও পল্টু ঘুমের রাজ্যে বিভোর। পাশের বেঞ্চ থেকে তমাল পল্টুকে ফিসফিসিয়ে ডাকতে থাকল ‘ওই পল্টু উঠরে! কেবলা কিন্তু তোকে মেরে উল্টো বানিয়ে দেবে।’ কিন্তু সেই ডাক কী আর পল্টুর কানে যায়! কিছুক্ষণ পর হঠাৎ অনেক জোরে ঠাস্ ঠাস্ আওয়াজে পুরো স্কুল ক্যাম্পাস কেঁপে উঠল। বুঝতে নিশ্চয়ই বাকি নেই, কী হয়েছে।

টিফিন টাইম। তমাল, সুশান্ত, চয়ন বেঞ্চের উপর বসে আড্ডা দিচ্ছে। হঠাৎ তাদের সাথে যোগ দেয় রোগা পল্টু। এমনিতেই রোগা শরীর। তার উপর কেবলাকান্ত স্যারের ২ খাপ্পড়ে বেচারার মুখটা একদম শুকিয়ে গেছে। ওকে দেখে তমাল হঠাৎ বলে উঠে এন্ড চেষ্টা করেও তোকে তুলতে পারলাম না। কী ঘুমটাই না দিয়েছিল!

বাদ দে, যা হবার ছিল তাই হয়েছে। ঐ কেবলা যা খাপ্পড় দেয় না, তাতে মুখের ব্যথা গেলেও বুকের ব্যথা থেকেই যায়।

ওর এই কথা শুনে সবাই হাসতে থাকে। হাসে না শুধু চয়ন। কী জানি ভাবছিল সে। গভীর মনোযোগ দিয়ে। সুশান্ত হঠাৎ তাকে খোঁচা দিয়ে বলে উঠে, “কিরে চয়ন! চাঁপার কথা ভাবছিস বুঝি?” পুনরায় একটা হাসির রোল পড়ে গেল। চয়ন হঠাৎ চমকে বলে উঠে, “নারে দোস্ত, ভাবছি অন্য কথা।” আবারো খোঁচা মারে সুশান্ত, “চাঁপাকে নিয়ে কোথায় ঘুরতে যাবি তাই ভাবছিস বুঝি?” আবার সবাই হেসে উঠল। এই তোরা এবার থাম তো। এন্ড পচাশ না ছেলেটাকে, বলল তমাল।

দোস্ত, চলনা সবাই একসাথে কোথাও ঘুরতে যাই! হঠাৎ সকল নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠল চয়ন।

ও ঘুরতে যাবি! তো চল আমার দাদাবাড়িতে। ওখানে একটা পরিত্যক্ত জমিদার বাড়িও আছে। নানা কথা শুনেছি ওটার ব্যাপারে, বাড়িটা নাকি একটু ভৌতিক, তড়িৎ গতিতে জবাব দেয় সুশান্ত।

ভৌতিক? মানে ভূত? আমি যাব না ভাই, বলে উঠে চয়ন।

চয়ন একটু ভীতু প্রকৃতির ছেলে। পল্টু ওকে আরও ভয় দেখাচ্ছে। ধমক দিয়ে উঠল তমাল, থামা না এখন এসব। চয়ন, চল না, মজা হবে অনেক। সবাই একসাথে বলে উঠল, চল না চয়ন, চল। সকলের জোরাজুরিতে বাধ্য হয়ে চয়ন যেতে রাজি হলো।

স্ক্রপূর, একটা সাইনবোর্ডে সাদা রং দিয়ে লেখা। ঠিক সাইনবোর্ডের সামনেই সবাই গাড়ি থেকে গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটা দিল সবাই। পথিমধ্যে তারা দেখতে পেল একটি পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ি।

সুশান্তের চাচা আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। সুশান্তের দাদাবাড়িতে ঢুকতেই একটা রঙিন টিন দিয়ে তৈরি চৌচালা ঘর চোখে পরে। বেশ সুন্দর দেখতে ঘরটা। মোট ৪টা ঘর। আমাদেরকে থাকতে দেওয়া হলো উত্তর দিকের ঘরটাতে। রাতের খাবার খেয়ে অন্য সবাই ঘুমাতে যায়। আর দরজাটা বন্ধ করে ৪ বন্ধু বসায় আড্ডা।

রাত দেড়টা বাজে। হঠাৎ চয়নকে প্রকৃতি ডাক দিল। সুশান্তের দাদাবাড়িতে টয়লেট বাড়ি থেকে একটু দূরে। এমনিতেই চয়ন একটু ভীতু প্রকৃতির, তবু বাধ্য হয়ে হয়ে তাকে একাই যেতে হলো। কেউ যে তার সাথে যেতে রাজি হলো না। সবাই অবশ্য ইচ্ছা করেই রাজি হয়নি। মজা করতে চাচ্ছিল চয়নের সাথে। কিন্তু কে জানত, এই মজাই হয়ে দাঁড়াতে তাদের জন্য কালস্বরূপ।

অমাবস্যার রাত। চয়ন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে যেই বাড়িতে আসছিল ঠিক তখনই তার নজর যায় জমিদার বাড়ির দিকে। একটু পাশেই জমিদার বাড়ি। একটা ভয়ানক আর্তনাদ সে শুনতে পায়। সে প্রাণপণে ছুটে বাড়িতে আসতে চায়, কিন্তু সে পারে না, তার পা যেন কেউ আকড়ে ধরে আছে। জমিদার বাড়িতে যেন এক অদৃশ্য আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান। শত চেষ্টার পরও সে পালাতে পারে না। জমিদার বাড়ির দিকে সে মনের বিরুদ্ধে এগিয়ে যায়। এক পা-দুই পা করে এগোতে থাকে। রাতের অন্ধকার ঢেকে দেয় চয়নকে। আর আকাশের কালো মেঘ স্ক্রপূরকে ঘিরে দেয় এক অজানা স্তব্ধতায়।

সারারাত খোঁজার পরও পাওয়া যায় না চয়নকে। ঢাকা থেকে পুলিশ ডগ স্কেয়াড নিয়ে আসে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দুপুর ১২টার দিকে হঠাৎ একটা হইচই পড়ে যায় সবার মাঝে। গ্রামের সব লোক জড়ো হয়েছে একসাথে। অবশেষে চয়নকে পাওয়া যায়। তবে তমালের সেই জীবিত বন্ধু চয়নের মতো নয়, ক্ষতবিক্ষত লাশ আকারে পাওয়া যায় চয়নকে। তমাল, সুশান্ত, পল্টু কাফনের কাপড় তুলে চয়নের লাশ দেখতে যায়। চয়নের চোখে তারা দেখতে পায় এক প্রকার চাপা আতঙ্ক। কেঁপে উঠে তিনজনের বুক।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এসেছে। রিপোর্টে লেখা শেয়াল বা নেকড়ে জাতীয় হিংস্র পশুর আক্রমণে চয়ন মারা গেছে। কিন্তু, আসলেই কী তাই? যদি তাই হয়, তবে চয়ন কার আর্তনাদ শুনেছিল? রহস্য থেকেই যায়, চয়নের মৃত্যু আর স্ক্রপূরের রহস্য।

আজও সবার মনে হয়, চয়ন আছে তাদের সাথেই। আর আর্তনাদ করছে তাদের কাছে, কেন এমন করলি? তোরা সবাই অপরাধী। মরবি, সবাই একদিন আমার হাতেই মরবি।



বুক রিভিউ :

কারাগারের রোজনামচা

মোঃ শাহ সাদ্দ মোরশেদ

কলেজ নম্বর : ১৬৭২১

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

কারাগারের রোজনামচা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৭। ‘কারাগারের রোজনামচা’ বইটির নামকরণ করেছেন শেখ রেহানা। বইটির ভূমিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, “ভাষা আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা অর্জনের সোপানগুলি যে কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এগুতে হয়েছে তার কিছুটা এই কারাগারের রোজনামচা” বই থেকে পাওয়া যাবে।” ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি জেলে থাকেন। সেই সময়ে তার লেখা ডায়েরির কিছু অধ্যায় এই বইটিতে প্রকাশ পেয়েছে। একজন মানুষ হিসেবে তাঁরও একটি পরিবার ছিল, স্ত্রী এবং সন্তান ছিল। তাহলে জেলের সেই দিনগুলি কেমন করে কাটাতেন বঙ্গবন্ধু? সেই ধারণা কিছুটা হলেও পাওয়া যাবে বইটিতে। লুদু ওরফে লুৎফর রহমান নামের কারাবন্দি বা বঙ্গবন্ধুর একাকীভেদর সঙ্গী হলুদ পাখির কথাও বঙ্গবন্ধু তাঁর লেখায় চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জেলখানায় পাগলাগারদের কাছের সেলে তাঁকে রাখা হয়েছিল। সেই পাগলদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার বর্ণনাও আমরা এখানে পাব। তবে মনকে সবচেয়ে বেশি ছুঁয়ে যাবে ছোট্ট রাসেলের কথা পড়লে। সে বাবাকে না পেয়ে মাকেই আব্বা

বলে ডাকতে শুরু করেছিল। কারাগারকে সে ধরে নিয়েছিল বাবার বাড়ি। এই বইটি পাঠকদের মনে কারাগার সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করবে। থালা-বাটিকে সম্বল করেই বঙ্গবন্ধু কাটিয়েছিলেন কারাগারের সেই দিনগুলি। নতুন প্রজন্মের কিশোর হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে জানতে এই বইটি আমাদের সাহায্য করবে। ঐতিহাসিক ৬ দফার পরবর্তী সময়ের লেখা বলে বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনেক, এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতার উৎসকে খুঁজে পাব।



পোড়াবাড়ির অদ্ভুত ঘটনা

অমিত মাহমুদ সাকিব

কলেজ নম্বর : ১৬৮৯৭

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

ফটোগ্রাফির শখ আমার ছোটবেলা থেকেই। নেশা বললেও ভুল হবে না। তাই অনেক কষ্টে টাকা জমিয়ে কিনে ফেললাম একটা ছবি তোলার ক্যামেরা। আমি এবার শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। মাথায় যেহেতু ফটোগ্রাফির প্ল্যান আছে তাই এবার পূজোর ছুটিতে বাড়ি না গিয়ে অ্যাডভেঞ্চার করার পাশাপাশি ফটোগ্রাফি করার ডিশিমন নিলাম। কিন্তু আমার বেশির ভাগ বন্ধুই হিন্দু, তাই তারা পূজোর ছুটি গ্রামে কাটাবে। কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। আমার এক ছাত্র মেহেদীর সাথে কথাটা শেয়ার করতেই সে একটা দারুণ আইডিয়া দিল। মেহেদীর গ্রামের বাড়ি মদনপুরে। তাদের নাকি একটি পরিত্যক্ত বাড়ি আছে। কিন্তু সে জানালো, সেই বাড়ি গত দশ বছর আগে বিদ্যুতের শর্টসার্কিটের মাধ্যমে আগুন লেগে পুড়ে যায়। আমি বললাম, আমার কোনো সমস্যা নেই, গ্রামটি নাকি খুব সুন্দর। ফটোগ্রাফির জন্য আদর্শ। তাই আমি দেরি না করে ব্যাগ গুছিয়ে পরের দিন মদনপুরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশন থেকে বিকাল পাঁচটার ট্রেন ধরে রওনা দিলাম এবং সাড়ে সাতটার দিকে মদনপুরে পৌঁছালাম। স্টেশনে নেমে পাশের একটি চায়ের দোকানে গিয়ে ঐ বাড়ির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। মেহেদী বলেছিল, পোড়াবাড়ির কথা বললে সব বলে দিবে। দোকানি আমাকে লোকেশন বলে দিল এবং আসার সময় একটা অদ্ভুত কথা বলল। কিন্তু আমি কানে নিলাম না। লোকেশন অনুযায়ী পোড়াবাড়িতে পৌঁছালাম। বাড়িটি ছিল প্রাচীর ঘেরা একতলা বিল্ডিং। বাইরে থেকে দেখতে পরিত্যক্ত পোড়াবাড়ির মতোই দেখাচ্ছিল। সামনে গিয়ে দেখি বাড়ির প্রধান ফটকে তালা ঝুলছে। পরে মেহেদীর বাবার দেয়া চাবিটা দিয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে খুলতে পারলাম। ঘরে ঢুকে একটু হতবাকই হলাম, কারণ ঘরটা এতো পরিষ্কার ছিল যে, দেখলে বোঝাই যায় না যে, ঘরটা দশ বছরের পুরনো। আমি বাড়িতে ঢুকেই বাড়ির কিছু ছবি তুললাম। কারণ অদ্ভুত ঘটনাটা ভার্শিটিতে ফিরে সকলকে দেখাব। আসবাবপত্র বলে তেমন কিছুই নেই। সেই আগুনে সব পুড়ে গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু মেঝে পরিষ্কার ছিল। আমি সব ঘর খুঁজতে খুঁজতে শোবার যোগ্য একটি ঘর পেলাম যাতে একটি আধপোড়া চৌকি ছিল। স্টেশনে থেকে কিনে আনা খাবার খেয়ে বাকিটা মেঝেতে রেখে চৌকিতে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ক্যামেরায় তোলা বাড়ির ছবিগুলো দেখতে থাকলাম, কিন্তু শেষের ছবিটাতে দেখে আঁতকে উঠলাম। দেয়ালের এক কোণায় একটা মেয়েকে দেখতে পেলাম, কিন্তু ছবি

তোলার সময় কাউকে আমি দেখিনি। ছোটবেলা থেকেই আমি একটু বেশি সাহসী, তাই কাল ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করা যাবে ভেবে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে আরেক অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ করলাম। গতকাল রাতের এটো করা খাবারের বাটিটা পরিষ্কারভাবে ধোত করা ছিল। এবং বাকি খাবারটা উধাও। হঠাৎ মনে পড়ল দোকানির সেই কথাটা, এই বাড়িতে নাকি ভূত আছে, যে আশেপাশের মানুষের বাড়ি থেকে রাতের বেলা খাবার চুরি করে খায়। কাল রাতে এবং আজকালের ঘটনা থেকে এটুকু নিশ্চিত হলাম যে, আমি ছাড়াও বাড়িতে অন্য কারো উপস্থিতি রয়েছে। যে আমার ক্ষতি করবে না। তাই কৌতূহলবশত তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, “হ্যাঁ গো, শুনছো?” ধন্যবাদ আমায় সাহায্য করার জন্য। তুমি কি এখন কিছু খাবে? আমার ব্যাগে আরো খাবার আছে। ইচ্ছে হলে খেতে পারো।” কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো সাড়া এলো না। তাই আমি ফটোগ্রাফির জন্য বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামটা সত্যিই খুব সুন্দর যা কাল রাতে দেখতে পাইনি। সারাদিন ফটোগ্রাফি শেষ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলাম। সকাল বেলা ইচ্ছে করে কিছু খাবার বাহিরে রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু এসে দেখি গত রাতের মতোই খাবার উধাও। ঘটনাটি দেখে ভাবলাম, আজই ব্যাপারটা জানতে হবে। তাই আবার বলতে শুরু করলাম “তুমি কি রাতে খাবে? আমি কিন্তু বাহির থেকে ফেরার সময় কিছু খাবার নিয়ে এসেছি।” কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করার পর হঠাৎ দেখতে পেলাম দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা সুমধুর নারী কণ্ঠ শুনতে পেলাম। বলল, “কে তুমি? কেন এই বাড়িতে এসেছ?” আমি প্রথম আঁতকে উঠলাম কারণ আমি দেহহীন কারো সাথে এই প্রথম কথা বললাম। নিজেকে শান্ত করে উত্তর দিলাম, “আমি সিয়াম। তোমার নাম কী? তোমার এই অবস্থা কী করে?” সে কাঁপা কণ্ঠে উত্তর দিল, “আমার নাম তামান্না, গত দশ বছর যাবৎ আমি এই বাড়িতেই থাকি। বাড়ির মালিক আমার দূর সম্পর্কের চাচা হন। আমি আর আমার বাবা কিছুদিনের জন্য এখানে থাকতে আসি। কিন্তু এক রাতে বিদ্যুতের শর্টসার্কিটের মাধ্যমে সারা বাড়িতে আগুন লেগে যায়।” কিন্তু এসব আমি রাস্তায় লোকের মুখে শুনেছি। আমি আরও শুনেছি আমাকে নাকি ঐ রাতের পর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু পরের দিন ভোরে স্বাভাবিকভাবে আমি ঘুম থেকে উঠি এবং এই অবস্থা দেখি। আমি সবকিছু ধরতে পারি, সব কিছু করতে পারি কিন্তু কেউ আমায় দেখতে পায় না, তাই আমি ক্ষুধা পেলে কারো বাড়ি গিয়ে চুরি করে খেয়ে আসি।” আমি একটু বিস্মিত হলাম এবং আশ্বাস দিলাম যে শহরে গিয়ে তার জন্য কিছু করে ফিরব পরের দিন সকালে তার জন্য কিছু খাবার বের করে রেখে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যাবার পথে ভাবলাম, কত রহস্যময় ঘটনাই না ঘটতে পারে আমাদের এই পৃথিবীতে, যা আমাদের অজানাই রয়ে যায়।





বুদ্ধিমান রাজা

সাজিদ আহমেদ অপু

কলেজ নম্বর : ১০৬৫৪

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (দিবা)

কোনো এক দ্বীপে প্রচলন ছিল যে, সে দ্বীপের যে রাজা হবে তার মেয়াদ হবে চার বছর। অতঃপর তাকে এক নির্জন দ্বীপে ছেড়ে দেওয়া হবে। সেখানে খেতে না পেয়ে মারাও যেতে পারে। রাজা নির্জন দ্বীপে চলে যাওয়ার পরে ভোরে সমুদ্রের তীরে যাকে প্রথম দেখা যাবে পরবর্তী চার বছরের জন্য তাকে রাজা বানানো হবে।

তেমন এক সময়ে চার বছর মেয়াদপূর্ণ করা এক রাজাকে দ্বীপ থেকে বের করে দেওয়ার পরে ভোরে জাহাজ ডুবি হওয়া এক নাবিককে অচেতন অবস্থায় পেয়ে দ্বীপের জনগণ তাকে যত্ন করে সুস্থ করার পর রাজার আসন দেয়। নতুন রাজা রাজ্যের সকল নিয়ম-কানুন শুনে জনগণের উদ্দেশ্যে বলে, আমার রাজ্যের জনগণ হিসেবে তোমরা আমার আদেশ মেনে চলবে তো? সকলেই উত্তর দিল “হ্যাঁ মহারাজ, আপনার কথা মতো আমরা চলব। তখন ঐ রাজা তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাকে যে দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হবে তা জেনে ঐ দ্বীপে গাছপালা, শাকসবজি লাগানোর নির্দেশ দিল। জনগণের বসতি স্থাপনসহ দোকানপাট করার নির্দেশও দিল। রাজার নির্দেশ মতো প্রজারা সব কাজই সম্পন্ন করলো। ৪ বছর শেষ হওয়ার আগের দিন বর্তমান রাজা এক নৌকা নিয়ে সেই দ্বীপে চলে গেল যেখানে তাকে নির্বাসন দেওয়ার কথা ছিল এবং সেখানে রাজা হলো।



মুজিবনগর ভ্রমণ

মোঃ ফেরদৌস সরকার

কলেজ নম্বর : ১৬৮৮৫

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

“ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ” কথাটি শুনলেই আমার সেই মুজিবনগর ভ্রমণের কথা মনে পরে যায়। আজ পর্যন্ত অনেক ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করেছি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছিল মুজিবনগর ভ্রমণ। ২০১৬ সালের শুরু দিকে আমি তখন ক্লাশ নাইনে পড়ি। আমাদের কোচিং কমিটি ঠিক করল এবার শিক্ষা সফরে মুজিবনগর যাবে। কথাটা শুনে অনেক আনন্দিত হলাম, কারণ সেই ছোটবেলা থেকেই মুজিবনগরের ইতিহাস শুনে আসছি। তখন থেকেই দেখার আগ্রহ ছিল। দেখতে দেখতে যাওয়ার দিনটি আসল। সকালে সবাই বাসে রওয়ানা হলাম মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে। যেহেতু আমরা সিরাজগঞ্জ থেকে যাচ্ছিলাম তাই মুজিবনগরের পথে লালন শাহ সেতু অতিক্রম করতে হলো। সেতু পার হতে ডানদিকে তাকাতেই দেখলাম হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ব্রিজটি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। স্বাধীনতার ইতিহাস দেখতে যাওয়ার পথেই এর নিদর্শন গুলো দেখতে শুরু করলাম। চার ঘণ্টা ভ্রমণের পর আমরা গন্তব্যে পৌঁছলাম। আমাদের বাস থামল বিশাল এক আম বাগানে, বাস থেকে নেমে চারদিকে তাকিয়ে শুধু আম গাছই দেখতে পেলাম। এত বড় আম বাগান আগে দেখিনি। একটু দূরে দেখি আরো বড় আম বাগান। শুনলাম এই বাগানটিতেই নাকি মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছিল। একটু দূরে দেখতে পেলাম বিরাট প্রাচীর ঘেরা বিশাল জায়গা। সেখানে প্রবেশ করতেই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম। একি, এত বড় বাংলাদেশের মানচিত্র আছে! কিন্তু বাস্তবে যা দেখলাম তা আমার ধারণার অনেক বাইরে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে একাত্তরের যুদ্ধের সময়কালীন পুরো বাংলাদেশের অবস্থা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দেশের কোন স্থানে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে তার সবই মানচিত্রে মূর্তির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, শহিদ মিনার ভেঙে ফেলা, সীমান্ত এলাকা দিয়ে শরণার্থীদের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ আক্রমণ এসব কিছুই এতে তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে মানচিত্রটি দেখলাম। প্রাচীরের সামনে অর্থাৎ মূল জায়গায় স্থাপিত মূর্তিগুলো আরো আকর্ষণীয় ছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, মুজিবনগর সরকার গঠন, শপথ গ্রহণ, তাদের আলোচনা সভা, পাকিস্তানিদের ২৫ মার্চের নির্মম গণহত্যা, নারী ও শিশুদের ওপর অত্যাচার, বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেয়া, আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর এ সব কিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ নিজেকে সেই একাত্তরের সময়ে কল্পনা করলাম। পাশের একটা আম বাগানে মেলা দেখলাম। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ খেয়াল করলাম কিছু দূরে স্তম্ভ দিয়ে কিছু একটা তৈরি করা। কাছে যেতে বুঝতে পারলাম এটাই মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ। শুনে দেখলাম মোট ২৩ টি স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত এই সৌধ। কিছুক্ষণ থাকার পর গেলাম সীমান্ত এলাকায়। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত। সেখানেও মেলা বসেছে মেলা থেকে স্থানীয় কিছু সামগ্রী কিনলাম, সাথে সবাই একটা করে একতারা কিনলাম মুজিবনগরের স্মৃতিস্বরূপ নিয়ে যাওয়ার জন্য। আরো অনেক যোরাঘুরি করলাম চারদিকে। শুনলাম এসব মেলা নাকি সারা বছরই থাকে। থাকবেই না বা কেন। সারাবছরই কত লোক আসে এ স্থান দর্শনের জন্য। ঘুরতে ঘুরতে বিকেল হয়ে আসল। ওদিকে রান্নার কাজও শেষ। সবাই মিলে আম বাগানে বসে খাওয়া-দাওয়া করলাম। সন্ধ্যার দিকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মুজিবনগর ভ্রমণের স্মৃতিগুলো আমার মনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আরো জাগ্রত করে। এখানে এসে যা শিখেছি তা বই পড়ে কখনই শেখা হতো না। এখানে মিশে আছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিনই ভ্রমণটি আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে।



আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein)

মিতুল রহমান অন্তর

কলেজ নম্বর : ১৬৫৩৮

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (প্রভাতি)

Hermann Einstein-Pauline Koch জার্মানির এই দম্পতির প্রথম পুত্র ছিলেন আলবার্ট। তাঁর জন্ম ১৪ই মার্চ (বিখ্যাত পাই দিবস) ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে, জার্মানির উলম (ULM) শহরে। আলবার্ট আইনস্টাইন ছোট বেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী। বাল্য বয়স থেকেই বিদ্যালয়ে সবসময় প্রথম স্থান অধিকার করে আসতেন। বলা হয়ে থাকে, ৫ বছর বয়সে আইনস্টাইন প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলেন। তার বাবা হেরমান তাকে একটি কম্পাস দেখান। কম্পাসের কাঁটা সব সময় উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকার ধর্ম শিশু আইনস্টাইনকে অভিভূত করে। তিনি অসুস্থ অবস্থায়ই সেটিকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে আলবার্ট আইনস্টাইন সার্বিয়ান তরুণী Maric এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে ১৯১৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারা আলাদা হয়ে যান। সেই বছরেই ২ জুন আইনস্টাইন তার খালাতো বোনকে বিয়ে করেন। তবে ১৯২১ সালে আইনস্টাইন যে নোবেল পুরস্কার পান, তালাকের শর্তানুসারে তার সমস্ত অর্থ পান তার প্রথম স্ত্রী Maric। আইনস্টাইনের নোবেল পুরস্কারের বিষয়ে আমাদের অনেকের ভুল ধারণা যে, তিনি তার বিখ্যাত থিওরি অফ রিলেটিভিটি এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তবে তিনি আসলে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন 'আলোক তড়িৎ ক্রিয়া' (Photoelectric Effect) এর উপর তাঁর কাজের জন্য। আইনস্টাইন প্রচণ্ড রকমের চিন্তাশক্তির অধিকারী হলেও তার স্মৃতিশক্তি মোটেও ভালো ছিল না। একদিন আইনস্টাইন ট্রেনে চড়েছেন, চেকার এসে টিকিট দেখতে চাইলেন। কিন্তু আইনস্টাইন কিছুতেই টিকিট খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বিড়বিড় করে বলছিলেন, “কোথায় যে রাখলাম টিকিট টা...?” চেকার বললেন, “স্যার, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি, আপনি মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন, আপনি নিশ্চয় টিকিট কেটেই উঠেছেন, আপনাকে টিকিট দেখাতে হবে না।” আইনস্টাইন চিন্তিত মুখে বললেন, “না না! ওটা তো খুঁজে পেতেই হবে... না পেলে জানব কী করে আমি যাচ্ছিলাম কোথায়।” আইনস্টাইন মস্তিষ্ক তথ্য দ্বারা বোঝাই করা অপ্রয়োজনীয় মনে করতেন। তিনি বলতেন, “Why should I memorize something that I can easily get from a book?” বাহ্যিক চাকচিক্য এবং বিলাসিতায়ও তাঁর ছিল অনীহা। একটি ঘটনা এরকমঃ আইনস্টাইন তাঁর পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যাবেন, তার প্রথম স্ত্রী Maric তাকে ভালো কাপড় চোপড় পড়ে যেতে বললেন, আইনস্টাইন জবাব দিলেন, “আমি যাদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি, তারা আগে থেকে আমাকে চিনে। তাই ভালো পোশাক পরিধানের কোনো প্রয়োজন নেই” অন্য এক দিন আইনস্টাইন বড় এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যাবেন, সেদিনও তিনি জবাব দিলেন, “আমি যেখানে যাচ্ছি তাদের কেউ আমাকে চিনে না। তাই ভালো জামা পরিধানের কোনো মানে নেই।” ১৯৫২ সালের ১৭ই নভেম্বর। তিনি একটি চিঠি পান। আইনস্টাইনের জন্য ইসরায়েলের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার প্রস্তাব। তাঁর কাছে সুবর্ণ সুযোগ ছিল ইসরায়েলের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার, তবে তিনি রাজনীতিতে কখনোই আগ্রহী ছিলেন না। “Politics is for

present but an equation is for eternity,” তাই তিনি এই প্রস্তাব নাচক করে দেন। পত্র লিখে জানান, তার ইসরায়েলের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার সামর্থ্য ও ইচ্ছা কিছুই নেই। তিনি লিখলেন, “I am the more distressed over these circumstances because my relationship to the Jewish people has become my strongest human bond, ever since I become aware of our precarious situation among the nations of the world. I know a little of science but nothing about men.” তাই আইনস্টাইন খুবই মজার মানুষ ছিলেন। তাঁকে সবসময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিতে ডাকা হতো। তাঁর ড্রাইভারও সেসব লেকচার শুনত। একদিন আইনস্টাইন এরকমই বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন, পথে তাঁর ড্রাইভার বলল, স্যার আমি আপনার বক্তৃতা কমপক্ষে ৩০ বার শুনেছি। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আমি ছবছ আপনার মত বক্তৃতা দিতে পারব। আইনস্টাইন রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, “ঠিক আছে, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে কেউ আমাকে চেনে না। ওখানে যেয়ে, আমি আমার ক্যাপ তোমাকে পড়িয়ে দিব এবং তুমি নিজেকে আলবার্ট আইনস্টাইন হিসেবে পরিচয় দিবে।” তারপর যেই বলা সেই কাজ, ড্রাইভার সাজলো আইনস্টাইন এবং আইনস্টাইন সাজলেন ড্রাইভার, ড্রাইভার নির্ভুলভাবেই বক্তৃতা শেষ করল। কিন্তু বক্তৃতা শেষে এক প্রফেসর ড্রাইভার কে প্রশ্ন করে বলেন, যার উত্তর স্বাভাবিকভাবেই ড্রাইভারের জানা ছিল না। সে উত্তর দিল, “তুমি যে প্রশ্নটা করেছ, তা অত্যন্ত সহজ, তুমি আমার কাছে এত সহজ একটি বিষয় জানতে চাইলে দেখে অবাক হলাম। এর উত্তর তো আমার ড্রাইভারেরও জানা, সেই তোমাকে এই উত্তর দিয়ে যাবে।” তারপর ড্রাইভার অর্থাৎ আসল আইনস্টাইন এসে প্রফেসরের প্রশ্নের উত্তর দেন। [যদিও এই ঘটনার সত্যতার ভিত্তি দুর্বল] আইনস্টাইনের পছন্দের একটি বিষয় ছিল বেহালা বাজানো। তাঁর মা Pauline Koch তার ছেলেকে মাত্র ৬ বছর বয়স থেকেই বেহালা বাজানো শেখান। তারপর থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আইনস্টাইনের সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল বেহালা যন্ত্রটি। আইনস্টাইনের আরেকটি অভ্যাস ছিল Sailing বা পালতোলা নৌকায় ভ্রমণ। তিনি কখনো সাঁতার শেখেননি। তবুও নৌকা নিয়ে নদীতে ঘুরতে যেতেন। তিনি শেখানে নীরবে চিন্তা করতে ভালোবাসতেন। এই চিন্তা বা কল্পনা করার গুরুত্বের কথা তিনি সবসময়ই বলেছেন Imagination is greater than Knowledge. আইনস্টাইনের এতসব অভ্যাসের মধ্যে একটি বদ অভ্যাস ছিল ধূমপান, তিনি প্রায়ই পাইপ টানতেন। মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তার কর্মজীবনে The quantum theory of light, Brownian Movement, Special Theory of Relativity, The link Between Mass & Energy (E=mc²) ইত্যাদি কাজে বিশেষ অবদান রাখেন। photo electric এর উপর তাঁর কাজের জন্য ১৯২১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল, ৭৬ বছর বয়সে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই পদার্থবিজ্ঞানী ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি মারা যাবার পর তাঁর দেহ সমাহিত করা হলেও, তাঁর মস্তিষ্ক এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। লেখাটি শেষ আলবার্ট আইনস্টাইনের একটি উক্তি দিয়ে, Everybody is a genius but if you judge a fish by its ability to climb tree, it will live its whole life believing that it is stupid”



মা

মোঃ ফজলে রাব্বি নিহাজ

কলেজ নম্বর : ১০৭৯০

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (দিবা)

পৃথিবী ধীরে ধীরে যন্ত্রনির্ভর হচ্ছে। তাই সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে সেই যন্ত্রনির্ভরতার ছোঁয়াটা আমাদেরও লেগেছে। আমাদের আবেগগুলো আজ অনেকটাই লোকদেখানো হয়ে গেছে। আদর, স্নেহ, ভালোবাসাগুলো খুবই কম সময়ের জন্য কাছে আসছে; যা আবার আমরা বুঝতেও পারি না।

গত পূজার ছুটিতে কলেজের হাউস থেকে বাড়ি ফিরলাম। বাসায় ঢুকতেই মা বলে উঠল, “বাবা এসেছিস, আয় কতদিন পর তোকে দেখলাম, কেমন আছিস?” কথাগুলো তখন ভ্রমণের ক্লান্তির নিচে চাপা পড়ে গেল। ধীরে ধীরে দিন কাটতে লাগল। পূজার ছুটি ছিল আট দিন। চতুর্থ দিন বিকালবেলা মা বলল, “বাবা, চল তোকে নিয়ে ঘুরতে যাই, তুই ওখানে যাবার পর তোর ছোট ভাইকে নিয়েও আর বেরোনো হয়নি। আমি বললাম “মা, প্লিজ! বিরক্ত কোরো নাতো এই মাত্র মোবাইলে সিনেমাটা দেখা শুরু করলাম।” মা কিছু বলল না। চুপটি করে ঘর থেকে বেরিয় রান্নাঘরে চলে গেল। যেদিন বাড়ি থেকে চলে আসব তার ঠিক একদিন আগের ঘটনা। মা আমার কাছে এসে বসলেন এবং বললেন, “বাবা, তোর যা যা প্রয়োজন ছিল তোর আক্সুকে দিয়ে আনিয়েছি। তোর কি আরো কিছু লাগবে?” আমি তখন ফেসবুকে চ্যাটিংয়ে ব্যস্ত, “আর কিছু লাগলে বল আমি আনিয়ে দিচ্ছি।” এবার ধমকের স্বরে বলে উঠলাম, “বললাম তো না। শুনতে পাওনি।” মা চলে গেলেন। বাড়ি হতে ফিরে আসার আগের রাতে মা রান্নাঘর থেকে ডাক দিলেন। আমি গেলাম। তিনি বললেন, “বাবা কালতো তুই চলে যাবি, আজকে একটু আমার সাথে বসে কথা বল।” আমি তখন মোবাইলে গেইম খেলতে খেলতে বললাম “ধুর, দিলে তো মনোযোগটা নষ্ট করে, আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।” এই বলে চলে এলাম। বাড়ি থেকে ফিরে আসার দিন মা বাসে উঠিয়ে দিতে গেলেন আমাকে, বাসে উঠানোর সময় ব্যাগের হাতলটা ছিড়ে ব্যাগটা পরে গেল মার হাত থেকে, আমি দেখলাম মা হাতলটা লাগানোর চেষ্টা করছে। আমি বললাম, “ছেড়ে দাও মা, কিছুক্ষণ পর আবার বাস থেকে নামার পর ছিড়ে যাবে।” মা বলল, “দাঁড়া বাবা, এইতো হয়ে গেছে, আর একটু সময় দে” আমি আবার বললাম, “ছেড়ে দাও মা।” মা বলল “আরেকটু।” আমি রেগে গিয়ে “তুমি” বলে থেমে গেলাম। আমার রাগান্বিত মুখ দেখে মা ঘাবরে গেল। তারপর যাবার সময় আমার মাথায় হাত বুলিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠল, “নিজের খেয়াল রাখিস। ভালো থাকিস।” কলেজের হাউসে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। হাউসে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে ডাইনিং শেষ করে রাতে পড়তে বসলাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ল। ভাবলাম যাই মায়ের সাথে ফোনে কথা বলে আসি। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল যে, আমি এখন বাসায় নেই। আর হাউস থেকে সব সময় ফোনও দেওয়া যায় না, ভাবতে ভাবতে মায়ের কথাগুলো মনে পড়ছিল। হাউসের বাতিগুলো অফ হয়ে যাবার পরও আমি চিন্তা করতে লাগলাম, আজতো কেউ জিজ্ঞেস করে না “বাবা, কেমন আছিস,” আজ কেউ নিজ হাতে আমাকে খাইয়ে দিতে আসে না। আজতো কেউ বলে না, “বাবা আমার কাছে এসে বস।” আমার ভাবনাগুলো রাতের অন্ধকারে কারো না দেখা পানির মতো চোখ থেকে বেরিয়ে আসবে। আমি এখন মনে মনে রাতের আঁধারে একা একা বলছি, “আই এম সরি মা, পারলে মাফ করে দিও।”



বিরিয়ানি

সাদনান ইসলাম অয়ন

কলেজ নম্বর : ১৬৬৫৯

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (দিবা)

সুমন মগবাজারের একটি রেস্টোরাঁয় কাজ করে, ছোট বলে তার প্রধান কাজ টেবিল পরিষ্কার করা। মাঝে মাঝে কাস্টমারদের চা-পানি এনে দেয়, মালিক প্রতিদিন তাকে ১০ টাকা দেয়, ৮ টাকা দিয়ে সকালে চা বিস্কুট খায়। দুপুরে সকালের শক্ত রুটি শুধু খেতে দেয়, রাতে বাসি রুটির সাথে তরকারির বোল। সুমন স্টোর রুমে ঘুমায়। ঘুমাতে ঘুমাতে রাত ১২ টা সাড়ে ১২ টা বেজে যায়। উঠতে হয় ভোর ৫ টার আগে। এসব কথা মনে করে সুমনের খুব কষ্ট লাগে। বছর খানেক আগেও যখন তার মা ছিল, তখন কী আনন্দেই না তার দিন কাটত। হঠাৎ হার্ট এ্যাটাকে তার মা মারা যান। বাবা আর এক বিয়ে করে, সত্মা সুমনকে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। একটু এদিক সেদিক হলেই সত্মা সুমনকে গরুপেটা করত। তাই সে বাসা থেকে পালিয়ে আসে। সে দিনভর এখানে হাড়াভাঙা খাটুনি খাটে। একদিন দুপুর বেলা সুমন দেখে বাবা মার হাত ধরে একটা ছোট ছেলে রেস্টোরাঁয় এসেছে, বয়স দশ এগারো হবে। লোকটি সুমনকে ডাকল, “এই পোলা, এদিকে আয়।” সুমন লোকটির কাছে গেল। লোকটি জিজ্ঞেস করল, “কী কী আছে? সুমন বলা শুরু করল, “সাদা ভাত, মোরগ পোলাও, কাচি, তেহারি আছে। কী খাইবেন কন, একবারে গরম গরম।” লোকটি তিন প্লেট কাচির অর্ডার দিল, সুমন রান্না ঘরে গিয়ে বলে আসল, সে দেখল বাবু ভাই তিন প্লেট কাচি ঐ টেবিলে দিয়ে আসল। ছেলেটি খেতে চাচ্ছিল না, বাবা মা জোর করে ছেলেটিকে হাফ প্লেটের মতোন খাওয়ালেন, এরপর তারা হাত ধুয়ে বিল মিটিয়ে চলে গেল। সুমনের খুব কাচি বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছে করল, রাতে সে বাবু ভাইকে বলল, “ভাই একখান কথা কই?” কী কবি তারাতারি ক, আমার সময় নাই ঘুমামু, সুমন বলল “ভাই আমারে একপ্লেট কাচি বিরিয়ানি খাওয়াইতে পারবা?” বাবু ভাই রেগে বললেন, “এই কাচির দাম জানস? এক প্লেট ২৪০ টাকা তুই নিজে টাকা জমাইয়া খা।” “ভাই আমি তো প্রত্যেক দিন ২ টাকার বেশি জমাইতে পারুম না, টাকা জমাইয়া রাখুম কই?” বাবু ভাই হাসতে হাসতে বললেন, “হেইটা নিয়া তুই চিন্তা করিস না, তুই প্রত্যেক দিন ২ টাকা আমারে দিস, আমি আমার কাছে রাখুম, তখন কাচি খাইস।” আইছা ভাই, তুমি অনেক ভাল।” বলে সুমন তাকে জড়িয়ে ধরল। বাবু ভাই হাসতে লাগলেন। দুই দিন পর রাতের বেলা সুমনের খুব খিদে পেল। সে বলল, খাইতে দেন। মালিক বিড়ি টানছিল। বিরক্ত হয়ে বলল, “যা, আইজ তোর খাওন নাই” দুপুরবেলাও সুমন খেতে পারেনি, মালিক বলেছে, রুটি নাই এখন রাতের খাবারও দিচ্ছে না, সেও একটু গরম হয়ে বলল, “আইজকা তো কাচি বাঁচছে। একটু খাইতে দিলে কী হয়?” মালিক রেগে উঠল এবং বলল “ফইন্নির পুত আমার লগে গরম দেখাস, আইজকা তোর একদিন কি আমার একদিন” বলেই লোকটি রান্নাঘর থেকে গরম খুন্তি নিয়ে এসে সুমনের গায়ে ছাঁকা দিতে লাগল। সুমন ‘ও মাগো, ও মাগো’ বলে চিৎকার করছিল, কিন্তু তাকে কেউ বাঁচাতে এল না। অবশেষে লোকটি মার থামালো এবং লাথি মেরে সুমনকে বের করে দিল, বলল “আর কোনো দিন যেন তোরে এইখানে না দেখি” তারপর দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল। সুমনের পিঠ খুব জ্বলছিল, তার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তাই সে অলিতে গলিতে হাঁটতে থাকে, ভোর ৫ টার দিকে সে দেখে শাহবাগ

মোড়ে ৯-১০ জন মিছিল করছে। হঠাৎ তার চোখ গেল রাস্তার কোনে পড়ে থাকা বিরিয়ানির একটা প্যাকেটের দিকে, সে কাছে গিয়ে প্যাকেটটা তুলে নিল। প্যাকেটটা ভারী মনে হওয়ায় সে বেশি খুশি হলো, সে আশা করলো এতে নিশ্চয়ই বিরিয়ানি রয়ে গেছে, সুমন লক্ষ করল মিছিলটি তার দিকে আসছে আর একটি লোক তাকে সামনে থেকে সরতে বলছে, সে দু তিন কদম এগিয়ে প্যাকেটটি খুললো, অমনি মহা বিস্ফোরণ ঘটল, সুমনের ছিন্ন ভিন্ন দেহ রাস্তার কোনে পড়ে থাকল, লোকজন ছুটোছুটি করতে লাগল, খবরের কাগজে আর মিডিয়া চ্যানেলগুলোতে বলা হলো, শাহবাগ মোড়ে আন্দোলনকারীদের হটানোর জন্য এক জঙ্গি আত্মঘাতী বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়, এতে জঙ্গিটি ছাড়া আর কেউ হতাহত হয়নি। সুমনের বিরিয়ানি খাওয়ার সাধ তাকে জঙ্গি বানিয়ে দিল।



বাবা

শ্রাবণ রায়

কলেজ নম্বর : ১৬৫৮২

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (প্রভাতি)

কবি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে অনেকেই চারপাশে ঘোরে। আমিও সেই স্বপ্নের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিনি। অন্যদের মতো আমিও স্বপ্ন দেখি বড় হয়ে একজন নামকরা কবি হবো। এই স্বপ্নের হাত ধরেই কতজন যে কতরকমের লেখা লেখে তা মনে হয় হাতে করে গুললে অযথা সময় নষ্ট হবে। আমিও কিছু লিখেছি, আবার কিছু লেখা কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ করে ফেলে দিয়েছি ডাস্টবিনের মধ্যে। এই অনেক কিছু লেখলোথি হয়েছিল ঐ রাতে যার ফলে লেখার পরেও ‘বাবা’ সম্পর্কে কিছু না লিখে যেতে পারলে, আমার কিছু অপূর্ণতা থেকেই যাবে। আমি লিখছি আমার অনুভূতি দিয়ে সবার প্রিয় বাবার কথা।

‘বাবা’- এই শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ এবং অর্থ আমার জানা নেই। তা জানা না থাকলে ও ‘বাবা’- এই শব্দটির অর্থ ‘বিশ্বস্ত বন্ধু’ বললেও আমার মনে হয় কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা।

একটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে থাকেন বাবা-মা এবং সন্তান-সন্ততি। কিন্তু পরিবারের যে মেরুদণ্ড, যার উপর ভর করেই এই পরিবার টিকে আছে, সেই মহান মানুষটিকে মানুষ অনেক সময় ভুলে যায়, তার কথা অমান্য করে। এটা আসলে ঠিক নয়। কারণ, পরিবারের মেরুদণ্ডই যদি ভেঙ্গে পড়ে তাহলে সেই পরিবারের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোটা কঠিন হয়ে যায়।

নিজের সন্তানের জন্য থেকে শুরু করে তাকে নিজ পায়ে দাঁড়ানোর সামর্থ্য অর্জন করা পর্যন্ত একজন বাবা কঠোর পরিশ্রম করে। ছোট শিশুর হাঁটতে শেখা, কথা বলতে শেখা, সবখানেই বাবার অসীম অবদান রয়েছে। একটি পরিবার যেখানে যে বাড়িতে বসবাস করে সে বাড়ির ছাদ যতই দামীদামী ইট-পাথর নুড়ি দ্বারা তৈরি হোক না কেন, সে নিজের বাবাই হয়ে দাঁড়ায় হাজারো সমস্যার সমাধান।

একটি গাছ যখন বেড়ে উঠতে উঠতে বর বৃষ্টিতে মচকে বা হেলে পড়ে যায় তখন তাকে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হয় যেন ভেঙে না পড়ে। ঠিক তেমনি



ভাবে যখন তোমার জীবনে নানা বিপদ-আপদ, নানা সমস্যার উদ্ভব হয়, তখন বাবাই খুঁটি হয়ে তোমাকে নতুন করে বাঁচতে শেখায়।

এই বাবা-ই গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে পাখার মতো, বর্ষাকালে তোমার মাথার উপড়ে ছাতা হয়ে থাকে। তোমার শরীরে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি, “রোদের আলো পড়তে না দিয়ে নিজে কষ্ট করে। তোমার জীবনের প্রত্যেকটি চাহিদা পূরণে বাবা নামের সেই মহান মানুষটি অস্তির হয়ে পড়ে। সব বাবাবাই নিজ সন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। যখন কোনো সন্তান ভালো কিছু কাজ করে তখন তার গর্বে বুক ফুলে উঠে। এই বাবা হয় তোমার হাসির কারণ আর সকল দুঃখ কষ্টের সমাধান।

বাগানের মালি যেমন তার চারাগুলোকে খুব যত্ন দিয়ে বড় করে তোলে, ঠিক তেমনি তার সন্তানের প্রতি একনিষ্ঠ কাজ করে। এই বাবা-ই পায়ের জুতোর মতো কাজ করে, যেন নিজ সন্তানের এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের উপর কোনো বিপদের ছায়া না আসে।

যার বাবা নেই, সেই হয়তো বোঝে, বাবা ছাড়া এই জীবন মাঝি ছাড়া নৌকার মতো। আসলে নিজের এই জীবনের ক্ষুদ্রসময়ে বাবার মূল্য কতটুকু বা বাবা হারানোর, বাবা না থাকার কী কষ্ট তা বাংলাদেশের খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী জেমস- এর ‘বাবা কতদিন কতদিন দেখিতে তোমায়’- এই গানটি না শুনলে হয়ত বোঝা যাবে না।

আসলে বাবাবা পাথরের মতোই। শত কষ্টবেদনার মাঝে নিজের অশ্রু লুকিয়ে রাখে। কখনো প্রকাশ করে না নিজের কষ্ট। তাই এই কষ্টসহ্যকারী মানুষটিকে আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা একান্তই কর্তব্য।

এই পৃথিবীর সব সন্তানের কাছে হয়ত তার বাবা প্রিয় নয়। তাই বলে তাদের কথা অমান্য করা, তাদের শ্রদ্ধা না করা একান্তই কাম্য নয়। বাবা তার সন্তানের ভালোর জন্যই বলে। তার সাথে কথা না বলা বা খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়।

কারণ দিনশেষে তিনিইতো আমার জন্মদাতা পিতা। তার হাত ধরেই তো আমাদের পথচলা, বেড়েওঠা।



You Can Change Your Life Too

যুবায়ের আহমেদ

কলেজ নম্বর : ১৬৫৯১

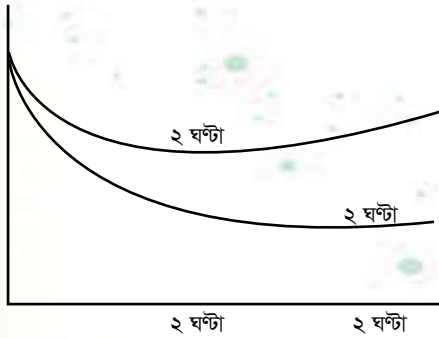
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : চ (প্রভাতি)

আপনি বলেছেন, দেখুন ভাই আমাকে দিয়ে সম্ভব না। আমি বলছি, বিশ্বাস করুন ভাই আপনাকে দিয়ে ততটুকু সম্ভব যতটুকু আপনি কল্পনাও করতে পারেন না।

প্রথমে আমি আপনার পড়ালেখা নিয়ে দুটো বিষয় বলব।

প্রথমত, অনেকে আছেন যারা দীর্ঘ সময় ঘরে পড়াশুনা করেন কিন্তু আউটপুট আশানুরূপ পান না। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মতামত হলো আপনি যখন পড়তে বসেন আপনার মনোযোগ হয় একটি প্যারাবোলা। অর্থাৎ প্রথম ও শেষ পর্যায়ে মনোযোগ থাকে সর্বোচ্চ এবং মাঝামাঝি মনোযোগ সবচেয়ে কম থাকে। এ হিসেবে কেউ দুই ঘণ্টা একটানা পড়লে তার মনোযোগ বা মনে রাখার হার বনাম সময় লেখচিত্র হবে—

৭০% পড়া মনে থাকার হার বা মনোযোগ

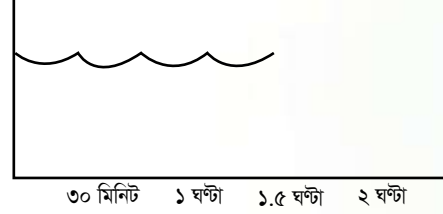


আর কেউ যদি তার মনোযোগ বেশি বজায় রাখতে চায় তাহলে তাকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

- প্রথমে একটানা দীর্ঘক্ষণ পড়া যাবে না। ৩০-৩৫ মিনিট পড়ার পর যদি ৩-৫ মিনিট বিরতি দেওয়া হয়। তাহলে আপনি আপনার মনোযোগ বজায় রাখতে পারবেন।
- আবার যদি ২ ঘণ্টা পর ৩০ মিনিট এর বিরতি দিয়ে পুনরায় পড়া শুরু করবেন।

তখন লেখচিত্র হবে—

৭০% মনোযোগ



এখন আপনি যদি বলেন, এভাবে অনেক সময় নষ্ট হবে তাহলে নিজে একবার চর্চা করেই দেখুন না।

দ্বিতীয়ত, প্রথমেই আপনাকে একটি কথা বলি যা আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।

আপনি প্রতি মিনিটে ২০,০০০ টি শব্দ পড়ার সক্ষমতা রাখেন (২০,০০০ শব্দ/মিনিট)। এখন আপনি যদি মিনিটে ২০০টি শব্দ পড়েন তাহলে আপনি আপনার সক্ষমতার মাত্র ১% ব্যবহার করছেন। আপনার নিউরনের মাত্র ১% পড়াশুনার কাজে ব্যস্ত, বাকি ৯৯% আপনার মনকে অন্য দিকে নিতে চাইবে।

বিষয়টি এরকম, কোনো একটি কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক আছে। একজন কাজ করতে চায় আর বাকিরা কাজ করতে চায় না। এ ক্ষেত্রে কারখানা যে রকম চলবে ঠিক সেরকম অবস্থা হয় যখন আপনি সক্ষমতার মাত্র ১% ব্যবহার করেন।

তাই আপনাকে আপনার পড়ার গতি বাড়াতে থাকুন। পড়ার গতি বাড়ানোর জন্য বইয়ের লাইনের নিচে কলম ধরে কলমটি বাম থেকে ডানে আপনার পড়ার গতির চেয়ে কিছুটা দ্রুত কলম চালিয়ে যান। এক্ষেত্রে আপনার প্রথমে পড়া বুঝতে কিছুটা সমস্যা হবে। কিন্তু দু'সপ্তাহের মধ্যে তা আপনি মানিয়ে নিতে পারবেন।

আবার, যারা মিউজিক পছন্দ করেন, তারা দ্রুতগতির মিউজিক ও গান কয়েক মিনিট শুনে পড়া শুরু করলে দেখবেন তুলনামূলক বেশি গতিতে পড়তে পারছেন। কারণ তখন দ্রুতগতির মিউজিক শোনার পর মস্তিষ্ক দ্রুত গতিতে কাজ করে। তাহলে আপনিই ঠিক করুন আপনি কীভাবে পড়াশুনা করবেন।

“স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে;
স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে
দেয় না।”

- এ পি জে আব্দুল কালাম



অন্য জগৎ

হোসাইন মোঃ ফাহিম

কলেজ নম্বর : ৯৮৭৩

শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ঘ (দিবা)

ফ্রিটের সাথে আমার যে দিন প্রথম পরিচয় হয়েছিল সেদিনই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ওর সাথেই ঘটবে। আমরা দুজনই একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে পড়া শেষ করেছিলাম। দুজনই পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। অসম্ভব ভালো রেজাল্ট করে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়েছিলাম। স্যাররা বলত আমাদের দুজনের মস্তিষ্কের নিউরন নাকি প্রকৃতি নিজের হাতে একটি একটি করে সাজিয়েছে। কাজেই যাই হোক ভালো গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পেতে আমাদের দুজনের কোনো পরিশ্রম করতে হয়নি। জেড নাইন নামের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটিতে চাকরি পাওয়ার পর আমরা ছিলাম সেই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা। কিন্তু আমাদের মাথায় ছিল ভয়ানক এক পরিকল্পনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় সেটা আমার মাথায় আসে। ফ্রিট আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু, তাই আমি পরিকল্পনাটি ওর কাছে বলি। সেটা শোনার পর ও আমার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তাতে ছিল অবিশ্বাস, তীব্র কৌতূহল ও কিছু করার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা। আমি ‘এম’ থিওরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্তটির প্রাকটিক্যাল প্রমাণের পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু পৃথিবীর তাবৎ তাবৎ বিজ্ঞানী বছরের পর বছর চেষ্টা করে সেটা পারেনি আমি একা সেটা কীভাবে পারব? তাই আমার আরেকজন দরকার ছিল। তার জন্য যাকে পেয়ে যাই সে ছিল ফ্রিট। ‘এম’ থিওরির প্র্যাকটিক্যালের শুরুটা কী হবে বিজ্ঞানীরা সেটাই জানত না। আমি অনেক চিন্তা করে একটা উপায় অনুমান করি আর ফ্রিটকে সেটা বলি। ফ্রিট প্রথমে আমার কথা বিশ্বাসই করতে চাইছিল না। এরপর আমরা আর দেরি করিনি। দুজনে মিলে কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। এর পরের তিন বছর আমরা মারাত্মক পরিশ্রম করেছি। একটি একটি করে প্রবলেম সলভ করেছি। অনেক ইউনিট খরচ করে যন্ত্রপাতি কিনেছি। বিনোদন বাদ দিয়েছি। খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছি। আমাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। পড়াশুনার পাশাপাশি গবেষণা চালিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন কাজ ছিল। তবুও আমরা থামিনি। হয়তো সেজন্যই সাফল্য শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতে ধরা দিয়েছিল। আমরা শুধু যে সাফল্য হয়েছিলাম তা না, অনেক ভালোভাবে সাফল্য হয়েছিলাম। এটা জানাজানি হলে পুরো পৃথিবীতে আমাদের নিয়ে হইচই পড়ে যেত। কিন্তু আমরা সে পথে যাইনি। পরীক্ষাগুলো আমরা নিজেরা করতে চেয়েছি। সেজন্য অনেক পরিকল্পনা করে আমরা জেড নাইন প্রতিষ্ঠানটিতে যোগ দিই। আমাদের বাকি কাজগুলোর জন্য সেখান থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আদায় করে নেয়া। যার জন্য আমাদের এত পরিশ্রম সেটা হচ্ছে ‘এম’ থিওরি। এটা ছিল বিংশ শতাব্দীর একটি বিতর্কিত থিওরি। এতে অনেক গাণিতিক অসংগতি ছিল। পরে অবশ্য সেগুলো দূর করা হয়। থিওরিটা ছিল অনেকটা এমন যে কোন একটা কিছুকে সত্যি বলে চালানোর জন্য যুক্তি হিসেবে অন্য একটা কিছু ধরে নেওয়া। কোয়ান্টাম ফিজিক্স আর থিওরি অফ রিলেটিভিটি। থিওরি দুটি যখন গড়ে উঠে তখন বিজ্ঞান অনেকাংশেই পূর্ণতা পেয়েছিল। একটি ছিল অনু-পরমানুর জগৎ

ব্যখ্যা করার জন্য, আরেকটি ছিল পুরো ইউনিভার্স ব্যখ্যা করার জন্য। কিন্তু সমস্যা হচ্ছিল দুটি থিওরি এক করা নিয়ে। দুটি থিওরির একটিকে দেখলে মনে হয় অপরটি কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না। কিন্তু এটা তো সম্ভব নয়। দুটি থিওরিই আলাদা আলাদা ভাবে সঠিক। এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য যে থিওরিটি আসে সেটাই ‘এম’ থিওরি। এটা একই সাথে কোয়ান্টাম ফিজিক্স ও থিওরি অফ রিলেটিভিটিকে ব্যখ্যা করতে পারে। ‘এম’ থিওরির ফর্মুলাগুলো সমাধান করে কিছু বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এটা অনুযায়ী আমাদের পরিচিত জগৎ ত্রিমাত্রিক নয়। এটা হচ্ছে দশ মাত্রার। শুধু তাই না। ‘এম’ থিওরি বলে যে ইউনিভার্সের মোট সংখ্যা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ হানড্রেডের বেশি। কিন্তু এর পুরোটাই ছিল গাণিতিক। কোনো বাস্তব প্রমাণ নেই। আমার সব পরিকল্পনা ছিল এটা নিয়েই। আমি বাস্তব প্রমাণ চাচ্ছিলাম। আমি আর ফ্রিট প্রচণ্ড পরিশ্রম করে কয়েকটা ফর্মুলা ডেভেলপ করি। ‘এম’ থিওরির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে প্যারালাল ইউনিভার্স। অর্থাৎ আমাদের ইউনিভার্সের পাশাপাশি ভিন্ন অথবা একই ডাইমেনশনের, ভিন্ন অথবা একই সময়ের বিলিয়ন বিলিয়ন ইউনিভার্স রয়েছে। আমাদের লক্ষ ছিল দুইটা প্যারালাল ইউনিভার্সের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করা। তার জন্য আমরা চরম একটা কৌশল বের করেছি। থিওরি অফ রিলেটিভিটি অনুযায়ী ভরবাহী কণা স্পেস-টাইমই বাঁকিয়ে দেয়। এখন ভর যদি কোন বিন্দুতে অসীম করা যায় তাহলে তাত্ত্বিকভাবে সেখানকার স্পেস সহজ কথায় ফুটো হয়ে যাওয়ার কথা। বস্তুটির ইভেন্ট হরাইজন অতিক্রম করলেই অন্য কোনো বস্তু কোনো একটা প্যারালাল ইউনিভার্সে চলে যাবে বলে আমরা ধারণা করেছি। অসীম ভরের জন্য প্রয়োজন অসীম শক্তি। তার জন্য আমরা ডার্ক ম্যাটার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বর্তমানে সব স্পেসশিপই ডার্ক ম্যাটার ড্রাইভ দিয়ে চলে। বায়ুমণ্ডলের বাইরে কোনো এক জায়গায় ডার্ক ম্যাটারের বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। এতে যে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হবে তা ভরে রূপান্তরের জন্য আমরা কিছু ডিভাইস তৈরি করেছি। কিন্তু একটা অনিশ্চয়তা রয়েছে। ফ্রিট হিসাব করে দেখেছে, শক্তি রূপান্তরে ত্রুটি না হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা মাত্র সাতাশ ভাগ যেখানে একটু ক্ষুদ্র ত্রুটিই সবকিছু ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কাজেই আমরা যদি সাফল্য হই তবে তার পুরো কৃতিত্বই হবে ডিভাইসগুলোর। ডিভাইসগুলো বিশেষভাবে তৈরি। এটা অতিক্ষুদ্র এনার্জি প্যাকেট মূহূর্তে কয়েক বিলিয়ন গুণ করে ফেলতে পারে আর সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শক্তিকে ভরে রূপ দেয়। কাজেই ডিভাইসগুলো ছাড়া প্রায় অসীম ভর পাওয়া চিন্তাও করা যেত না। আমাদের স্পেসশিপ সোজাসুজি ডার্ক ম্যাটারের বিস্ফোরণের দিকে এগিয়ে যাবে। ইভেন্ট হরাইজন সৃষ্টির সময় নিখুঁতভাবে হিসাব করে বার করা হয়েছে। যদি সেটা সৃষ্টি হয় তবেই যে আমরা একদম প্যারালাল ইউনিভার্সে চলে যাব সেটা নিশ্চিত নয়। কিন্তু যদি সৃষ্টি না হয় তবে আমাদের জীবন যে এ পর্যন্তই সেটা পুরোপুরি নিশ্চিত। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ফ্রিট সবগুলো যোগাযোগ মডিউল বন্ধ করে দিয়েছে। তার মানে মিসাইলগুলো ছাড়তে সে প্রস্তুত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফ্রিট, তুমি প্রস্তুত?

ও বলল, অবশ্যই।

আমি জোরে জোরে বললাম, ওকে। কমান্ড ইন ওয়ান, টু, থ্রি।

পুরো স্পেসশিপ কাঁপিয়ে মিসাইলগুলো ডার্ক ম্যাটারের দিকে এগিয়ে যাওয়া শুরু করল। সেগুলো টার্গেট করা সম্ভব হয়েছে তাদের চারদিকে ডিভাইসগুলোর ঘুরপাক খাওয়া দেখে। আটত্রিশ মিনিট পর বিস্ফোরণ ঘটল আর আমি ডিভাইসগুলো অন করে দিলাম। রূপান্তর শুরু হয়ে গেছে। আমাদের ইভেন্ট হরাইজনে ঢোকার আর তিন মিনিট বাকি। ফ্রিটকে বললাম,

– ফ্রিট সত্যিই তাহলে আমরা এটা করছি?

– অবশ্যই।

– এই সময়টুকু আমাদের জীবনের শেষ সময় হতে পারে। তাই না?

– হ্যাঁ। কিন্তু এখন সেটা ভেবে লাভ নেই। শুধু এটা জেনে রাখ যে আমরা যা করতে চেয়েছি তার সবই করতে পেরেছি। বাকি শুধু সফল হওয়াটা। সেটা আমাদের হাতে নেই। কাজেই এখন আর কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

– ঠিকই বলেছ। কিছুই যায় আসে না। তুমি সব সময় ঠিকই বল।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম। বায়ুশূন্য স্থান থেকে শব্দ কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে সেটাই বুঝলাম না।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম আমার স্পেসসুটের কম্পিউটার জানিয়ে দিচ্ছে এটা চরম বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এসেছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কন্ট্রোলরুম পুরোটাই ধসে গেছে। স্পেসশিপিটি স্থির। সম্ভবত গ্রহ জাতীয় কোনো কিছুতে ক্র্যাশ করেছে। ফ্রিটকে খোঁজার চেষ্টা করতেই পেয়ে গেলাম। কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে আমি কখনই এত বেশি চমকানি নি। ও প্রচণ্ড ভয়ানক দুষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এটা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?

ও কোনরকমে বলল, এখানে কিছু একটা আছে।

– কিছু একটা আছে মানে? কী আছে?

– কুৎসিত কিছু একটা। হঠাৎ করে আসে।

– আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কী আসে হঠাৎ করে?

– আমি জানিনা। আমার আর সময় বেশি নেই।

– মানে?

আবছা আলাতে খেয়াল করলাম ফ্রিটের কোমরের বাম দিক দিয়ে একটা রড বের হয়ে আছে। ওর স্যুট রক্ত বন্ধ করতে পারেনি। তাই অনেক রক্ত বের হয়েছে। ফ্রিট বলল, স্যুটের কম্পিউটার জায়গাটা শুধু অবশ করে দিতে পেরেছে। কিন্তু সত্যি কথা আমি আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকব না।

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। এত পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত আমাদের এই অবস্থায় পড়তে হবে সেটা ভাবিনি। স্পেসশিপের দেয়ালে জায়গায় জায়গায় বড় বড় ফাটল। বাতাসে বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ অনেক বেশি। ফ্রিটকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা ফ্রিট, তুমি যে বলেছিলে এখানে কিছু একটা আছে, সেটা কী?

– আমার কী মনে হয় জান? আমাদের দুজনের কেউ এখন থেকে বেঁচে ফিরতে পারব না। কাজেই আমি চাচ্ছি না তুমি একটা কুৎসিত স্মৃতি নিয়ে মারা যাও।

– কী উল্টাপাল্টা বলছ এসব! আমাদের কিছু হবে না।

– সেটা মনে হয় সম্ভব না।

হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হতে লাগল। সেটা উপর থেকে শুরু হয়ে নিচের দিকে আসতে থাকে।

আর তারপর হঠাৎ কন্ট্রোল রুমের মাঝামাঝি একটা কিছু দেখা দেয়। সেটা দেখে আমার সারা শরীর গুলিয়ে উঠল। কোন প্রাণী যে এত ভয়ানক কুৎসিত হতে পারে, সেটা আমি কখনো কল্পনাও করিনি। প্রাণীটা ক্রমাগত বড় হচ্ছে আর ছোট হচ্ছে। সেটা থেকে ক্রমাগত নানা আকৃতির শূঁড় বেরিয়ে আসতে থাকে আবার ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে। হিস্ হিস্ শব্দ করে প্রাণীটা থেকে হলুদ হলুদ রস ছিটকে পড়তে থাকে। এবার প্রাণীটা কন্ট্রোল রুমের ছাদের সমান বড় হয়ে গেল আর ফ্রিটের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকে। আর তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। প্রচণ্ড এক ধরণের আতঙ্কে আমার সারা শরীর ঠাণ্ড হয়ে আসতে থাকে। আমি কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেললাম। ফ্রিট বলল, আমি এটার কথাই বলছিলাম। হঠাৎ করে দেখা দেয়। তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমি কোনরকমে বললাম, কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব?

– জানি না। আমি জানি না।

– এত বড় একটা প্রাণী একটা বন্ধ জায়গায় হঠাৎ উপস্থিত হচ্ছে আর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি না এটা কীভাবে হতে পারে। আর এটা কেমন প্রাণী? আমার কল্পনাতেও কখনো এত বিস্মী প্রাণী আসেনি।

– আমারও না।

– ফ্রিট, আমি কোনভাবেই ভেবে পাচ্ছি না এটা কীভাবে সম্ভব! সারা জীবন বিজ্ঞানের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করে জীবনের শেষে এমন একটা ব্যাপার কি দেখা উচিত? নাকি এটা ইলিউশন?

– এটা ইলিউশন হতে পারে না। স্যুটের কম্পিউটারই ব্রেনে ইলিউশন হতে দেবে না।

– তাহলে এটা কী?

– আমি জানি না। আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে। আমি মনে হয় আর বেশিক্ষণ থাকব না। তোমার সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করে থাকলে মার্ফ করে দিও।

– না ফ্রিট। তোমার কিছু হবে না। দাঁড়াও আমি দেখি মেইন কম্পিউটার দিয়ে মেডিকেল রবোটগুলো চালু করতে পারি কি না।

কিন্তু উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম আমার দুই পা-ই একটা ফাটলে আটকা পড়ে আছে। অনেক চেষ্টা করেও উঠতে না পেরে তীব্র হতাশা নিয়ে ফ্রিটের দিকে তাকালাম। দেখলাম ফ্রিট একটা নির্লিপ্ত হাসি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর ঠিক তখনই আমি হঠাৎ করে বুঝে গেলাম সেই প্রাণীটা কি। কেমন করে সেই প্রাণীটা হঠাৎ করে এসে হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায় তা আমার কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেল। ফ্রিটকে বললাম, ফ্রিট জান, আমাদের গবেষণাটি ব্যর্থ হয়নি।

ফ্রিট কোনরকমে বলল, তাই নাকি? কীভাবে বুঝলে?

– আমরা এখন আমাদের ইউনিভার্সের কোন একটা প্যারালাল ইউনিভার্সে আছি।

– এটা কীভাবে বুঝলে?

– প্রাণীটার হঠাৎ করে আসা আর হঠাৎ করে অদৃশ্য হওয়া দেখে।

– বুঝিয়ে বল।

– আমরা ত্রিমাত্রিক জগতে থাকি। অসীম দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র পাশাপাশি যুক্ত হয়ে একটি নতুন মাত্রা তৈরি করে। সেটা হয় ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র। ঠিক সেভাবে অসীম ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র পাশাপাশি যুক্ত হয়ে চতুর্মাত্রিক ক্ষেত্র তৈরি করে। এভাবে মোট দশটি মাত্রা পর্যন্ত যায়। এভাবে এত এত মাত্রায়ুক্ত হয়ে মাত্র একটি ইউনিভার্স তৈরি করে। এরকম ইউনিভার্সের সংখ্যা টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ হানড্রেডের বেশি। আমরা এরকম কোনো একটি

ইউনিভার্সের অসীম সংখ্যক ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রের কোনো একটিতে থাকি। আমরা যে কাজটি করেছি এতে আমরা আমাদের ইউনিভার্সের কোন একটি প্যারালাল ইউনিভার্সে এসে পড়েছি। যে ক্ষেত্রে এসেছি সেটা শুধু ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র নয়। এটা একটা চতুর্মাত্রিক ক্ষেত্র!

- তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে...
- হ্যাঁ। সেই প্রাণীটা একটা চতুর্মাত্রিক প্রাণী। মাত্রার পরিমাণ এর বেশিও হতে পারে। কিন্তু আমরা কখনো সেটা নিশ্চিত হতে পারব না। কারণ আমরা ত্রিমাত্রিক প্রাণী।
- এখন বুঝলাম।
- হ্যাঁ। এখন এতে কোনো রহস্য নেই। প্রাণীটা যখন আমাদের ক্ষেত্র দিয়ে যায় তখন আমরা সেটাকে দেখতে পাই। সেটার পূর্ণরূপ কখনই আমরা একসাথে দেখতে পারব না। ব্যাপারটা অনেকটা এমন। ধর একটা বইয়ের এক একটা পৃষ্ঠা হচ্ছে এক একটা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র। আমরা দুইশ নম্বর পৃষ্ঠায় থাকি। এখন একটা তেলাপোকা আনা হল যেটা বইয়ের পৃষ্ঠা ফুটো করে যেতে পারে। ফুটো করে আমাদের পৃষ্ঠা অতিক্রম করার সময়ই শুধু আমরা সেটাকে দেখতে পারব। কিন্তু কখনোই পুরোটা একসাথে দেখতে পারব না। কারণ আমাদের সাপেক্ষে তেলাপোকাটি হবে চতুর্মাত্রিক প্রাণী।
- তার মানে এজন্যই প্রাণীটা ক্রমাগত বড়-ছোট হয়? সেটা আসলে শরীরের বিভিন্ন অংশের আকৃতি?

- হ্যাঁ।
- তার মানে আমাদের গবেষণাটি সফল হয়েছে? আমরা আসলে হার মানিনি?
- না আমরা এটা নিয়ে গর্ব করতে পারি। আমরা দুজন কোনো কাজেই ব্যর্থ হইনি।

এখন আমাদের কাজ হচ্ছে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। কোনোভাবে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা।

- প্রাণীটা যদি আবার আসে?
- আসলে আসবে, তাতে কী যায় আসে?

ঠিক তখনই আবার সেই আগের ভয়ানক আওয়াজটি শুরু হল। উপর থেকে নিচে। ফ্রিট বলল, এই দেখ, প্রাণীটা মনে হয় আবার আসছে। যদি কোনো ক্ষতি করে?

আমি বললাম, করবে না। এতক্ষণ যেহেতু করেনি, আর করবেও না। ঠিক তখনই ফ্রিটের একেবারে পাশে প্রাণীটার একটা অংশ দেখা দিল। সেটার মধ্যে একটা গর্ত তৈরি হয়ে ভেতর থেকে ধারালো দাঁত বেরিয়ে এল। আর সেগুলো দিয়ে প্রাণীটা এক কামড়ে ফ্রিটের শরীরের উপরের অর্ধেক ছিঁড়ে দুই ভাগ করে ফেলল। আমি দেখলাম লাল রক্ত ছিটকে ছিটকে পড়ছে। মেঝে রক্তে পুরো ভেসে যাচ্ছে। আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলাম। প্রচণ্ড আতঙ্কে আমার শরীর অবশ হয়ে গেল। প্রাণীটা এখন দাঁতগুলো বের করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সেগুলোতে এখনও ফ্রিটের রক্ত লেগে আছে।

পঞ্চম স্তবকের সপ্তম ক্ষেত্র দিয়ে যাওয়ার সময় দুইটা অদ্ভুত প্রাণী চোখে পড়ল। শরীরে মাত্র চারটা শঁড়। উপরে দুইটা, নিচে দুইটা। ভাবলাম একটু ভালো করে দেখব। এমন অদ্ভুত প্রাণী জীবনে দেখিনি। কিন্তু নতুন প্রাণী খাওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই খেয়ে ফেললাম। আমার আবার খাওয়ার প্রতি বৌক একটু বেশি।



আমার কলকাতা সফর ২০১৮

শাকিফ ইব্রাহিম রহমান

কলেজ নম্বর : ১৫৮৭৮

শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ছ (প্রভাতি)

মানুষ সাধারণত সফর করে থাকে তার একঘেয়ে জীবন থেকে কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পাওয়ার জন্য। বিশেষ করে যারা শহরকেন্দ্রিক, তাদের মধ্যে এই অভ্যাস বেশি লক্ষ করা যায়। ঠিক তেমনি আমিও আমার বাবা মায়ের সাথে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের City of Joy খ্যাত কলকাতা সফর করেছিলাম। যেটি ছিল আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় সফর।

আমরা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঢাকার কল্যাণপুর থেকে বাসযোগে সকাল ৮টায় যাত্রা শুরু করেছিলাম। যাত্রাপথে আমরা ফেরী পার হওয়ার সময় পদ্মা নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলাম। দুপুর নাগাদ আমাদের বাস পৌঁছায় মাগুরায়। সেখানে মধ্যাহ্ন বিরতি ছিল আমাদের। বিরতি শেষে বাস আবার যাত্রা শুরু করল এবং বিকেল নাগাদ আমরা যশোরের বেনাপোল সীমান্তে পৌঁছলাম। সেখানে কাস্টমসের সকল কার্যক্রম আমরা সম্পন্ন করলাম। তারই মাঝে আমাদের একটি নতুন জিনিস দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটি হলো সীমান্তের নো ম্যানস ল্যান্ডে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সমন্বিত বৈকালিক কুচকাওয়াজ। এরপর আমরা ভারতে প্রবেশ করলাম এবং সকল কার্যক্রম শেষে আমরা কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। রাত ৮ টার দিকে আমরা কলকাতার সল্টলেকে পৌঁছলাম।

আমরা সেখানে গিয়ে একটি হোটেলে ছিলাম, যেটি ছিল মিজা গালিব রোডে। সেখান থেকে আমরা পরের দিন ১৬ তারিখ বেরিয়ে পড়লাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখার জন্য। সেখানে আমরা মেমোরিয়াল হল পরিদর্শন করলাম এবং ব্রিটিশদের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস দেখলাম, যেগুলো সেখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। শুধু তাই না, সেখানে ঢাকার ঐতিহ্য জামদানি শাড়ি ও তখনকার দিনে কলকাতার সাথে বুড়িগঙ্গার মাধ্যমে ঢাকার সাথে যোগাযোগ, সেটিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এসব দেখে একটি জিনিস উপলব্ধি হলো, ইংরেজরা বহু বছর উপমহাদেশ শাসন করলেও রেখে গেছে তাদের স্মৃতিচিহ্ন। পরের দিন ১৭ তারিখে আমরা কলকাতা ময়দান এলাকা ঘুরেছিলাম। তার পরের দিন আমরা হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত জেমস প্রিন্সেপ ঘাট ও বাবুঘাটে গিয়েছিলাম, এই ঘাট দুটি মূলত হুগলি নদীর বাঁধ হিসেবে দেওয়া হলেও বর্তমানে এই স্থান দুটি দর্শনার্থীদের মূল আকর্ষণ। জেমস প্রিন্সেপ, তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নরের নামানুসারে এই স্থানের নাম এর পাশ দিয়ে চলে গেছে হুগলি নদীর ওপর অবস্থিত বিদ্যাসাগর সেতু। আমরা সকলে বেশ উপভোগ করেছিলাম এই স্থানটির সৌন্দর্য। ১৮ তারিখ আমরা হাওড়া ব্রিজ দেখেছিলাম, যা এই শহরের অন্যতম আকর্ষণ। তার পরের দিন ১৯ তারিখ আমরা মহাত্মা গান্ধী রোড হয়ে সেখানে অবস্থিত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছিলাম, যেটি এখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নামেও পরিচিত। সেখানে আমরা ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্ন দেখলাম। ২০ তারিখে আমরা কলকাতার ইডেন গার্ডেন, তার পাশে অবস্থিত ইডেন গার্ডেনস ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আকাশবাণী ভবন, রেড রোড ঘুরেছিলাম। কলকাতায় চলাচলের সময় আমাদের নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা হলো, মেট্রোরেল ও এই শহরের ঐতিহ্য ট্রামে যাতায়াত। কলকাতা সফরের মাধ্যমে আমাদের নতুন অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছিল।

সফর শেষে আমরা আবার বাসযোগে ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। এক কথায় বলতে গেলে, আমার এই সফর ছিল অসাধারণ, যে সফরের স্মৃতি আমি মনে রাখব আজীবন।



স্মৃতিতে ডিআরএমসি

খন্দকার সাজিদ আশফাক

কলেজ নম্বর : ১০১৯৩

শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ঘ (দিবা)



মায়ের স্বপ্ন পূরণ

মোঃ শাকিব হাসান জিতু

কলেজ নম্বর : ৯৭৭১

শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : চ (দিবা)

ভাগ্যের দ্বারা চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হয়, নাকি চেষ্টার দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তিত হয়, এই প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতো অনেক দিন। এই প্রশ্নের উত্তর আমার মন এবং বিবেক যা দিয়েছে তার দ্বারা কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেই আমার আব্বু আমাকে বললেন, “একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য কোন কোন কলেজের নাম দিব?” আমার আন্সুই প্রথমে বললেন যে, প্রথমেই ডিআরএমসি-র নাম দিতে হবে। যাই হোক, মানুষের জীবনের মূল প্রভাবক ভাগ্য না চেষ্টা সেই তর্কে আর নাই গেলাম আমার লেখার কলেবর ছোট রাখার প্রয়াসে। শুধু এতটুকু বলি যেভাবেই হোক আমি এখন ডিআরএমসি-র দ্বাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। পরিবেশের দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয় নাকি মানুষ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে তা নিয়ে তর্কিকদের তর্ক হতেই পারে তবে সদ্য এসএসসি পাশ করা এবং কৈশোর উত্তীর্ণ একজন ছাত্রের কল্পনার জগতকে ভেঙে দেওয়ার জন্য ডিআরএমসি-র ক্যাম্পাসের প্রথম দর্শনই যথেষ্ট। গ্রাম থেকে এসে ডিআরএমসি-র দিবা শাখার সিনিয়র উপাধ্যক্ষ মোঃ মনজুরুল হক স্যারের রুমে ধীর পায়ে কম্পমান হৃদয়ে ভর্তি ফরম সংগ্রহের জন্য যখন প্রবেশ করলাম তখনই বুঝলাম ডিআরএমসি-র এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ক্যাম্পাসের (যেখানে মায়াবী হরিণের চঞ্চলতা দেখার অব্যাহত সুযোগ রয়েছে) কাছে যান্ত্রিকতা পরাজিত হয়েছে। সুতরাং পরিবেশ মানুষকে প্রভাবিত করে এই যুক্তি অস্বত আমি এখন বিশ্বাস করি। তা না হলে এই ইট পাথরের শহরে যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছুটি’ গল্পের নায়ক ফটিক এক বিন্দু ভালোবাসার জন্য গ্রামে ছুটেতে চেয়েছে, সেখানে উপাধ্যক্ষ মোঃ মনজুরুল হক স্যারের অমলিন হাসি মুখের জিজ্ঞাসা কোন বিভাগে ভর্তি হবো বলা কীভাবে সম্ভব? বিজ্ঞান বলে আমরা সবাই ঘণ্টায় লক্ষ কি.মি. বেগে প্রতিনিয়ত ছুটে চলছি মহাকালের মহাগর্ভে বিলীন হওয়ার জন্য। ধর্ম বলে বিলীন হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আমাদের সবাইকে একদিন এক সুপার পাওয়ারের সামনে দাঁড়াতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষণ-অনুক্ষণের কৃতকর্মের হিসাব দেওয়ার জন্য, সেখানে সূর্য কেন্দ্রিক আবর্তন হবে বন্ধ। সময় হবে স্থির। যাই হোক নির্বাচনি পরীক্ষা যতই ঘনিষ্ঠ আসছে তত বেশি এই আশংকা আমার ভাবনার জগতকে ক্ষত-বিক্ষত করছে। আমি কি ডিআরএমসি-কে ভুলে যাব? অথবা ডিআরএমসি কি আমাকে মনে রাখবে? এই আশংকা আরও প্রবল হয় যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “পোস্টমাস্টার” গল্পের নায়কের কথা মনে পড়ে। কিশোরী রতনের জন্য মানবিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে ক্ষণিকের স্মৃতিকাতরতা কাটিয়ে পোস্টমাস্টার বলেছিল “ফিরিয়া লাভ কী, জগতে কে কাহার?” আমি নিশ্চিত জানি নতুনদের পদচিহ্ন ডিআরএমসি ক্যাম্পাসে একদিন আমার পদচিহ্ন মুছে দেবে। কবির ভাষায়—

“স্মৃতির পাতায় হারিয়ে যাওয়া,
একটি দুটি কুড়িয়ে পাওয়া,
রাত পেরিয়ে প্রভাত হলে
যখন আমি হারিয়ে যাব
ফেলে আসা জীবন তখন ডাকবে ফিরে আয়।”

প্রকৃতির নিয়মেই ফেলে আসা জীবনের ডাকে হয়তো আমি সাড়া দিতে পারব না। তারপরও নিরন্তর আশা করব জীবন যুদ্ধে জীবন নিয়ে সময় চক্রে তাল মিলিয়ে ছুটে চলতে। চলতে চলতে যদি আমি ক্লান্ত হই তখন ডিআরএমসি-র ক্যাম্পাসের স্মৃতি আমাকে শক্তি দেবে, প্রেরণা দেবে।

গ্রামের এক দুরন্ত ছেলে পবন। সেও আর পাঁচটা ছেলের মতো দুরন্তপনা দেখিয়ে বেড়ায়। তার বয়স ৬ বছর। সে তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তার বাবা ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের পিয়ন। আর মা ছিলেন গৃহিণী। তাদের পরিবারে ছিল চরম দরিদ্রতা। কোনমতে বাবার অল্প রোজগারে তাদের পেট চলতো। পবন যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়তো তখন তার বাবার মারাত্মক মরণব্যাপি দেখা দেয়। কিন্তু তার বাবার চিকিৎসা করানোর মত টাকা তাদের ছিল না। তার বাবা মারা যান। এতে তার ও তার মায়ের উপর নেমে আসে ভয়ংকর দারিদ্র্য। তারা অনাহারে থাকতে শুরু করল। পরে তার মা হাতের কাজ শুরু করেন। তার মা তার বাবার এমন মৃত্যু দেখে শপথ করেন যে তিনি তার ছেলেকে ডাক্তার বানাবেন। যাতে আর কারো বাবা, আর কারো স্বামী এভাবে চিকিৎসার অভাবে মারা না যান। পবন মায়ের দুঃখ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই সে নিয়মিত স্কুলে যেত। পড়াশোনার বাইরে যেটুকু সময় পেত সে সময় সে তার মাকে সাহায্য করত। সে মেধাবী ছিল। এভাবে কেটে গেল তিনটি বছর। এবছর পবন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণের টাকা তার মা কোনোভাবেই জোগাড় করতে পারছিলেন না। ফলে পবন অন্যের বাড়িতে গরু চড়ানোর কাজের মধ্য দিয়ে কিছু টাকা জোগাড় করে। আর সে মেধাবী হওয়ায় হেডমাস্টার কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেন, বিধায় পবন মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। সে জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করে। তার মা খুব খুশি হয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করেন। তার এমনই অবস্থা যে আনন্দের মুহূর্তেও তিনি তার ছেলেকে একটু মিস্তিমুখ করতে পারেননি। এবার পবন গ্রামেরই একটি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যায়। হঠাৎ তার মা অনেক অসুখে পড়েন। এতে তাদের আহ্বারের জোগান বন্ধ হয়ে যায়। পবন দিনরাত তার মায়ের সেবা করত। এক সময় তার মা খানিকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। ইতোমধ্যে পবনের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলে এসেছে। এবার তার মা আগেই টাকা জমিয়ে রেখেছিলেন। পবন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করল। এবার মেডিকলে পড়ার জন্য কোচিং করার মত টাকা তার ছিল না। এদিকে আবার পবনের মায়ের শরীর খারাপ। এ যাত্রায় পবনের মায়ের শেষ রক্ষা হল না। তিনি মেডিকলে ভর্তি পরীক্ষার দুদিন আগে পবনকে ছেড়ে চলে গেলেন। পবন অনেক ভেঙে পড়ল। কিন্তু সে তার মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে নিজেকে সামলে নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে টাকা মেডিকলে চাপ পেল। ফল পেয়েই সে তার মায়ের কবরের সামনে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, “মা, আমি পেরেছি তোমার স্বপ্ন পূরণ করতে। তোমার ছেলে ডাক্তার হবে।” এই বলে পবন অঝোরে কেঁদেই চলল। তার কান্নায় চারপাশের আকাশ যেন ভারী হয়ে উঠেছিল।



স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন

মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম

কলেজ নম্বর : ৯৯৯৩

শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ক (দিবা)

রাকিন, পুরো নাম আবরার মাহমুদ রাকিন। ছোট থেকেই একজন ভ্রমণপ্রিয় মানুষ। যেখানে অ্যাডভেঞ্চার সেখানেই রাকিনের পদচারণা। সে এবং তার বন্ধুরা মিলে দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সুন্দরবনে ঘুরে বেড়িয়েছে।

ডিসেম্বর মাস। শীতকালীন অবকাশ উপলক্ষে কলেজ ছুটি। তার মাথায় চমৎকার একটি প্ল্যান আসে। সে তার বন্ধুদের প্ল্যানটি জানায়। তারা এবার দ্য গ্রেট জঙ্গল মধুপুর ঘুরতে যাবে। বন্ধুরা এতে আহ্ববোধ করে। যথারীতি রাকিন তার বাবা-মাকে বিষয়টি জানায়। তারা রাজিও হয়। রাকিনের অপর চার বন্ধু ফাহাদ, সৌম্য, নাসির এবং অর্ক তাদের বাবা-মাকে রাজি করিয়ে ফেলে। অবশেষে তারা ২১ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে এবং মধুপুর গিয়ে পৌঁছায় দুপুরে। টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক রাকিনের বাবার বন্ধু। তিনি রাকিনদের জন্য মধুপুরে একটি বাংলা ঠিক করে দেন। তারা সেখানে ওঠে। সারা বিকেল তারা বিশ্রাম নেয়। সন্ধ্যায় তারা ঘুরতে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাতে দায়িত্বরত এক ব্যক্তি তাদের বেশিদূর না গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেন। লোকটি তাদের বলেন এখানে ডাকাতির ভয় আছে এবং এমনিতেই জায়গাটি ভালো নয়। তারা ইন্টের রাস্তা ঘুরে বাংলা থেকে পূর্ব দিকে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে তারা একটি পুকুরের পাশে আসে।

সেখানে তারা অনেক লম্বা একটি গর্জন গাছ দেখতে পায়। যার সাথে অনেক লতা-গুল্ম একসাথে জড়িয়ে খুবই ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। পুকুরটির চারপাশ কেমন যেন গা ছমছমে। এর মধ্যে অর্ক বলে, “কীরে দোস্ত, মধুপুরের গড়ে আসলাম কিন্তু বানর দেখলাম না, একি হয়?” এই বলে সে যখন ডানদিকে ঘুরেছে তখন দেখে অনেকগুলো ছোট বড় বানর তাদের পথ আটকিয়ে আছে। অনবরত কিচির মিচির শব্দে মহা শোরগোল বাধিয়ে ফেলেছে। যাই হোক অনেক কষ্ট করে তারা বানরের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে বাংলাতে ফেরার পথ ধরে। সৌম্য নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, “ক্যামনে সম্ভব, আমরা এখানে এসেছি মাত্র আধাঘণ্টা হবে, কিন্তু ঘড়িতে এখন রাত সাড়ে বারোটো।” একথা শুনে সবাই ঘড়ির দিকে তাকায় এবং লক্ষ্য করে যে সত্যিই রাত সাড়ে বারোটো। এক অজানা ভয় তাদের সবাইকে গ্রাস করে ফেলে। তারা সবাই প্রাণপণে হাঁটতে থাকে। অনেকক্ষণ হাঁটে কিন্তু মনে হয় তারা এক ঘোরের মধ্যে আছে। পথ ফুরোয় না। শীতের কাছাকাছি সময়। চারদিকের কুয়াশা বনের অন্ধকারকে আরও নিকষ কালো বানিয়ে ফেলেছে। তারা কোনদিকে চলছে তা বুঝতে পারে না। এতো স্তব্ধতার মাঝে তারা হঠাৎ করে শুনতে পায় কে যেন নূপুর পায়ে হাঁটছে। নূপুরের শব্দ তাদের এতোটাই ভালো লাগে যে তারা প্রত্যেকেই যে যার থেকে আলাদা হয়ে শব্দের উৎসের খোঁজ করে।

হঠাৎ রাকিনের চোখে পড়ে অদ্ভুত সুন্দর এক মেয়ে, যাকে পৃথিবীর কোন সৌন্দর্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এমন অপরূপা একটি মেয়ে আস্তে

আস্তে নূপুরের ধ্বনি বাজিয়ে সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। রাকিন কী করবে তা বুঝতে পারে না। কিন্তু এক অজানা টানে, অজানা মায়ায় মেয়েটির পিছন পিছন হাঁটতে থাকে। চলতে চলতে একসময় সে সেই গর্জন গাছের নিচে উপস্থিত হয়। হঠাৎ করে লক্ষ করে মেয়েটি নেই, কোথাও নেই। অনেকগুলো ছোট বড় বানর গাছ থেকে নেমে আসে এবং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় এবং চিৎকার করে উঠে। হঠাৎ সে অজান শব্দে। সবকিছু একদম স্তব্ধ হয়ে যায়।

রাকিন নিজেকে আবিষ্কার করে সে শুয়ে আছে, সে শুয়ে আছে তার বেডে। তার বাবা তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে তার কী হয়েছে। সে কিছুই বলতে পারে না। অস্ফুট উচ্চারণে শুধু বলে আমি মধুপুর যাব না। সেবারের মত রাকিন এবং তার বন্ধুদের আর মধুপুর যাওয়া হয় না।



কৌতুক-ধাঁধা-সাধারণজ্ঞান



তাইফ রহমান

কলেজ রোল : ১০২৪৮
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : গ (দিবা)

- ১ম বন্ধু : বলতো, সবচেয়ে চালাক জন্তু কোনটি?
২য় বন্ধু : এত অনেক সহজ প্রশ্ন। গরু সবচেয়ে চালাক জন্তু।
১ম বন্ধু : কীভাবে?
২য় বন্ধু : কথায় বলে, অতি চালাকের গলায় দড়ি আর গরুর তো সারাক্ষণই গলায় দড়ি থাকে।



ফারহান ইমরান সামি

কলেজ নম্বর : ১৬০৮৫
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : গ (দিবা)

- ১। শিক্ষক : বলতো, 'ছেলেটি গাছ থেকে পড়ে গেছে' এটা কোন পদ?
ছাত্র : স্যার, এটা বিপদ।
- ২। শিক্ষক : বলতো কাল কত প্রকার?
ছাত্র : পনের প্রকার স্যার।
শিক্ষক : (অবাক হয়ে) কী কী?
ছাত্র : ১. অতীত কাল, ২. বর্তমান কাল, ৩. ভবিষ্যৎ কাল, ৪. গ্রীষ্মকাল, ৫. বর্ষাকাল, ৬. শরৎকাল, ৭. হেমন্তকাল, ৮. শীতকাল, ৯. বসন্তকাল, ১০. ইহকাল, ১১. পরকাল, ১২. দিনকাল, ১৩. আজকাল, ১৪. গতকাল, ১৫. আগামীকাল।

৩। শিক্ষক বিজ্ঞান ক্লাস নিচ্ছেন-

- শিক্ষক : একটা ব্যাঙ কাটলে আমরা এ জিনিসগুলো পাব।
তাহলে বলতো একটা মানুষ কাটলে আমরা কী কী জিনিস পাব?
ছাত্র : (পিছন থেকে ছাত্র চিৎকার করে) স্যার, প্রথমে জেল, পরে ফাঁসি।



তাওহীদ জুবায়ের

কলেজ রোল : ১৬০৯৭
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : খ (প্রভাতি)

- মা : আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা।
ছেলে : হলো না, মা, এখন আর টিপ সই এর যুগ নেই।
তাই এখন বলতে হবে আয় আয় চাঁদ মামা স্বাক্ষর দিয়ে যা।



এ. এম. সাদমান হুক তাকি

কলেজ নম্বর : ১৫২৬৮
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)

- রনি ও বেলালের মধ্যে কথা হচ্ছে-
রনি : আমার বাবা গরু, ছাগলের লিভার, ব্রেইন এবং জয়েন্ট বিশেষজ্ঞ।
বেলাল : ওহ, সে কি পশুর ডাক্তার?
রনি : না, সে একজন কসাই।



আহনাফ মাহিব
কলেজ রোল : ১৫৩৩১
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : ক (প্রভাতি)

শিক্ষক :- ইংরেজিতে অনুবাদ করো,
“মাখন লাল সরকার, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর- এর মামা ছিলেন।”
ছাত্র : Butter red government was the double mother of god moon education sea.
শিক্ষক শুনে অজ্ঞান হয়ে গেলন।



কাজী মফতাহুল ইসলাম রাহিব
কলেজ নম্বর : ৯৪৪৯
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ (দিবা)

ক্রাস রুমে শিক্ষক পাণ্ডকে বললেন, শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত গুনতে।
পাণ্ড গুনতে লাগল, শূন্য, এক, দুই, তিন, চার, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ।
শিক্ষক বলল, পাঁচ বাদ দিলে কেন?
পাণ্ড বলল, মারা গিয়েছে স্যার।
শিক্ষক বলল, কীভাবে?
পাণ্ড বলল, গতকাল ইংরেজি খবরে গুনলাম যে, Five died in a car accident...



ফজলে রাব্বি সিফাত
কলেজ নম্বর : ১৫৩২০
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : ক (প্রভাতি)

১। মুচিওয়লা ও এক লোক-
মুচিওয়লা : ভাই আপনি আমার ডিম নিবেন,
একদম সতেজ।
লোক : দুগ্ধিত। আমার স্ত্রী মুরগির ডিম নিতে বলেছে
আপনার ডিম নয়।

২। এক বন্ধু আরেক বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন-
১ম বন্ধু : ভাই আমার মোবাইলে ফোন দেওয়া যায়না।
২য় বন্ধু : কেন কী হয়েছে?
১ম বন্ধু : ফোন দিলে একটা মেয়ে বলে যে ফোনে পর্যাণ্ড
পরিমাণ টাকা নেই।
২য় বন্ধু : হা,হা,হা।



সামীম আহনাফ তাহমীদ
কলেজ রোল : ১৫৩৪১
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)

বাবা : ওই মফিজ এখানে একটি ম্যাচের কাঠিও জ্বলছে না কেন?
মফিজ : বাবা আমি তো প্রত্যেকটা কাঠি জ্বালিয়ে দেখার পর এনেছি,
সব কাঠিইতো জ্বলে।



মিনহাজুল ইসলাম মাহিন
কলেজ নম্বর : ১৪৫১০
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : খ (প্রভাতি)

এক চোর বাসায় টিভি নিয়ে পালাচ্ছে, তার পিছনে পিছনে মালিকও দৌড়াচ্ছে-
চোর : ভাই আপনার টিভি নিয়ে যান।
মালিক : না, তুমি নিয়ে যাও। বউয়ের জ্বালায় শান্তিতে টিভি দেখতে পারি না।
চোর : তাহলে আপনি আসছেন কেন?
মালিক : ওমা! রিমোট দিতে।



ফখরুল আলম ফাহিম

কলেজ নম্বর : ১৫২০৩১৫

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ (দিবা)

১। আলভী ও দোকানদারের মধ্যে কথোপকথন-

আলভী : আঙ্কেল! একটি কলার দাম কত?

দোকানদার : ৫ টাকা।

আলভী : তিন টাকায় দিবেন?

দোকানদার : ধুর! গাধা! কলার খোসার দাম-ই তো তিন টাকা।

আলভী : তাইলে আপনি খোসা রেখে কলা ২ টাকায় আমাকে দিয়ে দিন।

২। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন-

শিক্ষক : বলতো পাখি কাকে বলে?

ছাত্র : যা উড়ে ও পালক আছে।

শিক্ষক : সাবাস! বাঘের বাচ্চা।

ছাত্র : স্যার! আমার বাবার নাম মদন পাল, বাঘ নয়।

শিক্ষক : আচ্ছা! পাখির উদাহরণ বল তো।

ছাত্র : মশা, মাছি ইত্যাদি।



মেহরাব হাসান মাহির

কলেজ রোল : ১৫১০৪১৬

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

জ্বীনের কাহিনি-

প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে প্লেনটি যাওয়ার সময় ক্রাশ হলো। মাত্র ৪ জন লোক বেঁচেছিল। হঠাৎ একটি জ্বীন সাগর থেকে উঠে এল, সে বলল আমি সবাইকে খেয়ে ফেলব। লোক ৪ জন বলল; ভাই আমাদের ছেড়ে দেন, আমরা অসহায়।

জ্বীন বলল : এক শর্তে, তোমরা যদি যে কোনো একটি জিনিস ফেলো, যদি সেই জিনিস তুলতে পারি তাহলে তাকে খেয়ে ফেলব।

অস্ট্রেলিয়ান : প্রথমে একটি হীরার আংটি ফেলল। কিন্তু লাভ হলো না হীরার আংটিটি তুলে এনে তাকে খেয়ে ফেলল।

আমেরিকান : সোনার দাঁত খুলে ফেলে দিল, কিন্তু তাতেও লাভ নেই, খেয়ে ফেলল।

ইটালিয়ান : সে ফেলল একটি ক্ষুদ্র বলপেনের পিন, জ্বীনটি সাথে সাথে উঠিয়ে এনে খেয়ে ফেলল।

বাংলাদেশি : সে ফেলল এক প্যাকেট স্যালাইন। স্যালাইনগুলো সাগরের পানিতে মিশে গেল, জ্বীন হাজার চেষ্টা করেও পায় না খুঁজে। কী আর করার, সে তাকে না খেয়ে চলে গেল।



রাদ চৌধুরী বর্ষ

কলেজ নম্বর : ১৫৪০১৪৬

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক (দিবা)

বইমেলায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কথা হচ্ছে-

ক্রেতা : আপনাদের স্টলে পিরামিডের ওপর লেখা কোনো বই আছে?

বিক্রেতা : না ভাই, আমাদের সব বই-ই কাগজের ওপর লেখা।



তাহমীদ আহমেদ স্বপ্ন

কলেজ নম্বর : ১৫০০০৯

শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : গ (প্রভাতি)

তিন বন্ধুর মধ্যে গল্প হচ্ছে-

১. ১ম বন্ধু : জানিস, ভূগোল সম্পর্কে আমার অনেক জ্ঞান আছে।

২য় বন্ধু : হুম। আমিও অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি। বরিশাল, নোয়াখালি, যশোর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সাভার, খুলনা-আর কত বলব?

৩য় বন্ধু : আরে তোরা আর কোথায় গেছিস? জানিস, আমি ভূগোলেও গেছি।



সামিউল ইসলাম

কলেজ নম্বর : ১০৫৬৩
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ক (দিবা)

- ১ম বন্ধু : দোস্তু তোর বাবার ব্যবসা এখন কেমন চলছে?
২য় বন্ধু : আর বলিস না, ব্যবসা এখন পা থেকে মাথায় উঠেছে।
১ম বন্ধু : এ আবার কেমন ব্যবসা?
২য় বন্ধু : বুঝলিনা, আগে করত জুতার ব্যবসা, আর এখন করে টুপির ব্যবসা।
২. ছেলে টাকা চেয়ে বাবাকে চিঠি লিখেছে “টাকা নাই টাকা নাই, ইতি কানাই”।
বাবার উত্তর, “এবার আমার বড় চাপ, টাকার অভাব, ইতি তোর বাপ”।



রহমত উল্লাহ

কলেজ নম্বর : ১৫৪২৯
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : খ (প্রভাতি)

- একদিন তিন বন্ধু নদীর পাড়ে বসেছিল।
হঠাৎ করে তাদের মধ্যে একজন কবির স্বরে বলে উঠল-
মনটা করে উড়ু উড়ু।
আরেক জন বলল : আকাশটা করে গুড়ু গুড়ু।
আরেক জন বলল : আমরা নদীর পাড়ে বসে আছি তিন গরু।



মুশফিক সাজিদ হাসান

কলেজ রোল : ১৩৬০৮
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : খ (প্রভাতি)

১. এক লোক সেলুনে গেছে।
তোমাদের রেট কেমন?
চুলকাটা বিশ টাকা, শেভ দশ টাকা।
তাহলে আমার চুল শেভ করে দাও।
২. এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলছেন-
অবসর সময় গোসল করা উচিত।
পাগল হয়েছেন? অবসর নেব আমি সেই ৫৫ বছর বয়সে।
৩. আদালতে বিচার চলাকালীন-
জর্জ : অর্ডার অর্ডার।
আসামি : ভুনা খিচুড়ি আর রেজালা....



হাসিব আল খুব

কলেজ নম্বর : ৭১০৭
শ্রেণি : নবম, শাখা : ঙ (দিবা)

- ১ম বন্ধু : জানিস আমাদের বাড়ির সবাই বাথরুমে গান গায়
- ২য় বন্ধু : স-বা-ই?
- ১ম বন্ধু : চাকর-বাকর পর্যন্ত।
- ২য় বন্ধু : তোরা তাহলে সবাই গানের ভক্ত।
- ১ম বন্ধু : ধুর তা নয়, আসলে আমাদের বাথরুমের ছিটকিনিটা নষ্ট তো...।



আল-আমিন খান

কলেজ নম্বর : ১১১০৭

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ক (দিবা)



মাহামুদুল হাসান

কলেজ নম্বর : ১৬৬৮৫

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : চ (প্রভাতি)

১। এক জন লোক খবরের কাগজে একটা খবর পড়ে চমকে উঠল-
ফেসবুক ১৭ বিলিয়ন ডলারে হোয়াটসআপকে কিনে
নিয়েছে।

লোক : আরে বোকা, কিনতে গেলি কেন? ডাউনলোড করে
নিলেই পারতি।

২। দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছে-

১ম বন্ধু : ford কী জানিস?

২য় বন্ধু : হ্যাঁ গাড়ি।

১ম বন্ধু : তাহলে oxford কী?

২য় বন্ধু : গরুর গাড়ি।



সাজিদ আহমেদ অপু

কলেজ নম্বর : ১০৬৫৪

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (দিবা)

এক ব্যক্তি নৌকায় নদী পার হচ্ছে-

নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল নদীতে কুমির আছে কিনা। আমি
কুমিরকে ভয় পাই।

মাঝি উত্তর দিল আগে অনেক কুমির ছিল এখন আর নেই।

নৌকা যাত্রী জিজ্ঞাসা করল 'কুমিরের কী হয়েছে?'

উত্তরে মাঝি বলল ঐ দেখছেন হাঙ্গর। হাঙ্গরে সব কুমির খেয়ে
ফেলেছে।

১। এক কিপটে গেছে চিরগনি কিনতে-

কিপটে : ভাই সাহেব, আমার একটা নতুন চিরগনি দরকার,
পুরোনোটোর একটা কাটা ভেঙে গেছে কিনা....।

দোকানদার : একটা কাটা ভেঙে গেছে বলে আবার নতুন চিরগনি
কিনবেন কেন? ওতেই তো চুল আঁচড়ে নেওয়া যায়।

কিপটে : না রে, ভাই, ওটাই আমার চিরগনির শেষ কাটা ছিল
যে!

২। একদা এক সেনা ট্রেনিং ক্যাম্পে-

কমান্ডার : সোলজার.... এক টুকরো পাথরকে যত শক্তি দিয়েই
উপরে ছুঁড়ে দাও না কেন, তা মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে
মাটিতে ফিরে আসবেই।

সৈনিক : কিন্তু স্যার পাথরটি যদি মাটিতে না পড়ে পানিতে
পড়ে?

কমান্ডার : সেটা আমাদের না জানলেও চলবে, ওটা নৌবাহিনীর
বিষয়, আমাদের না।

৩। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন-

স্ত্রী : তুমি যে আমার সাথে ১০ বছর কাটালে, কেমন
লাগল?

স্বামী : এক মিনিটের মতো।

স্ত্রী : আমার জন্য ১০ হাজার টাকা খরচ করতে কেমন
লাগে?

স্বামী : ১ টাকার মতো।

স্ত্রী : তাহলে আমাকে ১ টাকা দাও।

স্বামী : One minute please.....



ফারহান ইমরান সামি
কলেজ নম্বর : ১৬০৮৫
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : গ (দিবা)

- ১। ভাষা আছে, কথা আছে, সাড়া-শব্দ নাই,
প্রাণীর সাথে থেকেও তার নিজের প্রাণ নাই।
উত্তর: বই।
- ২। সারাদিন উড়ি আমি, ঘুরি না কোন দেশে,
নিজ সীমানায় থাকি আমি অহংকারের বেশে।
উত্তর: পতাকা।
- ৩। চলতে চলতে হয় বন্ধ চলা,
চলবে আবার কাটলে গলা।
উত্তর: পেন্সিল।
- ৪। ঘর আছে দুয়ার নাই, মানুষ আছে কথা নাই।
উত্তর: কবর।
- ৫। হাত আছে মাথা নাই, পেট আছে ভুড়ি নাই।
উত্তর: শার্ট।
- ৬। তোমার আছে আমার আছে, না না করলে আরো নাচে।
উত্তর: জিহ্বা।
- ৭। নামে আছে কামে নাই, বেঁচতে গেলে দাম নাই।
উত্তর: ঘোড়ার ডিম।
- ৮। পা ছাড়া হেঁটে যায়, মুখ দিয়ে রায় দেয়।
উত্তর: কলম।



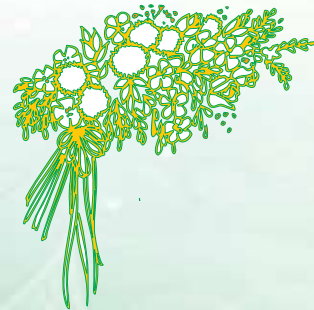
আশরাফুল তালুকদার
কলেজ নম্বর : ১৬১৪৭
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : খ (প্রভাতি)

- ১। শেষের দুটোয় পেয়ে চাষি, মুখে তার ফোটে হাসি।
প্রথম দুয়ে উপসর্গ, এ যেন এক শব্দের দূর্গ।
উত্তর : অভিধান।
- ২। লোহার চেয়ে শক্ত, তুলোর চেয়ে নরম।
উত্তর : মন।



মোঃ ওয়াহিদ ইকবাল
কলেজ নম্বর : ১০৩০০
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : গ (দিবা)

১. চার অক্ষরের দেশ যে,
খেলাধুলা করে।
শেষের দুই অক্ষর বাদ দিলে,
তার থেকে জল পড়ে।
উত্তর : কলমিয়া।
২. একটি পাখির তিনটি ডানা,
শীতকালে তার উড়তে মানা।
উত্তর : ফ্যান।
৩. অকূল সমুদ্র মেরু জল তাতে নেই,
রাশি রাশি স্থলভাগ বাড়ি ঘর কই?
উত্তর : মানচিত্র।
৪. আম নয়, জাম নয়, গাছে নাহি ফলে,
তবুও সবাই কিন্তু ফল তারে বলে।
উত্তর : পরীক্ষার ফল।
৫. কোন দেশে মানুষ নেই?
উত্তর : সন্দেহ।
৬. কোন মাসের পেট কাটলে পাখি হয়ে যায়?
উত্তর : কার্তিক।
৭. কোন বস্তু আছে ধরায়
না চাইলেও সর্বলোকে পায়।
উত্তর : মৃত্যু।
৮. তিন অক্ষরে নাম তার পানিতে বাস করে,
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে আকাশেতে উড়ে।
উত্তর : চিতল।
৯. তিন অক্ষরে নাম তার থাকে বহুদূরে,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে থাকে নদীর তীরে।
উত্তর : আকাশ।





মোহাম্মদ নাফিউর রহমান
কলেজ নম্বর : ১০৩৮২
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : খ (দিবা)

- ১। কোন হাঁস ডিম পাড়ে না?
উত্তর : ইতিহাস।
- ২। বলুনতো এমন কোন সে বস্তু পৃথিবীতে নাই
তোমার আমার মুখের কথায় তবু আছে সে-ই।
উত্তর : ঘোড়ার ডিম।



আহনাফ আবিদ
কলেজ নম্বর : ১৫২৫৯
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ (দিবা)

- ১। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত অংকগুলো ৯টি ছকে এমন ভাবে সাজাবে যেন
এক ছকে ২টি একই অংক না বসে। ছকের যে কোনো দিক
থেকে যোগ করলে যোগফল ১৫ হবে।
উত্তর :

৮	৩	৪
১	৫	৯
৬	৭	২
- ২। মাটির নিচের বুড়ি। নাওয়া নেই, ধোওয়াও নেই, তবু সাদা
সুন্দরী।
উত্তর : রসুন।



ইফতেখার রশিদ রেজওয়ান
কলেজ নম্বর : ৯৪৪০
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ (দিবা)

- সাতটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছিল,
কিছুক্ষণ পর দুইটি ঘোড়া ঘুমিয়ে পড়ল।
এখন তাহলে কয়টি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে?
উত্তর : সাতটি (যেহেতু ঘোড়া দাঁড়িয়ে ঘুমায়)।



মোহাম্মদ আবীর-উল ইয়াশ
কলেজ নম্বর : ১৫৩৪৩
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ (দিবা)

- ১। তিন অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে খায়,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে মূল্য বোঝায়,
মাবের অক্ষর ছেড়ে দিলে দিক বোঝায়।
উত্তর : বাদাম।
- ২। দুই অক্ষরের নামে ফুল
বাগানেতে রই।
শব্দটি উল্টিয়ে দিলে,
শিকারি পাখি হই।
উত্তর : জবা।
- ৩। দাম দাম ভুরু ভুরু,
বিছানায় তার বাসা।
বাঘ নয় ভালুক নয়,
রক্ত খাওয়া আশা।
উত্তর : ছারপোকা।
- ৪। দুই অক্ষরের প্রাণীর নাম পৃথিবীতে থাকে,
শেষের অক্ষর বাদ দিলে সেই নামে ডাকে।
উত্তর : কাক।



মোহাম্মদ আলওয়াজ আরশ
কলেজ নম্বর : ৯৩৮৯
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ (দিবা)

- ১। তিন অক্ষরে নাম তার,
সবার ঘরে থাকে।
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে মিষ্টি জাতীয় একটি খাবারের নাম হয়,
মাবের অক্ষর বাদ দিলে একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম হয়,
শেষের অক্ষর বাদ দিলে একটি কীট-পতঙ্গের নাম হয়।
জিনিসটা কী?
উত্তর: বিছানা।
- ২। অন্ধ বাগান,
বক্ষ্যা গাছ।
ফুল ফোটে কিন্তু
বারো মাস।
উত্তর: আকাশ ও তারা।



মোঃ নুর ইসলাম রিফাত
কলেজ নম্বর : ৯৩৭৮
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ (প্রভাতি)

- ২, ৮ এবং ৯ কে কীভাবে ১০ বানানো যায়?
উত্তর : 2 = (T) wo, 8 = (E) ight, 9 = (N) ine
এবার 2 এর T, 8 এর E এবং 9 এর N
এক সাথে করলে Ten -10 হবে।



রাইয়ান রহমান অর্থ
কলেজ নম্বর : ৯৩৫৫
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (দিবা)

- ১। ভোর রাতে দেখবে তাকে,
দেখবে সন্ধ্যাবেলা।
আকাশ পানে তাকালে তখন
দেখবে তার মিট মিট খেলা।
উত্তর : শুকতারা।
- ২। এতটা ছোট ঘরে অনেক মাথা ধরে।
উত্তর : দিয়ালশাই।



কাজী সাজিদুর রহমান
কলেজ নম্বর : ১৫২৮৯
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)

- ১। এমন এক বস্তু যা পৃথিবীর উঁচু জায়গা থেকে ফেললেও কিছু
হয়না, কিন্তু পানিতে ফেললে সাথে সাথে শেষ।
উত্তর: টিসু পেপার।
- ২। পা নাই, হাত নাই, পিঠ দিয়ে চলে, মাটিতে নামলে, জলেতে
চরে।
উত্তর: নৌকা।
- ৩। এমন এক জিনিস যা খাওয়ার জন্য নেওয়া হয় কিন্তু খাওয়া হয়
না।
উত্তর: প্লেট।



মোঃ আফিফ আভাহি

কলেজ নম্বর : ১৫৩১২

শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : ঘ (দিবা)



ফাহিম আশহাব আবির

কলেজ নম্বর : ১৫৪০১৪৫

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক (দিবা)

- ১। ঘর আছে দরজা নেই, মানুষ আছে জীবন নেই।
উত্তর : কবর।
- ২। কাঁচা আম না খেলে কী হয়?
উত্তর : পাকা আম।
- ৩। দুই অক্ষরের নাম যার, নেচে নেচে যায়,
শেষের অক্ষর কেটে দিলে, আপন কেউ হয়।
উত্তর : মাছি মা।



তাইয়ান আনান

কলেজ নম্বর : ১৪৪৯০

শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : খ (দিবা)

- তিন বর্ণে নাম তার কে বলিতে পারে?
গৃহ ছাড়া থাকেনা সে, সব চিনে তারে।
আদিবর্ণ ছেড়ে দিলে পানিতে গড়ায়,
মধ্যম ছাড়িলে তাতে পানি রাখা যায়।
শেষ বর্ণ ছাড় যদি জ্ঞানের মশাল,
ইহা বিনা ধরাতলে সকলেই বেতাল।
উত্তর: জানালা।



- ১। তিন বর্ণে নাম তার ফুলে ফলে ভরা,
মাথা কাটলে গান শুনি প্রাণ আকুল করা।
পেট কাটলে বন্যা হয় দেশ ভাসিয়ে দেয়,
বলো দেখি ভাইবোনেরা কিবা তারে কয়?
উত্তর : বাগান।
- ২। ধূসর বর্ণ দেহ তার উড়ে আসে শোঁ,
ললাটে বসিয়ে নলটাকে শুধু চোঁ।
জনমানবের বন্ধু নয় লোকালয়ে বাস,
ঘরে থেকে মানুষের করে সর্বনাশ।
উত্তর : মশা।



রাইহান-উল-আলাম

কলেজ নম্বর : ৮২৪২

শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ক (দিবা)

১. তুমি আমার চামড়া ছাড়িয়ে নাও,
আমি কাঁদি না, তবে তুমি কাঁদো,
বল তো আমি কে?
উত্তর: পেঁয়াজ।
২. কীসের হেড ও টেল আছে, তবে দেহ নেই?
উত্তর: কয়েন।
৩. কোন রুমের দরজা কিংবা জানালা নেই?
উত্তর: মাশরুম।
৪. কোন সিংহের প্রাণ নেই?
উত্তর: ময়মনসিংহ।



গাণিতিক খেলা

আরাফ ইকবাল

কলেজ নম্বর : ৯৪৭০

শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ (দিবা)

স্বাভাবিক সংখ্যা (Natural Number) বলতে বুঝায় ১,২,৩,৪..... ইত্যাদি সংখ্যাকে। এসব স্বাভাবিক সংখ্যা যা দিয়ে নানারকম বীজগাণিতিক সমস্যার সমাধান করা হয়। তাই স্বাভাবিক সংখ্যা সংশ্লিষ্ট দুটি মজার নিয়ম নিচে দেয়া হলো।

কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সাথে ঐ সংখ্যাটি যোগ করলে যোগফলকে ঠিক পরবর্তী স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে প্রাপ্ত ভাগফল হবে ঐ প্রথমোক্ত স্বাভাবিক সংখ্যার সমান।

যেমন- ধরা যাক, ৫ একটি স্বাভাবিক সংখ্যা। এর বর্গের সাথে ঐ সংখ্যাটি যোগ করলে যোগফল হবে :

$$৫ \times ৫ = ২৫ + ৫ = ৩০$$

এখন ৫ এর ঠিক পরবর্তী স্বাভাবিক সংখ্যা হল ৬। ৩০ কে ৬ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হবে $৩০/৬=৫$, যা হলো ঐ প্রথমোক্ত যে স্বাভাবিক সংখ্যাই ধরা হয়েছিল তার সমান।

এভাবে যে কোন মানের স্বাভাবিক সংখ্যা ধরা হোক না কেন উপরিউক্ত নিয়মে বর্গের সাথে ঐ স্বাভাবিক সংখ্যা যোগ করে যোগফলকে ঠিক পরবর্তী স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে প্রথমোক্ত স্বাভাবিক সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।



অজানা তথ্য

তানজিম রহমান

কলেজ নম্বর : ১৫২৩৬

শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)

- * আইসল্যান্ড হলো পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে কোন মশা, সাপ বা কোন সরীসৃপ নেই।
- * 'লিও ফেন্ডার' গিটারের আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু মজার ব্যাপার হলো লিও ফেন্ডার গিটার বাজাতে পারতেন না।
- * পৃথিবীতে ভারত একমাত্র দেশ, যে দেশের জঙ্গলে বাঘ ও সিংহ উভয়ই পাওয়া যায়!
- * 'হাঙর' রক্তের গন্ধ ২.৫ মাইল দূর থেকেও বুঝতে পারে।
- * পৃথিবীর হাঙর-ই হলো একমাত্র প্রাণী যারা কখনো অসুস্থ হয়না।
- * 'শামুক' এমন একটি প্রাণী যার চোখ নষ্ট হয়ে গেলে আবার নতুন চোখ গজায়।
- * গভীর সমুদ্রে বাসকারী 'Axolotl salamander' হলো এমন এক প্রাণী যাদের শরীরের কোন অংশ কেটে বাদ দিলে তা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় তৈরি হয়ে যায়।
- * বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম ট্রেন অস্ট্রেলিয়ার 'Ore Train' যার দৈর্ঘ্য ৭৩০০ মিটার।
- * পৃথিবীর সব সাগরে যে পরিমাণ লবণ আছে, তা দিয়ে পুরো পৃথিবীকে ৫০০ ফুট পুরু লবণের স্তূপ দিয়ে ঢেকে ফেলা যাবে।
- * এক একটি বজ্রপাত, সূর্যের থেকে ৬ গুণ বেশি গরম হয়।
- * চাঁদে সবচেয়ে বড়ো গর্তের নাম হলো ক্লেভিয়াস।



সাধারণ জ্ঞান

আহমেদ রাফিদ আরাফ

কলেজ নম্বর : ১৫২০০৩২

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ঘ (দিবা)

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুল দেখা যায় কোথায়?

উত্তর : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুল দেখা যায় পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া ও জাভা রাজ্যে। এর নাম রডাফ্লেসিয়া।

জিরাফ কোনো শব্দ করতে পারে না কেন?

উত্তর : জিরাফই একমাত্র প্রাণী যে কোনো শব্দ করতে পারে না কারণ জিরাফের গলায় শব্দ উৎপাদনে সক্ষম ভোকাল কর্ড নেই।

মানুষ বেঁটে বা লম্বা হয় কেন?

উত্তর : মানুষের মস্তিষ্কে থাকে পিটুইটারী গ্রন্থি। এ থেকে নির্গত হরমোন বা এক ধরনের রস শরীরে হাড়ের পুষ্টি সাধন করে। পিটুইটারী গ্রন্থি কোনো কারণে দুর্বল হলে মানুষ হয়ে যায় বেঁটে আর এর কাজ বেশি হয়ে গেলে মানুষ হয়ে যায় লম্বা।

বন্ধ পানিতে ম্যালেরিয়া দূর করতে কেরোসিন ঢালা হয় কেন?

উত্তর : মশার লার্ভার শ্বাস-গ্রহণের জন্য জলের ওপরে উঠতে হয়। কেরোসিন সেই জলের ওপর একটি সর বিছিয়ে দেয়। যার ফলে লার্ভাগুলোর নিঃশ্বাস নিতে প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। ফলে সব লার্ভাই মারা যায়।

ম্যারাথনের যুদ্ধ হয় কবে?

উত্তর : ম্যারাথনের যুদ্ধ হয় খ্রিস্টীয় ৪৯০ অব্দে এথেনীয় বাহিনীর সঙ্গে পারসিকদের ম্যারাথনের প্রান্তরে। যুদ্ধ জয়ের সংবাদ বহন করে এথেন্সের ফিলিপাইন ম্যারাথন থেকে এথেন্স পর্যন্ত ২৬ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করার পর ক্লান্তিতে প্রাণী প্রাণ ত্যাগ করে। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতেই অলিম্পিকে ৩ দূরত্বের ম্যারাথন দৌড়ের প্রবর্তন হয়।

লজ্জাবতী লতা স্পর্শ করলে পাতা নুয়ে পড়ে কেন?

উত্তর : স্পর্শ করলে লজ্জাবতী লতা নুয়ে পড়ে কারণ এই ধরনের উদ্ভিদের পাতার গোড়ায় স্ফীত অংশে থাকে পালভিনাস। স্পর্শ করলেই এটা থেকে পানি বেরিয়ে অন্য কোষে ছড়িয়ে পড়ে তাই পাতা নুয়ে পড়ে।

লাফিং গ্যাস কী?

উত্তর : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন লাফিংগ্যাস আবিষ্কার করেছিল। মূলত শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করতে তারা এ গ্যাস খেনেডের মত ব্যবহার করেছিল। এই গ্যাসে নাইট্রাস অক্সাইড থাকে বলে ঠুঁকলে ঘাড়ে সুড়সুড়ি লাগে এবং হাসির উদ্বেক হয়। বেশি মাত্রার গ্যাস থাকলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।



জানা-অজানা

মোঃ তাহসীন আবিদ

কলেজ নম্বর : ১৫২০৩৬১

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ (দিবা)

- * চড়ুই পাখি তার ছানাকে দিনে ৩০০ বার খাওয়ায়।
- * মানুষের হাঁচির বেগ ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার।
- * বাঁশ গাছ দিনে ১৬ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়।
- * বানরের মাথায় দুটি মগজ থাকে, একটি তার দেহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অপরটি লেজ নিয়ন্ত্রণ করে।
- * মাটিতে মিশে যেতে একটি পলিথিনের ৫০০ বছর সময় লাগে।
- * একজন মানুষ বছরে প্রায় এক কোটি বার চোখের পাতা মিটমিট করে।
- * একটি পূর্ণ বয়স্ক তিমির এক নিঃশ্বাসে যে পরিমাণ বায়ু বের হয়, তা দ্বারা দুই হাজারটি বেলুন ফোলানো সম্ভব।
- * পৃথিবী জুড়ে প্রতি বছর ৫০ হাজার বারের বেশি ভূমিকম্প হয়।
- * প্রসাধনীর পেছনে বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়।
- * জন্মের সময় একটি শিশু জিরাফ ৬ ফুট লম্বা হয়।
- * হাতি দৈনিক ২০ ঘণ্টা খাওয়ায় ব্যস্ত থাকে।
- * কালো তিমি জন্মানোর সময় সাদা হয়ে জন্মায়।
- * গরুর পাকস্থলী চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।
- * ঘোড়ার ৪০টি দাঁত থাকে।
- * একটি তেলাপোকা মাথা ছাড়া ১০ দিন বাঁচতে পারে।
- * প্রজাপতির পায়ে সাহায্যে খাদ্যের স্বাদ নেয়।
- * কেঁচোর কোনো হৃৎপিণ্ড থাকে না।
- * বিষুবরেখাও নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর দিন-রাত সমান।
- * মোনালিসার ঠোঁট আঁকতে ভিঞ্চির ১২ বছর লেগেছিল।
- * চার ঘণ্টার মধ্যে কেউ ১০০ কাপ কফি পান করলে তার নিশ্চিত মৃত্যু হবে।
- * জন্মের সময় একটি ক্যান্ডারু এতটাই ছোট থাকে যে তাকে একটা চামচে তুলে নেয়া যাবে।
- * রানি ভিক্টোরিয়া বছরে তিন বার গোসল করে।
- * হ্যালির ধূমকেতু প্রথম দেখা যায় ১৭৫৯ সালে।
- * ইরানি কমল প্রায় ৫০০ বছর পর্যন্ত ব্যবহারের উপযোগী থাকে।
- * ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত ঘটে।



জানা- অজানা

মাহিম মুরসালিন হেরা

কলেজ নম্বর : ১০৩৬৪

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ (দিবা)

- * সৌদি আরবের পতাকা কখনোই অর্ধনমিত করা হয় না। কারণ এতে পবিত্র কালিমা রয়েছে।
- * নারহোয়েল (Narwhal) এক প্রকার তিমি মাছ, যার দাঁত ৮ ফিট লম্বা।
- * পিউমিস (Pumice) পাথর পৃথিবীর একমাত্র পাথর যা পানির উপরে ভাসে।
- * পৃথিবীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ সালে লিবিয়ার আল জাজিরা নামক স্থানে। তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৩৬৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা ৫৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস।
- * পৃথিবীর প্রথম নভোচারী কিন্তু মানুষ নয়, একটি কুকুর।
- * আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein) ১৯৫২ সালে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রস্তাব পান।
- * মে ফ্লাই নামক একটি পোকা সবচেয়ে কম সময় বাঁচে (২৪ ঘণ্টা বা একদিন)
- * আফ্রিকান সিকাডা মাছি (Cicada Fly) ১৭ বছর ঘুমিয়ে কাটায়, ঘুম ভাঙার পরে ২ সপ্তাহ বেঁচে থাকে।
- * অস্ট্রেলিয়াতে এক ধরনের কেঁচো পাওয়া যায়, যা লম্বায় ১০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে।
- * পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ মৌল 'এস্তেতিন'। কিন্তু পৃথিবীতে এই এস্তেতিন মাত্র ২৮ গ্রাম আছে।
- * ব্রাজিলে একধরনের প্রজাপতি পাওয়া যায়, যাদের শরীরের রঙ ও গন্ধ ছবছ চকলেটের মতো।
- * ভারতবর্ষের প্রথম মসজিদ 'চেরামন জুমা মসজিদ।'
- * DELL কম্পিউটার কোম্পানীর মালিক মাইকেল ডেল মাত্র ১৯ বছর বয়সে ১০০০ ডলার নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন।
- * আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল কখনো তাঁর মা কিংবা স্ত্রীকে ফোন করেন নাই। কারণ তারা দুজনেই ছিলেন বধির।

- * পৃথিবীতে শুধু পিঁপড়াই বেশি ওজন ওঠাতে পারে, তার দেহের চেয়েও ৯গুণ বেশি।
- * উট পাখির চোখ মস্তিষ্কের চেয়েও বড়।
- * হিটলার আর স্টালিন, যারা ৪ কোটি হত্যার জন্য দায়ী তাঁরা শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন।
- * হাসার জন্য ব্রেনের ৫টি অংশের কার্যক্রমের প্রয়োজন হয়, এজন্য হাসা খুব সহজ নয়।
- * বিশ্বের অক্সিজেনের চাহিদার ২০% মেটায় অ্যামাজান জঙ্গল।
- * প্রজাপতির স্বাদ গ্রহণের গ্রন্থি পায়ে থাকে। তাই এরা পা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে।



সাধারণ জ্ঞান

রাতুল হাসান খান

কলেজ রোল : ১৩৩৮১

শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : গ (প্রভাতি)

১. গ্রায়াম স্মিথ ও তামিম ইকবাল ব্যতীত ২০০০ সালের পর কোনো ক্রিকেটার এক হাতে ব্যাটিং করেননি।
২. ২০১৮ ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের সবচেয়ে দামী জার্সি ছিল ইংল্যান্ডের। যার প্রস্তুতকারক দেশ ছিল বাংলাদেশ।
৩. ইডেন হ্যায়ার্ড তাঁর ব্যক্তিগত সকল মেডেল ও ট্রফি ছোটদের দিয়ে দেন।
৪. সর্বশেষ ওয়ানডে মর্যাদাপ্রাপ্ত দেশ নেপাল।
৫. পৃথিবীর প্রথম ধূমপানমুক্ত দেশ হলো ভুটান।
৬. পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাতের নাম অ্যাঞ্জেল ফলস (ভেনিজুয়েলা)।
৭. পানাম খাল বনভূমি কেটে তৈরি করা হয়।
৮. বিশ্বকাপ ফুটবল প্রথম ম্যাচ ফ্রান্স ও মেক্সিকোর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।



জানা-অজানা

মোজাম্মেল হক

কলেজ নম্বর : ১৬৩২১

শ্রেণি : নবম, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মজার ঘটনা-

আইনস্টাইনের মেয়ের বিয়ের সময় সবাই চার্চে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে আইনস্টাইন তাঁর মেয়েকে বলল, “তুমি চার্চের দিকে যাও আমি ল্যাভে আমার কলমটা রেখে আসছি।” মেয়ে অনেক নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি গেলেন ৩০ মিনিটের কথা বলে। তিনি যখন আসলেন না তখন সবাই মিলে তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিল। সাত দিন পর আইনস্টাইনের মেয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে ফিরে এসে তার মাকে জিজ্ঞেস করে, “বাবা কোথায়।” তখন তার মা বলল যে, “উনি যে ল্যাভে গেলেন আর তো আসেন নাই।” তখন তাঁর মেয়ে আইনস্টাইনের খোঁজে ল্যাভে গেল, ল্যাভে গিয়ে দেখল যে তার বাবা একটা কলম নিয়ে বোর্ডের সামনে কী জানি চিন্তা করছেন। মেয়ে বাবাকে বলল, “বাবা তুমি কী কর?” আইনস্টাইন উত্তর দিল, “মা, তুমি চার্চে যাও। আমি এই কাজটা ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করে আসছি।”



জানা-অজানা

মাছউদুর রহমান

কলেজ নম্বর : ১০৯২০

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (দিবা)

* গণিত কারো পছন্দ, কারো অপছন্দ। কিন্তু গণিতের এমন কিছু বিষয় আছে যা সত্যিই অসাধারণ। আমরা প্রতিনিয়ত গণিতের নানাবিধ সংখ্যার সাথে পরিচিত হই। তেমনি একটি পরিচিত সংখ্যা ১০৮৯। এ সংখ্যাটিকে আমরা ভালোভাবে জানি। তবুও আমাদের এই জানার মধ্যে কিছু অজানা রহস্য রয়েছে। ১০৮৯ সংখ্যাটি হচ্ছে গণিতের বাহাদুর। যেমন : ৩ অঙ্কের কোনো সংখ্যা ধরে তাকে উল্টিয়ে বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করি। বিয়োগফলকে উল্টালে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তাকে বিয়োগ ফলের সাথে যোগ করি। ধরি, ৭৩১ কে উল্টালে হয় ১৩৭

এখন বড় সংখ্যা ৭৩১ থেকে ছোট সংখ্যা ১৩৭ বিয়োগ করি।

$$৭৩১ - ১৩৭ = ৫৯৪$$

$$৫৯৪ \text{ উল্টালে হয় } ৪৯৫$$

এখন বিয়োগফল ৫৯৪ এর সাথে ৪৯৫ যোগ করি

$$৫৯৪ + ৪৯৫ = ১০৮৯$$

যেকোনো তিন অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে এ পদ্ধতিতে বাহাদুরি করা যাবে। কিন্তু বিয়োগফল ০ বা ২ অঙ্কের হলে বাহাদুরি প্রযোজ্য নয়। অন্যথায় বাহাদুরি চলবে।

* আচ্ছা, ৪ অঙ্কের কোন সংখ্যাকে ৪ দ্বারা গুণ করলে গুণফলটি উল্টে যায়?

একমাত্র জবাব-

$$২১৭৮ \times ৪ = ৮৭১২$$

$$২১৭৮ \text{ হচ্ছে } ১০৮৯ \text{ এর } ২ \text{ গুণ}$$

$$৮৭১২ \text{ হচ্ছে } ১০৮৯ \text{ এর } ৮ \text{ গুণ}$$

সম্পূর্ণ ব্যাপারটি দেখা যাক-

$$১০৮৯ \times ১ = ১০৮৯$$

$$১০৮৯ \times ২ = ২১৭৮$$

$$১০৮৯ \times ৩ = ৩২৬৭$$

$$১০৮৯ \times ৪ = ৪৩৫৬$$

$$১০৮৯ \times ৫ = ৫৪৪৫$$

$$১০৮৯ \times ৯ = ৯৮০১$$

$$১০৮৯ \times ৮ = ৮৭১২$$

$$১০৮৯ \times ৭ = ৭৬২৩$$

$$১০৮৯ \times ৬ = ৬৫৩৪$$

$$১০৮৯ \times ৫ = ৫৪৪৫$$

লক্ষ করি, প্রতি সারির বাম দিকের গুণফল ডান দিকের গুণফলের পরস্পর উল্টো। তাহলে ১০৮৯ বাহাদুর কেন নয়?

ENGLISH WRITING



Lesan Ahmed
College Roll : 15314
Class : IV, Section : C (Morning)

Dear Friend

Oh! My dear,
You are not here
But I can hear,
Don't get fear.

Your memories are here,
Live with cheer.
No more tear,
Your dear friend is here.

Friendship

Feelings are many,
But words are few,
Clouds are dark,
But sky is blue,
Life is paper,
Love is glue,
Everything is false,
But friendship is true.



Mother

Arafat Rahman
College Roll : 15355
Class : IV, Section : C (Day)

You have given me life
And showed me the light.
Taught the strength to fight,
And difference in my life.

When there are problems,
You always stay
And pick me up along the way.
Show your support come what may,
Do everything to make it fade away.

I wish you a happy Mother's Day!
I'll always be proud to say,
You are the best to me,
With you I am in a happy spree.



DRMC

Ahnaf Ali Islam Adib
College Roll : 1540005
Class : VI, Section : A (Day)

DRMC, DRMC, how you are?
Since 1960 to this year,
You've bred REMIANs every year,
Making base for bright future.
You chalk programs to celebrate,
National and social occasions we have,
You arrange events of many kinds,
To disclose all hidden side.
Mother loves you for your name,
Father's fond of you for the fame,
I love you for large ground,
Green trees and grasses all around.



Kowsique Islam Feadh

College Roll : 1540152

Class : VI, Section : A (Day)

The City of Mirrors

There the city of mirrors lies,
 Within a stone's throw of my place
 I have a neighbour living there,
 Oh, I've never seen his face!
 Shore-less waters ragging all around,
 No boat to cross this wide sea-
 I must go and see my neighbour dear,
 But, who will ferry me?

O how could I tell what my neighbour's like;
 He has no head, no torso, limbs-
 Now, he rides the aimless gales.
 Now in water swims.
 If my neighbour touched me once
 Even death pang I could thwart-
 But though the same room we both share,
 We're a million miles apart.

Whispering of the flower

There's a secret
 I promised I'd take to my grave,
 Let it be buried with me,
 Allow it to also decay with the dust.

However I cannot promise
 That upon my death, on that very soil,
 An intruder may not bloom,
 Sighing and lamenting-that very secret
 White are her petal;
 Curved inwards and layered.

And on top of my grave
 Will she whisper into the wind that very secret?
 I still promise-
 That it's a secret
 Which I'll take to my grave
 But the leaves at dawn,
 The petals and thorns
 May get a sense of it.





Beauty of Nature

Avirup Sarker

College Roll : 8099

Class : VII, Section : A (Day)

Beauty is in the red
Of the dragon's flame
The way it burns,
Impossible to tame
Beauty is in the orange
Of the volcano's eruption
Running down the side
In a fiery disruption
Beauty is in the yellow
Of the sun
Our source of light
Our daily fun.
Beauty is in the green
Of the trees
The way they sway
In an afternoon breeze.
Beauty is in their blue
Of the ocean
Fish below stirring
A commotion.
Beauty is in the purple
Of a snowy mountain
Melting into water
Of a summer's fountain.
These are the colour of rainbow
That stretch for a mile
Because after all a rainbow
Is an upside-down smile.



Will

Ahnaf Fuad Khan

College Roll : 8053

Class : VII, Section : A (Day)

What is will?
If asks me anyone,
It's a blazing fire,
I'll say to everyone.
It's the fire that gives me confidence,
The fire that makes me self-reliant,
It's the fire that burns every obstacle,
And shows me the way to pinnacle.
So, whenever you are in a problem
Have a strong will in mind.
Because will is such a vitality
Which helps me to cross every difficulty.



The Colour of Life

Md. Samiul Islam

College Roll : 10563

Class : VII, Section : B (Day)

Mind is like a beautiful butterfly
Which always searches for colour of love
Life is also like an open book
Which gives you always something new.
Sometimes it may be bad
But you've to experience everything.



At The Park

Md. Farhan Gazi

College Roll : 12993

Class : IX, Section : C (Morning)

Yesterday when I was
At the park,
I saw a little boy
Playing with a toy duck.
The duck was saying,
“Cluck, cluck, cluck”
The boy was very happy
To play with the duck.
Then the boy’s mother came
And said, “Let’s go home”
The boy asked her,
“What the hurry, mom?”
You know you have to go home and study
Don’t you, my dear?
Yes, mom, I will surely do well in the exam.
Don’t you fear?
I know my dear, you will surely do well
But why do you wanna stay for
Some more time?
My duck is very special
So I want sing him a song and
Recite a rhyme.
I want him to play a little more
I want to take him
To some beautiful shore.



Good

Md. Arif Hasnat

College No : 10191

Class : XI, Section : D (Day)

I wanna go far
To discover what I am.
I wanna actualize
To reach my goal
I have to lead my life
The scope of true life
Visits rare in my country
So, one day we may face
Boundless stress emerging
From various problems.
So, I wanna go beyond
To discover what I am
And see over the horizon.



Can I Get Back

Abir Hasan

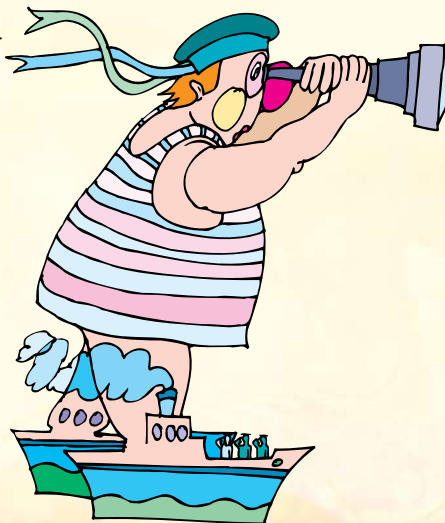
College Roll : 10593

Class : XI, Section : C (Day)

The time I needed,
The thing I wanted,
The moment I searched,
I didn’t get.

The friend I had,
The time I had,
The thing I had,
Lost in nothingness.

But this is the time
I want to get back
What I needed,
What I searched,
What I had,
What I wanted,
Can I get back?





Life's love

J. M Smaron

College Roll : 16676

Class : XI, Section : C (Morning)

Life is fully delightful
When you are in my life.
Life is doleful
When you leave my life.
Life is meaningful
With your love.
Life is everything
When I have your company.
Life is nothing
Without you to me.
Who are you?
You are none but
My beloved mother.
For everything, mom,
I always owe you.



Debt of Friendship

Md. Wahidul Islam

College Roll : 9993

Class : XII, Section : A (Day)

No matter I forget thy memories
No matter I come back going to nigh you
No matter thou do the same
But there is a great lyric
And that is "REMIANISM".

As we possess the same
As we've friendship
As we like to yell together
"North, South, East or West
DRMC is the best".
So I am to tell you-
We've debt of friendship
We've debt of REMIANISM
Are "proud to be REMIANs".

Good Bye Friends
Good Bye REMAINS





Remedies of Greed

Mir Ahmad Humayed

College Roll : 10400

Class : III, Section : A (Day)

Once upon a time there was a poor farmer. He had some cows. He sold the cows' milk to the villagers and made 1kg butter with the rest of the milk.

He bought 1kg salt from a shopkeeper. He sold the 1kg butter he made in the same shop where he bought salt.

One day, the shopkeeper measured how much butter the farmer gave him. He measured the butter and found that the butter was 100 gram less than 1kg.

The shopkeeper told the farmer that he was giving him 100gm butter less than 1kg every day. The farmer replied, "I am a poor farmer. I don't have enough money to buy a balance and measuring weights. So I made a balance myself. I attached one bucket in one side and another bucket in the other side and that is hundred percent okay.

I put 1kg salt that I bought from you in one side and the 1kg butter in the other side of the balance. Thus, I measured my butter.

The shopkeeper thought the farmer was right because he put one hundred gram less salt in his packet every day. From the next day, the shopkeeper made a special 1kg salt packet for the farmer and he got 1kg butter every day.



The White Death

Talha Prodhan

College Roll : 15280

Class : IV, Section : C (Morning)

The 'White Death' is a creepy story about a vengeful spirit, in Mexico, who hunts down anyone who knows about her existence.

I am currently sitting in front of my computer, scared witless. It all started earlier today, when a man broke into our house. He told his story about a soul called the white death. He told that it was after him and wanted to kill him. He also told us that his own sister had been killed by the white death. It is the soul of a girl who died years ago. She died by her own hand, he said, alone and unsolved. She hated life so much that she wanted to remove all traces of herself from the earth. So great was her desire to completely erase all of her memory and to return from the dead as a vengeful spirit that she bent on killing all those who knew of her existence.

She is a girl but not a girl, he said. She's not dead, but not really alive. She has cold eyes that weep blood. She walks without even actually seeming to move an inch. She stalks her victims like a wild animal pursuing them across rivers and valleys trailing them back to their homes. You are never actually aware that she is following you until you hear the knock upon your door. She knocks once your skin and uses that skin to patch her own decaying flesh. Twice for your hair which she will gnash between her teeth. Three times for your bones which she will fashion into clubs. Four times for your heart which she will tear out of your chest. Five times for your teeth which she will polish and keep in box. Six times for your eyes which she will pluck one by one. Seven times for your soul which she will swallow whole.

Currently I am sitting in my chair. I am hearing her knocking upon my door and the sound is getting louder every minute. I am wondering if she had killed him before I had met him. I wish I could've escaped my terrible fate. At any moment she will break through my door and tear me apart. I am counting my last breath....



A Memorable Holiday

Farhan Rahman

College Roll: 9532

Class: IV, Section : B (Morning)

In the holidays, we actually go to places which are interesting. But our family does not go to interesting places on holidays. But on this Christmas holiday, we were in the Cox's Bazar. It was very fun. We first went to the hotel. From the hotel's corridor, we could see the view of the sea beach. At sunrise, the light of the sun covers the sea. It looks very beautiful. At sunset, the sun looks more beautiful than the sunrise. It looks like the sun is setting down in the sea. When we went to the sea shore, the water slowly came to our feet. I felt very comfortable and pleasing. We played volleyball at the beach. We went to the sea by a boat. On the last day of the holiday, we went to the stores. We bought many things. And in the last two hours before our flight, we went to a restaurant and ate the traditional foods of Cox's Bazar. It was really fun. It was the best holiday of our life. It was really a memorable holiday. I will remember it throughout whole life.



Eureka

Md. Safat Ishraq

College Roll : 9452

Class : IV, Section : A (Day)

In the 1600s an English physicist and mathematician named Isaac Newton was sitting under an apple tree or so the history tells us. Apparently, an apple fell on his head, and he started wondering why the apple was attracted to the ground in the first place. Newton publicised his theory of Universal Gravitation in the 1680. It basically set forth the idea that gravity was a predictable force that acts on all matters in the universe and is a function of both mass and distance. The theory states that each particle of matter attracts every other particle (for instance, the particles of "earth" and the particles of "you") with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them.





A Horrible Train Journey

Hemadri Heronmoy
College Roll : 14498
Class : V, Section : A (Morning)

On 23rd December my family and I decided to go to Kishoregonj to meet my cousins, uncles, aunts, grandfather and grandmother. I was very excited about it. But then something happened which was the biggest accident of my life.

We woke up at 6 am. Then we took our breakfast, prepared ourselves and went to the Kamalapur Railway Station. We sat in our cabin and waited till the train reached Kishoregonj. Then I played some games, watched the scenery and played with my younger brother. There were four people in the cabin: my father, my mother, my younger brother and I. When we almost reached Kishoregonj, I wanted to go to toilet. I went close to the toilet and knew that my father was already inside. Then he came out and let me in. When I came out of the toilet, my father was closing the door and I didn't know my finger was (at a side) of the door. My father shut the door and realized that my finger was inside and quickly opened the door. My finger (the middle finger of my right hand) was displaced. My father took me to my uncle's hospital and they told us to go to Kishoregonj Sadar Hospital. The doctors of Kishoregonj Sadar Hospital advised us to go to Dhaka and then get admitted to "Pongu Hospital" and also warned us that it must be done within 8 hours! Then we took our uncle's car and came back to Dhaka. An operation was done in the "Pongu Hospital" and it took half an hour. Then my whole arm was bandaged. After 17 days my bandage was opened and after 1 week I started writing again! I also participated in the Mathematics Olympiad. I still feel happy about writing with all of my fingers again. I also prayed to Allah because I was very thankful to Him.



A Trip to Kolkata

Arib Mahmood
College Roll : 8610
Class : V, Section : A (Day)

It was the month of December. We went to Kolkata. We went there by train. Our train left from Cantonment Railway Station (Dhaka) and arrived at Chitpur Railway Station (Kolkata). I was so excited about it. My family was also excited. After passing a lot of security checks, we came out of the railway station. Then we called on a taxi and went to our hotel. The hotel was very beautiful. The next day we went to visit the Victoria Memorial. This Memorial was built during the British Era to show the honor of Queen Victoria. There are also writings and paintings there. We also knew about the history of Bengal. After we had finished our visit at Victoria Memorial, we visited around the city. We visited the Howrah Bridge and the Howrah Railway Station. At night we went to have dinner at a famous restaurant named "Kasturi". There were many people inside the restaurant, so it was crowded. Next day we went to the Science City. It was wonderful. I came to know about many things of science and the history of human beings. After exploring the Science City, we went to a market. We bought many gifts and things. The next day we went to Santi Niketon. It is far from Kolkata city. We went there by train. We were very excited. We explored Shanti Niketon and learnt about the poetry, novels, music etc. of our famous poet Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore built many houses to live in and a university in Shanti Niketon. After visiting it, we came back to our hotel. It was a busy day and we had a lot of fun. The next day we came back to Kolkata city and visited the house of Tagore at Jorashako. We knew about the history and life style of Rabindranath Tagore. We also met some friends there. The next day we went to the market for shopping. After shopping, we prepared ourselves for coming back to Dhaka and went to the Netaji Subhas Chandra Bose Airport. It is also situated in Kolkata city. The airport was very beautiful.

I loved that trip very much. It was a wonderful trip.



My Russia Tour

Mohammad Ahnaf Hossain

College Roll : 1530128

Class : VI, Section : A (Morning)

This July I made a tour to Russia for 5 days from 19 to 24 July. The main purpose of visiting Russia was to attend a competition. The competition was Aloha International Competition 2018. I was very happy to visit a European country for the first time. But I was also sad because the final match of FIFA world Cup was held on 15th July at Moscow in Russia. But I went to Moscow on 19th July. Still I was happy. I and my father were going to Russia. Our flight was at 4 am in the morning on 19th July. The name of our airline was Air Arabia. Our transit was at Sharjah in the UAE. It took 10 hours to reach Russia. We reached there at 4.30 pm of the local time. We went to the hotel and took some rest. After taking rest, we went to have our dinner and went to a shopping mall. But a very strange thing happened. It was 9 pm there but the sun was still in the sky. In Russia, the sun sets at 10 pm. The next day we went out for the competition. As the competition was an international event, many countries participated including India, Spain, Croatia, Germany, Mexico, Ireland, China, Portugal, Malaysia, Uzbekistan, host Russia and Bangladesh. I was representing Bangladesh. The competition was in the morning and prize giving ceremony was in the evening. I participated in the competition and I was very hopeful of getting an award and became 1st. I was very happy. In the next three days, we visited a lot of interesting and historical places of Russia. One of them was the Red Square, the most visited place in Russia. It is the center of many places. At the back of it was Kremlin, the work place of Putin, the president of Russia. In its side, there was a famous church which had seven domes. We also visited many other places. I went to the Luzhniki Stadium where the FIFA World Cup Final was held. This was my tour to Russia.



Where is Humanity?

Ahnaf Fuad Khan

College Roll : 8053

Class : VII, Section : A (Day)

What is humanity? Love for all, help for all. No, humanity is now just a word. It's now just used in books, cinemas, talk shows etc. People are now neglecting humanity. If there is anything, that is self-centeredness, selfishness, greed etc. Let us imagine, we had to go to a place urgently but we missed the bus. And as a normal instinct, we'll start walking. But if we see a man lying injured on the road we won't help him. Instead, we'll stare at him for a few moments and again will return to our own work thinking that helping him will not bring us any profit. This is the present situation of humanity. Forgetting all brotherhood, mutual relationship, humanity, people are now busy in worldly competition. And now before giving anyone hand of help, we continuously think about his religion, economic solvency, body colours etc. Now none gives any help to anyone but gives only loan or something that provides benefits for them. If it remains so, one day all will get thirsty of others' blood. And this earth will turn into a war field. So, we should try to love all. We will not stare at anyone with suspicion, but with love, sympathy etc. We need to make the world beautiful by the bond of love, humanity and care.

All we have to remember is that the world was created for humanity, brotherhood and with the hope of achieving highest level of success towards the equality of human race, we should cultivate all these virtues.



Real Friend

Md. Raihan-UI - Alam

College Roll : 8242

Class : VII, Section : A (Day)

As a student, it is very much common that we have friends, but can anyone say that all our friends are our real friends. Surely not. To find a real friend is really hard. But I can claim myself lucky to get such a real friend like Fuad. Real friends are those who help their friends in need not they who leave their friends in danger and escape.

In 2014, I was admitted in DRMC in class III (three). Class began from 1st January but I was in village then. So I came first in the school on 15th January. My mom told me to go to the second gate after the school breaks. But after the school break all went in a

row to first gate. As the school is very big and I was first time there, I got terrified and began to cry. Then, one of our classmates noticed me crying and he came with me and left me at the second gate (back gate). He is now one of my best friends and for that incident along with some other reasons also. I consider him my real friend. He is a meritorious boy. But still he has no pride in his merit. His name is Ahnaf Fuad Khan. So, I will say, getting a friend like him I am very much lucky. So, he can be given as an example of real friend.



The Swing

Shaikh Sabik Kamal

College Roll : 7983

Class : VII, Section : A (Day)

“Childhood days were better”, said Yoon as he answered Hope’s question. “Why? I thought you said youth is a better way to go. Are you a hypocrite or something?” Hope was now interrogating Yoon.

“No I’m actually bipolar. When Joon asked me the same question, I said that youth is life. Now, sitting on this swing, it has reawakened my laziness and now I want to go back to my childhood years. I even had an imaginary castle of my own. How cool is that?” Yoon kept on blabbering.

“Not cool, at least I don’t think so”, Hope dryly replied, “Is it the only reason you are now preferring childhood?”

Yoon took a look at Hope and swung in the swing.

Back and forth, he went on. His eyes couldn’t be fixed on a particular object except his shoes, as his surroundings got blurry. “No”, he replied swinging even harder.

He recalled himself when he was ten. It was summer, the binding sun accompanied the ocean blue sky as Yoon started to sweat in the classroom. The fans weren’t enough. It never was except in winter. He was looking out of the window and imagining the taste of spicy noodles his mom would prepare when he would get back home. But it was just the first period. He blamed the clock for not turning faster.

The teacher silenced everyone, as his classmates noticed a small peak from a small kid standing outside the room. Yoon caught his eyesight and that kid took

away his eyes.

“Everyone, welcome Jeon. He is a foreigner of your age. He will be studying with you from now. Please treat him well. Jeon, will you come inside?”

Jeon peeked again. Only this time everybody encouraged him to come in. He slowly set his footstep in the class room and the first thing that everyone noticed was his natural brown hair. All of them had black hair and planned on keeping it like that for the rest of their lives. At least for the next ten years as until they became a “tall” adult. Jeon watched the curious eyes looking at him obnoxiously.

“Hello! My name is Jeon,” He couldn’t say anything more. The teacher quickly sent him to his seat and ended his period. Jeon sat two benches behind Yoon.

That day, he had his eyes fixed on Yoon. Many came to him and wanted to be his friend. He made so many friends that he couldn’t even remember their names. Yoon was a bit arrogant and also very egoistic. He thought “let him come and talk to me. Why do I have to go anyway?”

But surprisingly that day, Jeon came to up Yoon and said, “Hi! I am Jeon. Will you be my friend?” Yoon was startled. “Huh, that’s very interesting,” replied Yoon arrogantly. “You came to me directly so that you could befriend with me. Am I that popular?” he smirked after finishing his answer. “No, I always wanted to be friend with an egoistic arrogant, self-interested person. You seem to fit the description. I plan in being like you when I’m older.” Yoon got startled at Jeon’s reply.

Yoon changed his tone to an adult like advisor and said “Kid, you don’t want to be like that when you’ve grown up. Believe me.”

Jeon gave a sad, disappointing, sulky look that made Yoon take that back.

“It is the truth.” Still Jeon didn’t stop sulking. “Okay, okay, let’s be friends”.

After that day, Jeon slowly became a very good friend with Yoon, though they had a rough start. Sometimes it was only Jeon fantasizing an adventure with him through another galaxy. They went to the swing in the playground every day and played rock, paper, scissors. Whoever would lose would rock person on the swing. Jeon lost so many times that, Yoon sometimes felt sorry for him and let him swing. Those day Yoon

would swing him hard so that Jeon wouldn’t want to do it the next day.

Four years passed. One day, Jeon was absent from class. It was the same for the next couple of days. Yoon couldn’t but call Jeon.

Yoon was notified that Jeon was going to another country for a long time. He said he would study there. Jeon got a bit teary when he called Yoon the day he was leaving. Yoon pretended to be strong. But he also cried after Jeon left. After all, people cry even if for once in their life.

So today, he sat on this swing, dragging hope to remind him of his carefree childhood days. Yet it never felt the same for him. He blatantly replied to Hope, “No, that’s the only reason why childhood was better”.

“You needed to say that after 10 minutes straight! Please visit a doctor. We’re humans too, you know. Anyway, it’s almost evening. I’m heading home.”

“Okay. See you around.”

Yoon kept sitting on that swing as he rocked himself last time. Then he got up and walked home.

Hope felt bad for Yoon as a friend. Yoon and he started to look for a way to contact Jeon. They even thought about writing a fake letter to Jeon.

Few days later, Hope, Jeon and Yoon’s other friends came to him while he was on the swing “Yoon,” said Hope with a big smile.

Jeon flashed a letter in front of his eyes. He quickly snatched it and unraveled the letter, “We’ve been trying to contact you.” And look here.

The letter held three sentences.

“Hi Yoon. It has been long time, hasn’t it? Have you been well?”

It was real. Yoon was finally hopeful about something. Something unknown. Now, all that mattered to him wasn’t Jeon being here but his friend Hope, Joon and others being here for him, his family here for him, he himself being here. He realized his whole life is in front of him.

He smiled. It was a priceless smile. Because he knew, his days are still here, be it youth or childhood. And he had to take a run for it. Yoon finally let go of his emptiness, of the swing he held on to all these years.



Hidden Scientists

Leehan Hayder

College Roll : 13034

Class : IX, Section : F
(Morning)

Who are the most famous scientists? Are they Galileo, Newton, Einstein, Maxwell and Tesla? Yes, of course. But indeed, there lived a group of scientists in the 8th-14th centuries up to 17th centuries. They lived in an era of scientific advancement known as Islamic Golden Age. It coincided with the Dark Age of Europe. All this started from the victory of Abbasids against Tang Chinese in the battle of Talas River, revealing the way of paper making in to the Islamic World from China. Encouraged by religious dictions, Caliph Harun Or Rashid established House of Wisdom Library in Baghdad. It helped to create astonishing discoveries and inventions to pave the way for modern society.

Physics: In the world of physics, Hasan Ibn Al Haytham is considered the father of optics, theoretical and experimental physics (early). He wrote “Kitab Al Manazir” (Book of Optics) where he gave his theorems based on an experiment depicted in Fig 8.14, Ch-8, physics, class 9-10, 2018. He was the first true scientist of the world in regards to founding experimental process of research that students learn in secondary classes. The reflection of light as well as calculus and gravitation theory was found in his books in 10th century.

Chemistry: Jabir Ibn Hayyan (Geber) is considered to be the father of Chemistry. His famous work is “Kitab Al Kimya” (Alchemy) translated in 12th century. He discussed the states of matters, calcination, alkali, acids, distillation, and transformation of metals, rust, steel and filtration. Misri, Al Qashi and Al Razi also had contributions in organic and inorganic chemistry, alcohol, and production of chemicals since 8th century. Sake Dean Mahomed and others developed soaps and shampoos along with cosmetics. Some of them were Indians.

Medicine: In Kitab Al Tafsir, Abulcasis or Al-Zahrawi

discusses medical and surgical instruments of which 90% are still used in surgical operations. The famous book “The canon of Medicine” was written by Ibn Sina (Avicenna). Father of surgery (modern), Al Zahrawi and father of Pediatrics Zakariya Al Razi in 9th century wrote description of pox, measles and complex diseases in their books. Ibn Al Nafis discussed blood circulation. Dr. Osler has mentioned these as the bible of medicine. They also introduced ophthalmology, dentistry and orthopedics.

Mathematics: Everyone knows the name of Al Khawarizmi, father of algebra and decimal system of expressing numbers during 8th century. He and Omar Khayyam could solve quadratic and cubic equations. NasiruddinTusi also had important contributions in this field.

Astronomy and Geography: Highly accurate radius of the earth and solar star plates were discovered during this era. Piri Reis drew map of the entire world in 1513 that depicted 100% accurate maps of places like Antarctica and North poles. It is absolutely a mystery. Al Biruni, pictured in Soviet stamps, was the father of Indology and Anthropology in 10th century. He also founded modern Geodesy. Ibn Battuta was the first one to circumnavigate by land and sea. Ibn Khaldun is the father of Economics (early), demography, historiography, sociology, and cartography.

Aviation: Abbas Ibn Farnas (810AD) had made a pair of flying wings and flown himself before Leonardo Da Vinci made its design 600 years later. Hezarfen Ahmed Celebi and his brother, Lagari Hasan Celebi, made the first manned rocket flight in first half of 17th century.

Technologies: Ismail Al Jazari is considered as the father of robotics. In their books, he and Banu Musa brothers discussed the process of making hundreds of automated machines, programmable and steam powered device in the 9th century. Al-Kindi is the father of cryptanalysis and passwords.

Last but not the least, the oldest university still operating today was established in Fez, Morocco in 859 A.D. Fatima Al Fihri established University of Al Quaraouyinne there. It is recognized by UNESCO and placed in the Guinness World Records too.

Sources: [Historia, BBC.co.uk, al Jazeera, British Pathe, Wikipedia, phoenix, wikipeidi.]



The World's Game

Naurose Farhan

College Roll : 7103

Class : IX, Section : D (Day)

When we talk about sports, we must talk about football. It's not just a game. It's a remarkable battle of 90 minutes between two teams. Everyone knows about football. It's the most entertaining show that exists on earth. Whether it's a club football match or a national team's match, the stadium always stays full of football fans. Fans are there to support their teams. Fans are a very important part of football. The teams and the players get inspired by their fans. National team football tournaments are rare. These tournaments don't take place every year. But club leagues always take place every year. These leagues are Spanish La Liga, Italian Series-A, English Premier League, French League one etc. These leagues are the most popular leagues in the world of football. These are situated in Europe. Europe's football is at its prime. It's ruling the football world. These leagues are connected to UEFA. These leagues agree with the terms and conditions of UEFA. There is a tournament called the 'UEFA Champions League'. It is said to be the most difficult club football tournament in history. This tournament has been running since 1955. Back then, it was known as European Cup. Introduced in 1992, the competition replaced the 'European Champion Club' cup, or simply European Cup adding a group stage to the competition and allowing multiple entrants from certain countries. The pre-1992 competition was initially a straight knockout tournament open only to the champion club of each nation. During the 1990's, the format was expanded, incorporating a round-robin four stage to include clubs that finished runner up of some nation's top-level league. While most of

Europe's national league can still only enter their national league champion, Europe's strongest national leagues now provide up to five teams for the competition. Clubs that finish next in line in each nation's top level league, having not qualified for the UEFA Champions League (UCL) competition are eligible for the next level UEFA EUROPA LEAGUE competition. When we talk about UCL, two players always come to the topic. Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. These two players are the icons of world football. But rivalry between them has always been thrilling. Cristiano Ronaldo, former Real Madrid player, is the current top-scorer in the history of this competition with more than 115 goals. Cristiano Ronaldo is part of Real Madrid's legacy and will forever be remembered as one of the great icons throughout the club's history. He was unveiled at the Santiago Bernabeu Stadium of Real Madrid on 6 July 2009, where he was joined by Eusebio and Alfredo Di Stefano, and since that day, the goals just kept coming. He netted 451 times in 438 competitive appearances with Real Madrid (averaging over a goal per game). He registered in all of the competitions. He featured in La Liga, 115 in the champions League, 22 in the Copa Del Rey, six in the Club world Cup, four in the Spanish Super Cup and two in the UEFA Super Cup. Nobody throughout the club's history has scored as many goals as the Portuguese attacker, who boasts an impressive trophy haul as a Real Madrid player: four champions league crowns, three Club World Cups and UEFA Super, two La Liga titles, a pair of Copa Del Rey and two Spanish Super Cups. This list of honour is

completed with five Ballon'd Ors, three Golden shoe awards, two best awards, whilst he was named UEFA best player in Europe three times and landed the Pichichi crown on three occasions. During the course of his nine seasons as a Real Madrid player, Ronaldo secured a number of impressive records. The clubs all-time leading goal scorer, the leading marksmen in Europe Cup history (he scored 115 goals for Real Madrid in the Champions League), the all-time leading Real Madrid goal scorer in La Liga, highest number of games in which a player has scored three or more times in La Liga history (34), and the most goals to have been Real Madrid player in a single season (61). During his time at the club, he also achieved the record for the most goals scored in a champions league campaign (17) and ended the competition as the leading goal scorer on six occasions. Many great players and legends have said that, "He is the best player in the world and there won't be any other player like him."

After the world cup tournament, Cristiano Ronaldo decided to move to Juventus from Real Madrid to face new challenges. He is currently 33 years old but still he is dominating the field.

Cristiano Ronaldo, also known as CR7 is an icon of the football world. A true legend. He is the

perfect example of the world's game. There are many great players too. Lionel Messi, Neymar, Zlatan Ibrahimovich, Arjen Robben, Sergio Ramos, Toni Kroos, Mesut Ozil, Dybala, Varane, Modric, James Rodrigues, Marcelo and many more players have achieved a lot of success in football. Messi is FC Barcelona's all-time top scorer. Neymar has fancy skill, flair and trick which he applies in the pitch to show how beautiful the game can be. Attacking midfielders like Robben, James, Ozil controls the midfield of the game and can dominate every single moment. And there are aggressive defenders like Sergio Ramos and Varane who will do anything to stop attackers and get the ball in their possession. There are many youngsters like Mbappe, Dele Alli, Rashford, Asensio who can dominate the field as well.

Football is everyone's game. Anyone can play football. Just a football is required to play the game. Football is famous among every nation. Almost every country in the world plays football and knows about football. Football is more than just a game. It is a game of skill, leadership, and respect. Footballers learn how to risk everything to win everything.



The Scariest Nightmare Ever

Md Farhan Gazi

College Roll : 12993

Class : IX, Section : C (Morning)

Rohan was a small boy who lived with his parents. He studied in a renowned school but he was very much attracted to paranormal things. He studied a lot about these things. He used to watch a lot of horror movies. He would get scared but still he would watch those films. But you know if you willingly run after the devil, he will be so much pleased to appear before you. So one day while he was sleeping, he saw a very scary dream. He saw that on a new moon night a

husband and a wife along with their three children were walking through a forlorn road. The husband and the wife both were crying. The husband was consoling the wife saying that, "We have to atone for what we have done." The wife said, "But with our and our children's lives! What fairness in that!". Actually the husband was a king. Once a devil worshipper had come to him to threaten him. But the king ordered his guards to hang him to death. Before death



the worshipper cursed him that he would lose his life along with his family members' in devil's hand. After his death the kingdom started to face great problems. People started to hang themselves with trees but their eyes would remain wide open and a smile remained on their faces. The worshipper had told him that he would have to go to the devil's den to atone. The king had understood that he was talking about the forsaken 700 years old dracma mansion. The king took his family members and started for the mansion. As soon as they came near the mansion they heard a vulture's cry, a little girl calling out their names and a very sad perhaps dead woman's singing. They all were so much frightened that they started to pray to their God. They entered the gate of the mansion. The children were also frightened. They caught their parents and began to shiver. Suddenly they heard an old woman's laughing and they looked at her. An



old woman was sitting on one of the horse statues wearing a torn black cloak. She was missing an eye and there was no apple of the eye in the other eye. She was very scary and frightening to look at. She called the children and suddenly they started walking toward her as if they had been hypnotized by her. The parents tried to stop them but their efforts went in vain. The mother started crying, "Oh, God! How can you be so cruel! Please, oh dear God, help us in this difficult phase of our life". Suddenly they heard a voice saying, "Your God! He will not help you at all. He is not there to help you. There rules the devil. Huh!" They looked behind and saw a dead man lying on the ground saying those things when blood was still coming out of his mouth. Suddenly they felt a little trembling under their feet. And at that moment two skeleton hands came out of the ground and held their feet. Then two very ugly swollen faced witches came out of the graves and said, "Come with us to a land of joy, come with us to a land of delight." Then they saw some flying creatures who covered them from all sides and killed them by stabbing them and ... Rohan woke up from sleep with a start and saw both his father and mother beside him. They said that he had been groaning all night. They asked him what he had dreamt but he didn't tell them anything. Then after that day he started hearing some voices. Sometimes he would feel that he was not alone, that someone was keeping an eye on him. One day, in his bathroom he saw a little girl. She started a little game! Won't you come with us to hop in a train? Won't you come with us to get drenched in the rain? Won't you come with us to die in a drain? He shouted and came out of his bathroom and slipped in the floor. He ran to his mother, told her everything, took her to the bathroom but there was nothing there. His mother convinced him that it was his misconception and went away. But she became a little bit tensed. However, the next day after taking dinner, Rohan went to sleep. At about 3.00 pm he heard a sound. He opened his eyes and saw the dead king of his dreams sitting in a rocking chair. He looked at him and saw the three children standing in front of him. They were holding each other's hands started to sing the same song he heard the other day. He became very afraid. He looked at his right side and saw the dead wife staring at him with her white eyes. He asked them "Who are you people? Why are

you here? Please leave me." They replied, "How can we leave you? You are our best friend. We will take you along with us to our delightful world." He said, "Please leave me." At that time a lighting struck his room and a huge spirit with big horns, fiery eyes, and blood mixed teeth entered his room. He said, "I am the devil. I am here to give you what you cherished for so long. Now why don't you want to go with your friends?" A last scream mixed with a lot of pain and fear was heard from his room. The next minute his parents rushed to his room and found him hanging on the wall on a sharp blade, fully naked. His eyes were wide open and a big smile spread over his face. His whole body was covered in his own blood. There was a writing on his belly which said, "Never seek for the demons or they will definitely and evidently come after you." And a big scary clown face was drawn besides the writing.



A Memorable Journey To The Sundarbans

Tamim Muhammad Rayeed
College Roll : 12943
Class : IX, Section : F (Morning)



Life is full of experience. And to fulfil the thirst of experience in our life, one has to make a journey on various purposes. A journey can be made for business or merriment purpose. And to me, a journey is made for merriment only. My JSC examination ended on 16 November 2017. My father had been planning beforehand to go to the Sundarbans. The Sundarbans is the largest mangrove forest in the world and the national forest of Bangladesh. At last we decided to go to the Sundarbans on 22nd December 2018. The duration of the journey was three days and two nights. It was a journey arranged by my father's colleagues of Janata Bank. As per schedule, we started for Khulna at 10.50 pm and reached Khulna BIWTA terminal at 7.00 am. Then we went to the ship with the help of a boat and reached there at 8.00 am. The ship was quite comfortable. There were cabins in the first and second floor. There was a dining and cultural hall on 3rd floor. The name of the ship was M.V Zilan.

At the very beginning, we were served breakfast. Our ship was going along the Rupsha River. I was just amazed to see all the beautiful scenic beauties of the calm nature around me. There were various unknown species of forest trees along river banks. We had our lunch around 2.00 pm. After lunch, we went to a famous spot of the Sundarbans named 'Harbariya'. Upon entering the spot we heard some tigers roaring and we were afraid. We were walking in a straight and single line very cautiously and were mentally and physically prepared to face any difficulties. We saw different forest trees like Sundori, Gewya, Kewra, Baen and Hetal. Numerous respiratory roots were seen on the ground. Fortunately we didn't see any tiger but we didn't see any deer either. We then came back to the ship in the evening. A music function was held at 6 pm which continued up to 8.30 pm. There were delicious dishes in the dinner also. After having

dinner, we went to sleep.

The next day was full of adventures. We all woke up very early in the morning. We were scheduled to go to "Tiger Point". Due to extreme foggy weather, our boat started a bit late. We arrived at our destination "Tiger Point" at 6.50 am. We had a great experience there. At 10 am we reached "Kotka", a beautiful but dangerous sea beach. We could hear the fierce roar of the waves of the sea from there. We clicked many pictures also. We then went to the forest office where we could see deer and monkeys. We returned to the ship at noon and took our lunch at 2.30pm. After lunch we saw a beautiful place from our ship named "Triangular Island". It was an amazing beauty of nature and we could see many unknown species of forest trees also. Many animals like deer, monkeys, wild pigs and crocodiles arrested our surprise. Then in the evening we started for Hiron Point. We all wore life jackets at that time because we were in the midst of the sea and the waves were much stronger than the river's. Unfortunately we couldn't land there because the platform for landing was broken. However, my father and some of his colleagues went to the famous "Dublar Char" to buy dried fishes. They returned to the ship at 8 pm. My father bought some dried fishes like loitta, paisha, shrimp, churi, and surma. My father also bought 2 litres of fresh honey of the Sundarbans. A Raffle draw was held at 9 pm. Then we took dinner and went to bed.

The next day was dull as it was the day for returning home. Our ship started its journey back to the terminal again. At noon, we reached near the famous spot of the Sundarbans named "Koromjol" which is a stunningly beautiful place. We then went to Koromjol by boat. I was amazed to see the beauty and neatness of the place. There were no threats of tigers there. We

saw many animals like crocodiles, deer, monkeys and various unknown species of birds. They were placed in cages, so they were of no threat. After visiting Koromjol we returned to the ship at 2 pm. After lunch, we got the opportunity to see the Mongla sea port which is the second biggest sea port of Bangladesh. Then we spent the rest of the time enjoying music presentations and playing different games. We started for Khulna BIWTA terminal at 9.30pm. Reaching there, we started for Dhaka and safely reached Dhaka the next morning.

It was a memorable journey for me as it was my first time on a ship. We travelled about 400 kilometres by ship but I couldn't realize how the time flew. The journey to the Sundarbans was so enchanting that it would be treasured in the core of my heart forever!



The Recalled Truth

Muntakim Mahmud

College Roll : 16785

Class : XI, Section : G (Morning)

9 August, 2013. The day of holy Eid-UI-Fitr. It's 6 am in the morning and I am standing in my room's balcony, scared and confused. It's happening again. "No, it's not true. It's just a dream. I am hallucinating," I thought to myself. But then again, the reality, the fear inside me is not a dream. It's true. I am really confused right now. One minute I'm thinking that everything's just a dream but the next minute my fear confirms that everything happening around me is true. "No, I can't do it anymore. I won't be afraid. I have to face it," I said to myself. But what am I forgetting? What is the truth? Why can't I recall the truth?"

It's 8 am and I have finally gathered up all my courage to come out. I step out of the balcony and there he is! It's another me! The other one is getting ready to go to the mosque. I try to charge him but I go through him every time I try. It's like that the other me is made of something supernatural. "I can't find my answers like this. I have to wait and follow him". I thought. I followed him as he went out of the room.

Then I saw the most exiting scene in my whole life. My whole family was sitting there. I was sure that everyone would notice me and also the other one who was just like me. Instead I noticed with great shock that no one even noticed me, they didn't even look at me. I was far from close to them. But they burst with joy when the other in that was like me walked in. It was like that, there were two of me except for the fact that I was invisible to them but the other one was visible. I became confused if I even existed or not. But I kept cool. I had to recall my missing part. So, when the other me went to the mosque with my father, I just followed him like a shadow. They returned home. They started embracing everyone while I was standing there, invisible and confused. Everyone was getting ready to go to visit our relatives. They were very excited, especially my younger brothers and sisters. Right now I'm thinking that my family isn't so boring after all. May be it was me who couldn't relate to them. I saw them starting for our uncle's house in our brand new "Hummer H3". I remember my father

buying that car just for me. I wanted to follow them. But how could I follow them when they are in an “8 second monster”? But looks like the surprises just kept on coming. I suddenly felt somehow lighter. It was like I had no weight. I realized that I was flying through the air, just alone. They reached our uncle’s house and I followed them in. I thought my uncles and cousins must notice me. But they didn’t. But not actually me. They noticed the other me that came here with others. “Am I dead? How can no one see me? And how is there another me? Everything was so confusing.

After staying for sometimes, my whole family started for Baily Road. But as soon as they got inside the car, something fishy appeared in my head. It was like I have seen this scene before. It was like a total “DejaVu”? I didn’t know what I was missing.

They started for Baily Road. I saw that, I mean the other me was driving the car. It was almost evening and the other cars were moving really slow. I was still flying over our car witnessing the whole thing. The other ‘me’ which was driving entered the “Bejoy Sharoni” road. It was totally empty. So, he accelerated the monster (car) to a 130 km. per hour. He was almost at the intersection of the road but he didn’t slow down. Just as he was crossing the intersection, he saw another car coming from his left at a high speed. He turned the car right and tried to control it, the other car just managed to pass behind it. But another bus was coming from Iron hardly from east

and fastly and.....

“It’s your fault. You are the one responsible for our death,” a voice said in my head. “We will never forgive you.” I recognized the voice. It was my father’s but I couldn’t see him, I just heard his voice. “I’m sorry dad,” I said. “I really didn’t mean to do this. It was an accident. Forgive me mom, dad, Hasan, Alif. I never meant to do this. Forgive me! Forgive me!”

“Look, he’s talking”. It was like a voice coming from eternity as the sound echoed in my brain. “Wake up, Mahmud, wake up! I opened my eyes and saw two sweet faces bent over me. I remember now! I remember the recalled truth! It was three years ago. Everything I described from the beginning really happened then. It was an Eid day. And out of my excitement and one silly mistake everything changed. The accident really happened and I lost everything and everyone I cared for, in the blink of an eye. Everyone was spot dead including my mom, dad, sisters, and brothers, and uncle. Somehow I lost both of my feet; suffered a severe brain damage. The doctors said that I shouldn’t be alive as my heart and condition was really bad and critical. But they are surprised to see. I’m still alive. I know why I’m still alive.

Since the accident, every year at Eid-ul-Fitr, I see them. I see the same thing happening in front of me. The pain and frustration and loneliness has kept me alive, to report for the mistake I have done. That’s why I’m still alive. Such so to relive the “Recalled Truth...!”





90's Cartoon

Chowdhury Khaled Mahdi
College Roll : 16831
Class : XI, Section : E (Morning)

People who are born in the 90's are the luckiest one. One of the reasons is cartoon. Those 90's kids were blessed with some awesome cartoons.

I am not a 90's kid, but still I got a chance to see those legendary cartoons. Those cartoons had another level of awesomeness. If I were asked to name some 90's cartoons, I would go for Thunder Cats, Swat Kats, Pink Panther, Popeye's, Looney Toons, Bob the Builder, Tom and Jerry (classic series) and many more.

Those cartoon series were the main focus of 90's cartoons. Those cartoons were the steps towards our modern days' cartoons. 90's kids used to watch those cartoons with an undescrivable fun. Nowadays these cartoons are not as the same as they were.

'Thunder Cats' was the most famous cartoon among them. It was shown 2 to 3 days a week. So were the other cartoons too.

The most legendary cartoon 'Tom and Jerry' is not the same as it was in 90's. The full 90's series had a different level of awesomeness-the best classic cartoon series of all time.

'Looney Toons' is the most famous cartoon of 90's. It was created by 'WB'. Its characters are still famous, such as Bugs Bunny, Daffy Duck and many more.

Popeye's and Swat Kats have maintained their legendary levels until Bob: the builder and Pink Panther became famous among child.

There are many more cartoons that can be remembered from 90's. The best time for cartoons was 90's. Those cartoons are the inspiration for the modern cartoons. We all miss those cartoons.



Human Body

Nafis Hossain Shoummo

College Roll : 15332

Class : IV, Section : A (Day)

Known and unknown

1. Blood: An adult man's body contains about 5 litres of blood. A woman's body contains about 4.3 litres.
2. Brain power: You lose 1,00,000 brain cells every day! Luckily you have 100 billion altogether.
3. The average person inhales 6 liters air per minute, or 8,640 liters a day.
4. There are 50 trillion cells in our body and 3 billion of them die every minute.
5. Heart beats: Your heart pumps 13,640 liters of blood around your body.



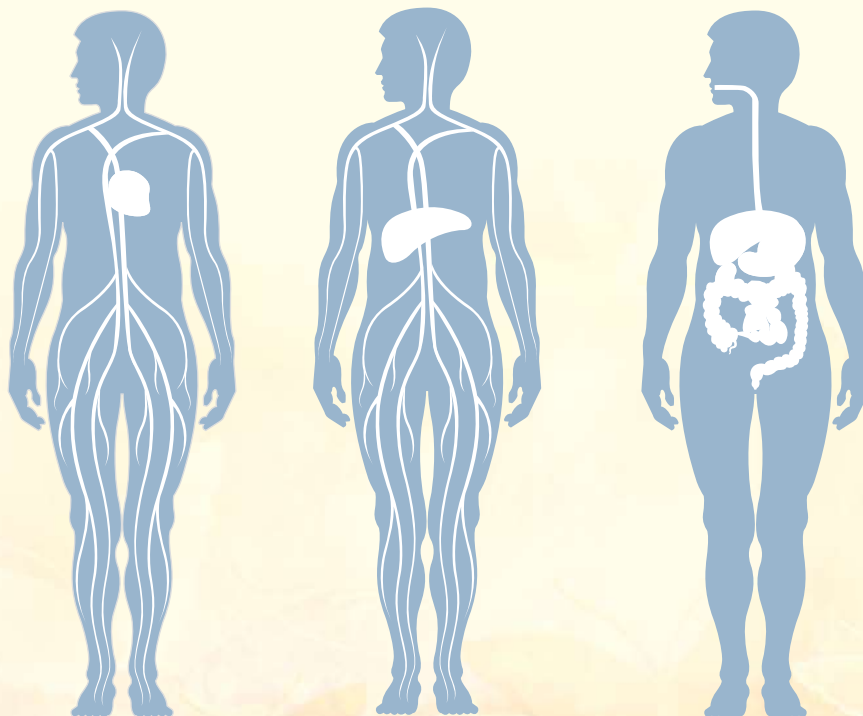
Jokes

Muntasir Mubeen

College Roll : 13030

Class : IX, Section : F (Morning)

1. **Teacher:** Did your father help you with your homework?
Student: No, he did it all by himself.
2. A: Why are you crying?
B: The elephant is dead.
A: Was it your pet?
B: No, but I am the one who must dig its grave.
3. A teacher asked a student to write 55.
Student asked: How?
Teacher: Write 5 and beside it another 5.
The student wrote 5 and stopped.
Teacher: What are you waiting for?
Student: I don't know to which side to write the other 5.



ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ২০১৮-এর কৃতি ছাত্রবৃন্দ



সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা-২০১৮ এ থানা এবং মহানগর পর্যায়ে প্রথম
ত্বাহা ইমতিয়াজ আলিম এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ।



অনিক মজুমদার
ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখায় প্রথম



রাগিব শাহরিয়ার রাফি
ভর্তি পরীক্ষায় জগন্নাথ
বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক শাখায় প্রথম



মাহিন আহনাফ তাহমিদ খুব
ভর্তি পরীক্ষায় রাজশাহী
বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান
অনুষদে ষষ্ঠ



মোঃ আশিকুর রহমান
ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য শাখায় নবম



চিত্রশৈলী



আলতা মাসুম জয়
কলেজ নম্বর : ৯৪৫৯
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ (দিবা)



শাফকাত মোকামেল
কলেজ নম্বর : ৯৪৪৬
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (দিবা)



সামীম আহ্নাফ তাহমীদ
কলেজ নম্বর : ১৫৩৪১
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)





শেখ সিয়াম হোসেন
কলেজ নম্বর : ১৫৩৬৮
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)



আহমাদ জুলকার নাইন
কলেজ নম্বর : ১৫২০২০৮
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ (দিবা)



ফখরুল আলম (ফাহিম)
কলেজ নম্বর : ১৫২০৩১৫
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ (দিবা)





রাশেদুল ইসলাম

কলেজ নম্বর : ১৫৩০৩৬৯
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক (প্রভাতি)



জারিফ রহমান নক্ষত্র

কলেজ নম্বর : ১৫২০২০৮
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক (দিবা)



অভিরূপ সরোয়ার

কলেজ নম্বর : ৮০৯৯
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ক (দিবা)





মোঃ মোস্তাকিমুর রহমান
কলেজ নম্বর : ৮০১৯
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : গ (দিবা)

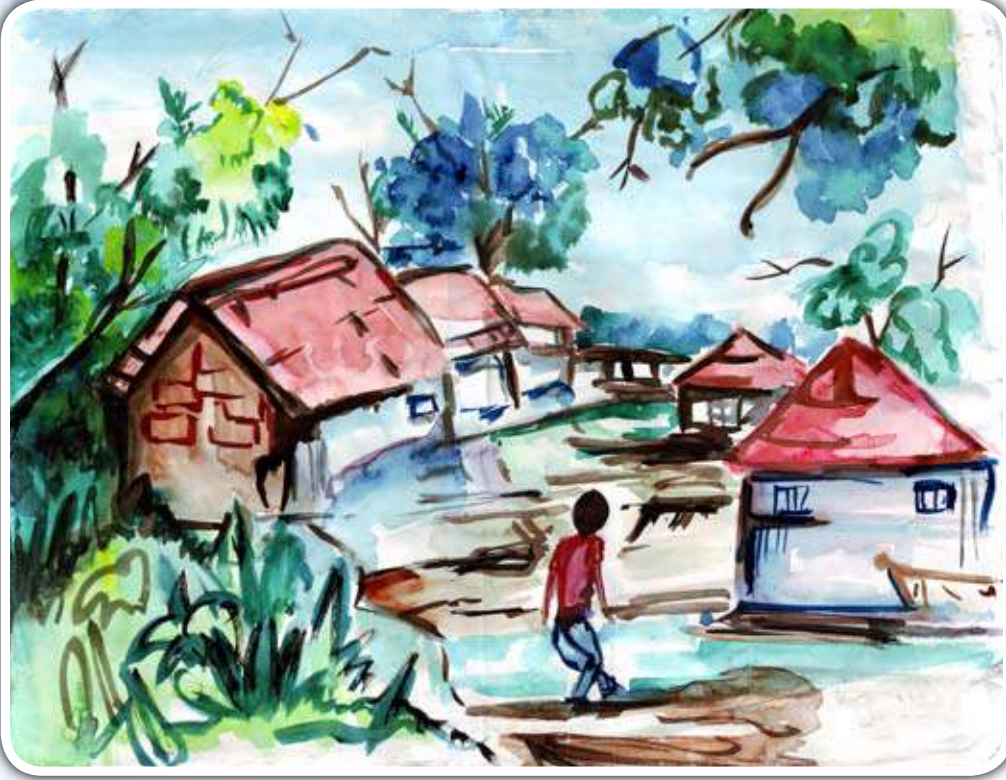


তাহিন লাবীব
কলেজ নম্বর : ১০৫৭৩
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : গ (দিবা)



অলি উল্লাহ
কলেজ নম্বর : ১৬৩০২
শ্রেণি : নবম, শাখা : ক (প্রভাতি)





শিহাব সারার মনির
কলেজ নম্বর : ৬৯০৬
শ্রেণি : নবম, শাখা : ঘ (দিবা)



আবরার হামিম নিয়াজ
কলেজ নম্বর : ১৫৪৪৭
শ্রেণি : দশম, শাখা : ঘ (প্রভাতি)





মোঃ আসিফ

কলেজ নম্বর : ১৬৬৬৪

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : খ (প্রভাতি)



পার্থ দাস অন্তর

কলেজ নম্বর : ১৬৫৬৬

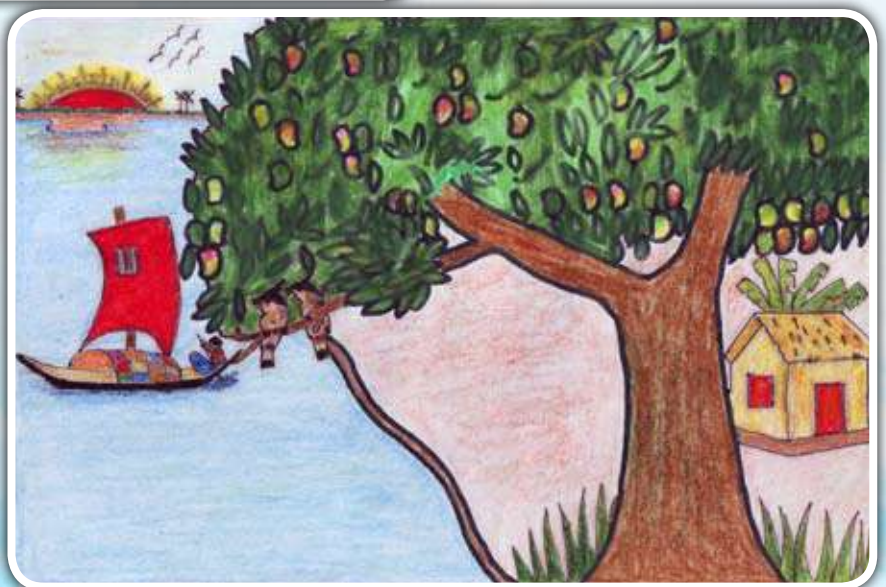
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)



সাজ্জাদ হোসেন

কলেজ নম্বর : ১৬৩০২

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)



স্টুডেন্ট গ্যালারি



শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-৬ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-৬ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-চ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-চ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-৬ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-৬ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-চ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-চ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-৬ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-৬ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-চ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-চ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ছ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ছ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-উ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-উ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-চ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-চ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ছ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ছ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



- ~~სა~~ზგა
ენა
2018



২০১৮ সালে থানা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণিশিক্ষকের ক্রেস্ট গ্রহণ



বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মহোদয় এবং ম্যাডামকে বরণ



বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ছোট সোনামনিদের ফ্যাশন শো



বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ছাত্রদের র্যালি



একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ অনুষ্ঠান



জাতীয় শোক দিবসে ছাত্রদের পরিবেশনা



জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৮ উদযাপন



অধ্যক্ষের দায়িত্ব হস্তান্তর



বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক অধ্যক্ষ মহোদয়কে বরণ



কলেজের পশ্চিম গেট উদ্বোধন



প্রাক্তন অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেখ শরিফুল ইসলাম-এর বিদায় সংবর্ধনা



উপাধ্যক্ষ নিশাত হাসানের বিদায় অনুষ্ঠান



দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়



ক্লাস পার্টির আনন্দঘন মুহূর্তে



দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের শিক্ষাসফর



বিজয় দিবস-২০১৮ তে পতাকা উত্তোলন



বিজয় দিবস-২০১৮ তে পুরস্কার প্রদান



বিজয় দিবস-২০১৮ তে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



তৃতীয় শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা



পাঠ্যপুস্তক দিবসে নতুন বই গ্রহণ করছে মেধাবী ছাত্র



পাঠ্যপুস্তক দিবসে নতুন বই হাতে আনন্দিত ছাত্ররা



বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান উদ্বোধন



বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ছাত্রদের কুচকাওয়াজ



বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে বি.এন.সি.সি. ক্যাডেট দল



বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে হার্ডেলস প্রতিযোগিতা



বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে দৌড় প্রতিযোগিতা



বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে “যেমন খুশি তেমন সাজো” প্রতিযোগিতা



বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষের ক্রিকেট ম্যাচ উদ্বোধন



বার্ষিক ক্রীড়ার সমাপনীতে সচিব মহোদয়ের আগমন



বার্ষিক ক্রীড়ার সমাপনীতে ছাত্রদের তায়কোয়ান্দো প্রদর্শন



বার্ষিক ক্রীড়ার সমাপনীতে ছাত্রদের মনোরম ডিসপ্লে



বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে চলছে অতিথিবৃন্দের প্রতিযোগিতা



বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে জুনিয়র হাউসের বিজয়ী ছাত্রদের ট্রফি গ্রহণ



আন্তঃকলেজ জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবের উদ্বোধন



আন্তঃকলেজ জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবে প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান



আন্তঃকলেজ জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রজেক্ট পরিদর্শন



আন্তঃকলেজ জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ



আর্ট এন্ড মিউজিক ফেস্টে অধ্যক্ষের উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান



আর্ট এন্ড মিউজিক ফেস্টে নিমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি



আর্ট এন্ড মিউজিক ফেস্টে নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ



আর্ট এন্ড মিউজিক ফেস্টিভে বিজয়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ



আন্তর্জাতিক আইটি ফেস্টিভের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান



আন্তর্জাতিক আইটি ফেস্টিভের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়



আন্তর্জাতিক আইটি ফেস্টিভের প্রজেক্ট পরিদর্শন



আন্তর্জাতিক আইটি ফেস্টিভের সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ



৯ম বিতর্ক উৎসবে বিজয়ীদের পুরস্কার গ্রহণ



১০ম জাতীয় বিতর্ক উৎসবে বিজয়ী বিতর্কিকদের পুরস্কার গ্রহণ



ভাষা উৎসবে প্রধান অতিথির দেয়াল পত্রিকা পরিদর্শন



অধ্যক্ষ মহোদয়ের জয়নুল আবেদিন হাউসের বাগান পরিদর্শন



অধ্যক্ষ মহোদয়ের লালনশাহ হাউসের বাগান পরিদর্শন



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রভাতফেরী



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ



বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ



বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের দলীয় অভিনয়



বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজয়ী ছাত্রের পুরস্কার গ্রহণ



বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ



বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আহবায়কের ফ্রেস্ট গ্রহণ



বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সচিব মহোদয়ের ফ্রেস্ট গ্রহণ



বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় জুনিয়র হাউসের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি গ্রহণ



বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সিনিয়র হাউসের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি গ্রহণ



কিশোর আলো অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়



বোর্ড অব গভর্নরস এর নবীন সদস্যকে বরণ



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন



জাতির জনকের জন্মবার্ষিকীতে ছাত্রদের পরিবেশনা



গণহত্যা দিবসে বক্তব্য প্রদান করছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত পরিচালক ও কণ্ঠযোদ্ধা সুজেয় শ্যাম



স্বাধীনতা দিবসে বক্তব্য প্রদান করছেন বীর উত্তম, বীর বিক্রম, পিএসসি, বিএন (অব:) কমোডর এ ডব্লিউ চৌধুরী



বিজয়ী ক্রিকেট দলের সাথে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ



ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ফুটবল টিম



ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ভলিবল টিম



ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ক্রিকেট টিম



ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের হ্যান্ডবল টিম



মসজিদে প্রার্থনারত ছাত্ররা

স্বাপনা ও নিসর্গ



ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের মায়াবী হরিণ



কলেজ চৌরঙ্গীর মোড়ে মনোজ্ঞ ছত্রছায়া



কলেজ অডিটোরিয়াম



কলেজের শাপলা সিঙ্খন



কলেজ হাসপাতাল



কলেজ মসজিদ



কলেজ ক্যান্টিন



কলেজের নবনির্মিত পশ্চিম গেট

স্মৃতি অমলিন



মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ২ আগষ্ট ১৯৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২ জুন ১৯৯৪ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। গত ১৫ আগস্ট ২০১৮ এ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি নিজ বাসগৃহে ইন্তেকাল করেন। আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।



ফারহানা আফরোজ, উচ্চমান সহকারী ১১ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে যোগদান করেন। গত ০৪ ডিসেম্বর ২০১৮ এ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

২০১৮-এ প্রিন্ট মিডিয়ায় ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

The collage consists of numerous newspaper clippings from various Bangladeshi publications, including 'সমকাল', 'প্রথম আলো', 'যুগান্তর', and 'ইতিহাস'. The clippings feature a variety of content:

- Headlines:**
 - "বাংলাদেশ ব্যাংকের ছুল ব্যাংকিং কনফারেন্স" (Bangladesh Bank's Fake Banking Conference)
 - "মন্ত্রিসভা গানে আর পুরস্কার জেতার আনন্দ" (Ministry Celebrates with Songs and Awards)
 - "আলোকচিত্র, গানে, উৎসবে মেতেছে শিক্ষার্থীরা" (Students Enjoy Photography, Songs, and Festivals)
 - "শিক্ষার্থীদের বাঁধাজ্ঞা উচ্চাস নেচে-গেয়ে উদযাপন" (Students Celebrate with Songs and Dances)
 - "শেষ হলো তিন দিনের বিজ্ঞান উৎসব" (Three-Day Science Festival Ends)
 - "বার্ষিক ফ্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী" (Annual Free Day Competition Ends)
 - "রাজধানীতে গেমিং প্রতিযোগিতা সম্পন্ন" (Gaming Competition in Dhaka Completed)
- Photographs:**
 - Students in school uniforms participating in various activities.
 - Groups of students performing on stage.
 - Students working on projects or in classrooms.
 - Groups of students posing for photos.
 - Students participating in a science festival.
 - Students playing board games.
- Text Snippets:**
 - "এক উৎসবে বিজ্ঞানের নানা আয়োজন" (Various Science Arrangements at a Festival)
 - "প্রথম আলো" (First Light)
 - "আয়োজন" (Arrangement)
 - "কালের কণ্ঠ" (Voice of Time)
 - "ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল কলেজের ৭২ মিলিয়ন বিত্তর উদ্বোধন" (Inauguration of 72 Million for Dhaka Residential Model College)
 - "গানে কুইজে জমেছে উৎসব" (Festival of Songs and Quizzes)
 - "শেষ হলো তিন দিনের বিজ্ঞান উৎসব" (Three-Day Science Festival Ends)
 - "বার্ষিক ফ্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী" (Annual Free Day Competition Ends)
 - "রাজধানীতে গেমিং প্রতিযোগিতা সম্পন্ন" (Gaming Competition in Dhaka Completed)



